শ্রীরমণবচনামৃত

দ্বিতীয় ভাগ

অনুবাদিকা

শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার

শ্রীরমণাশ্রম

তিরুভন্নামালাই, দক্ষিণভারত

প্রকাশক ঃ
শ্রীটি. এন. বেঙ্কটরামণ
প্রেসিডেন্ট, বোর্ড অফ ট্রাস্টীস্
শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই

মুদ্রক ঃ
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন
কলিকাতা ৬

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশান

গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

পরমাত্ম নিকেতন
গ্রাম—ফুলচক
পোঃ—নোতুক, মেদিনীপুর

পূর্ণিমা সরকার
ফ্ল্যাট কিউ-৩ বিদ্যাসাগর নিকেতন
সল্ট লেক, কলিকাতা-৬৪

নিবেদন

অশেষ শাস্ত্র পাঠে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত, শাস্ত্রপাঠের অক্ষমতায় বঞ্চিত ও আশাহত, এতদতিরিক্ত আপন চিন্তাজালে জর্জরিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী এবং যাঁরা শ্রীরমণ বচনামৃতের প্রথম ভাগ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সকলেই এই সরল ও স্বল্প কথায়, সোজা ও সহজ পথে, শেষ ও সার সত্যের সম্যক সমীক্ষানির্ভর সন্ধান-সূত্রের ক্লান্তিহর শান্তিকর সংলাপ পাঠে বিশ্রান্তি লাভ করবেন আর 'আকাশ-শরীর সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দম্ শান্তি-সমৃদ্ধ-অমৃত'রূপী সুখ-মৌনের পরশ পাবেন।

আরাধনা দিবস
২১শে এপ্রিল, ১৯৬২

অনুবাদিকা

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও বাণীর বাংলা অনুবাদ বই

১। রমণ গীতিকা

২। উপদেশ মঞ্জরী ও স্বরচিত কবিতা

৩। রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ

৪। শ্রীরমণ বাণী

৫। শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী (প্রথম খণ্ড)

৬। স্তুতিপঞ্চকম্‌ ও সদ্‌বিদ্যা

৭। শ্রীরমণবচনামৃত (প্রথম ভাগ)



ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

শ্রীরমণবচনামৃত

দ্বিতীয় ভাগ

২৩শে আগস্ট, ১৯৩৬

২৪০। ভক্ত—জগৎ বাস্তববাদী। এর প্রতিকার কি?

মহর্ষি—বাস্তববাদী বা অধ্যাত্মবাদী, সেটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বোধ হয়।

'দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ জগৎ।' তোমার দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক কর। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সৃষ্টির ভার নিতে জানেন।

ভ—ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কি করা উচিত?

ম—তুমি বর্তমানের ব্যবস্থা কর, ভবিষ্যৎ তার ব্যবস্থা করবে।

ভ—বর্তমানের ফলে ভবিষ্যৎ হয়। সুতরাং একে ভাল করার জন্য আমার কি করা উচিত? কিংবা নীরব থাকবো?

ম—সংশয়টা কার? কর্মপদ্ধতি কে চাইছে? সংশয়ীকে খোঁজো। যদি সংশয়ীকে ধরতে পারো, সংশয় থাকবে না। আত্মা দৃষ্টি-বহির্ভূত হওয়ার জন্যই চিন্তার অত্যাচার হয়; জগৎ দেখা যায়; সংশয়ের উদয় আর ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ হয়।

আত্মাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো, এরা সব চলে যাবে।

ভ—কি করে করব?

ম—এ প্রশ্নটা অনাত্ম-বস্তু সম্বন্ধে হতে পারে কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে হয় না। তুমি কি তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ কর?

ভ—না। কিন্তু তথাপি আত্মোপলব্ধি কি করে হয় জানতে চাই। এটা লাভ করার কি কোন উপায় আছে?

ম—চেষ্টা কর। কূপ খুঁড়লে যেমন জল পাওয়া যায় সেরূপ অনুসন্ধান করলে আত্মোপলব্ধি হয়।

ভ—ঠিক। কিন্তু কেউ সহজে পায়, আবার কেউ কষ্ট করে পায়।

ম—তুমি জলসিক্ত মাটি দেখছ। তুমি আভাসে আত্মা সম্বন্ধে সচেতন। খুঁজে যাও। যখন চেষ্টা থেমে যাবে তখন আত্মা প্রকাশ পাবে।

ভ—মনকে কিরূপে অন্তর্মুখীন হতে শেখানো যায়?

ম—অভ্যাসে। আত্মার প্রকাশের জন্য মনই বুদ্ধিবৃত্তিরূপে নিজের নাশ ঘটায়।

ভ—মন কি করে নাশ হয়?

ম—জল দিয়ে জল শুকানো যায় না। আত্মাকে খোঁজো। মন নাশ হয়ে যাবে।

২৯শে আগস্ট, ১৯৩৬

২৪১। ভ—দুঃখ পরিহারের উপায় কি?

ম—দুঃখের কি কোন আকার আছে? অবাঞ্ছিত চিন্তাই দুঃখ। মন তাকে বাধা দেওয়ার উপযুক্ত শক্তিশালী নয়।

ভ—মনের শক্তি কি উপায়ে বৃদ্ধি পায়?

ম—ঈশ্বরের উপাসনায়।

ভ—সর্বব্যাপী ঈশ্বরের ধ্যান বোধগম্য হয় না।

ম—ঈশ্বরের কথা এখন থাক। নিজের আত্মাকে ধরো।

ভ—কি করে জপ করা হয়?

ম—এটা দু'রকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম। দ্বিতীয়টা জপের ওপর ধ্যান, আর তাতেই মনের শক্তি লাভ হয়।

ভ—ধ্যানের সময়ে মন স্থির হয় না।

ম—শক্তির অভাবে এটা হয়।

ভ—সন্ধ্যা-আহ্নিক সাধারণতঃ যান্ত্রিকভাবে করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াও তাই। এতে কি কাজ হয়? এর থেকে অর্থ জেনে কি জপ করা ভাল নয়?

ম—হুঁ! হুঁ!

২৪২। একজন গুজরাটী ভদ্রলোক শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—বলা হয়, মৃত্যুর পর পাপ ও পুণ্য ভোগের ক্রম আমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের পরম্পরা আমাদের ইচ্ছাধীন, তাই কি?

ম—মৃত্যুর পর কি ঘটবে এসব প্রশ্ন তোলা কেন? "আমি কি জন্মেছিলাম? আমি কি আমার পূর্বকর্মের ফল ভোগ করছি?" ইত্যাদি প্রশ্ন কেন? একটু পরে তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন এসব প্রশ্ন থাকবে না। কেন? যে ঘুমিয়ে থাকে তার থেকে কি তুমি এখন পৃথক? তুমি তা নও। এ প্রশ্ন এখন উঠেছে কিন্তু ঘুমে ওঠে না কেন? খুঁজে দেখো।

২৪৩। একজন ক্ষীণকায় মাঝবয়সী লোক একটা লাঠি হাতে নিয়ে এসে ভগবানের সামনে রেখে মাথা নীচু করে প্রণাম ক'রে মহর্ষির সমীপে বসল। একটু পরে সে উঠে অতি বিনয়ের সঙ্গে লাঠিটা ভগবানকে দেওয়ার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বললে যে সেটা চন্দন কাঠের তৈরী। শ্রীভগবান বললেন যে সে নিজের জন্য ওটা রাখুক। কারণ ভগবানের কোন বস্তুই আগলে রাখা যায় না। সবার সাধারণ সম্পত্তি হওয়ার জন্য কারও হয়ত লোভ হবে, আর ভগবানের অনুমতিক্রমে কিংবা বিনা অনুমতিতে কেউ নিয়ে চলে যাবে। তখন দাতা ক্ষুন্ন হবে।

লোকটি তবুও অনুনয় করতে লাগল। ভগবান তার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না, সেজন্য বললেন, 'ভগবানের প্রসাদ বলে নিজের কাছে রাখো।' তখন লোকটি অনুরোধ করলে যে লাঠিটা একবার গ্রহণ করে আশীর্বাদের সহিত তাকে দেওয়া হোক। ভগবান সেটা নিয়ে আঘ্রাণ করলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, বেশ ভাল আর লোকটির হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "রেখে দাও। এটা সর্বদা তোমাকে আমার কথা মনে করাবে।"

২৪৪। একজন মহারানী সাহেবা নম্র ও নীচু গলায় অথচ স্পষ্ট শোনা যায় এরূপভাবে বললেন—

"মহারাজর্জী, আমার আপনাকে দেখার সৌভাগ্য হল। আমার নয়ন আপনাকে দেখে ধন্য হল। কর্ণ আপনার কথা শুনে ধন্য হল।

"মানুষ যা চায় ঈশ্বরের কৃপায় আমার সবই আছে।" মাননীয়া রানী সাহেবার কণ্ঠরুদ্ধ হল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ধীরে ধীরে বলে চললেন, "আমার যা প্রয়োজন সবই আছে, মানুষ যা চায়···কিন্তু····কিন্তু···আমি···আমার···মনে শান্তি নেই··· কিছু একটা বাধা দিচ্ছে। বোধহয় আমার ভাগ্য··· ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর মহর্ষি যথারীতি স্নেহভরে বললেন—

"বেশ তো। যা বলার প্রয়োজন তা বলা হয়েছে। আচ্ছা, ভাগ্য কি? ভাগ্য বলে কিছু নেই। সমর্পণ কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বরের ওপর সব ভার দাও। নিজে এত বহন করতে যেও না। তাহলে আর ভাগ্য তোমার কি করবে?"

ভ—সমর্পণ অসম্ভব।

ম—হাঁ। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ অসম্ভব। কিন্তু কিছুটা সমর্পণ সবাই করতে পারে। সময়ে এ থেকে পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যাবে।

বেশ, সমর্পণ যদি অসম্ভব হয় তবে আর কি করা যাবে? মনের শান্তি নেই। তুমি নিজেও তাকে আনতে পারবে না। একমাত্র সমর্পণ হলে হয়।

ভ—কিছুটা সমর্পণ—আচ্ছা—একি ভাগ্য খণ্ডন করতে পারে?

ম—ও, হাঁ! তা পারে।

ভ—পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্যই তো ভাগ্য হয়?

ম—ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে ঈশ্বর তার ভার নেবেন।

ভ—এই যদি ঈশ্বরের বিধান হয় তবে সেটা খণ্ডন হবে কি করে?

ম—সব তাঁতেই রয়েছে।

ভ—ঈশ্বরকে কি করে দেখা যায়?

ম—অন্তরে। মন অন্তর্মুখীন করলে আন্তর চেতনায় ঈশ্বরের প্রকাশ হয়।

ভ—ঈশ্বর সবেতে আছেন—আমরা চারিদিকে যা কিছু বস্তু দেখি সবেতেই তিনি রয়েছেন। লোকে বলে সব কিছুতে ঈশ্বর দর্শন করতে হবে।

ম—ঈশ্বর সবেতে আছেন আর যে দেখছে তার মধ্যেও আছেন। এ ছাড়া ঈশ্বরকে আর কোথায় দেখা যাবে? তাঁকে বাইরে দেখা যাবে না। তাঁকে অন্তরে অনুভব করতে হবে। বিষয় দেখতে গেলে মনের প্রয়োজন। বাইরের বিষয়ে ঈশ্বরের ধারণা একটা মনের ক্রিয়া। সেটা সত্য নয়। মন-রহিত আন্তর চেতনাকেই ঈশ্বর ব'লে অনুভূত হয়।

ভ—সেখানে হয়ত সুন্দর রঙ দেখা যায়। সেগুলো লক্ষ্য করতে বেশ আনন্দ হয়। তার মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতে পারি।

ম—এগুলো মনের কল্পনা।

ভ—রঙ ছাড়া আরও কিছু আছে। আমি দৃষ্টান্তের জন্য রঙ বললাম।

ম—সেগুলোও আগের মত মনোময়।

ভ—শরীর আছে, আর ইন্দ্রিয় ও মনও আছে, আত্মা কোন কিছু জানার জন্য এগুলো ব্যবহার করে।

ম—বিষয় বা অনুভূতি কিংবা চিন্তা সবই মনের কল্পনা। 'আমি'-চিন্তা বা অহংকার ওঠার পর মন জাগে। অহংকার কোথা থেকে ওঠে? নিরাকার চেতনা বা বিশুদ্ধ চিত্ত থেকে ওঠে।

ভ—সেটাই কি জীবাত্মা?

ম—জীবাত্মা, মন, অহংকার এগুলো কতগুলো শব্দমাত্র। এরূপ কোন বস্তু নেই। চেতনাই একমাত্র সত্য।

ভ—তবে সেরূপ চৈতন্য কোন আনন্দ দিতে পারে না।

ম—এর স্বরূপই পরমানন্দময়। পরমানন্দই আছে। সেখানে আনন্দ উপভোগ করার জন্য কেউ নেই।

আনন্দের ভোক্তা ও আনন্দ—উভয়ই তাতে মিশে যায়।

ভ—সাধারণ জীবনে সুখ ও দুঃখ আছে। আমরা কি কেবল সুখটা নিয়ে থাকবো না?

ম—মনকে অন্তর্মুখীন করা আর সেখানে রাখাই সুখ; বহির্মুখে ছড়িয়ে দেওয়া দুঃখ। কেবল সুখই আছে। সুখের অভাবই দুঃখ। স্বরূপই সুখ—আনন্দ।

ভ—এটা কি জীবাত্মা?

ম—জীবাত্মা ও ঈশ্বর মনের কল্পনা।

ভ—ঈশ্বর কি মনের কল্পনা?

ম—হাঁ। তুমি কি সুষুপ্তিতে ঈশ্বরের কথা ভাবো?

ভ—কিন্তু ঘুম একটা অচেতন অবস্থা।

ম—যদি ঈশ্বর সত্য হয় তবে তাঁর সব সময়ে থাকা উচিত। তুমি সুপ্তি ও জাগ্রতে সমান থাকো। যদি ঈশ্বর তোমার আত্মার মত

সত্য হয় তবে আত্মার মত সুপ্তিতেও তাঁর থাকা উচিত। ঈশ্বর-চিন্তা কেবল জাগ্রত অবস্থায় হয়। এখন কে ভাবে?

ভ—আমি ভাবি।

ম—এই 'আমি'টা কে? কে এটা বলে? শরীর কি এটা বলে?

ভ—শরীরটা বলে।

ম—শরীর বলে না। তাই যদি হয়, সুপ্তিতে কি সে বলেছিল? এই আমিটা কে?

ভ—শরীরের মধ্যের আমি।

ম—তুমি কি শরীরের ভিতরে না বাইরে?

ভ—আমি নিশ্চয় শরীরের ভিতরে থাকি।

ম—তুমি কি নিদ্রার সময়ে একে শরীরের ভিতরে অনুভব কর?

ভ—ঘুমেতেও আমি শরীরে থাকি।

ম—সুষুপ্তিতে কি তুমি শরীরের ভিতরে আছো ব'লে সচেতন থাকো?

ভ—ঘুম একটা অচেতন অবস্থা।

ম—প্রকৃত কথা, তুমি ভিতরে বা বাইরে নও। সুষুপ্তি সত্তার স্বরূপ অবস্থা।

ভ—তবে সুষুপ্তি এই অবস্থার থেকে উত্তম।

ম—উত্তম বা অধম বলে কিছু নেই। সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রতে তুমি একই থাকো। সুষুপ্তি একটা আনন্দের অবস্থা, সেখানে কোন দুঃখ নেই। অভাব বোধ, দুঃখ বোধ ইত্যাদি কেবল জাগ্রত অবস্থায় হয়। কি এমন পার্থক্য হয়েছে? তুমি দু'টি অবস্থায় এক কিন্তু সুখের একটা পার্থক্য হয়েছে। কেন? কারণ এখন মন উঠেছে। এই মনটা 'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর ওঠে। 'আমি'-চিন্তা চেতনা থেকে ওঠে। যদি কেউ এতে (চেতনায়) থাকতে পারে তবে সে সব সময়ে আনন্দে থাকে।

ভ—নিদ্রিত অবস্থায় মন নিশ্চেষ্ট থাকে। মনে হয়, এটা নিম্ন অবস্থা।

ম—তা যদি হয় তবে সবাই ঘুমাতে চায় কেন?

ভ—শরীর ক্লান্ত হলে ঘুমিয়ে পড়ে।

ম—শরীর কি ঘুমায়?

ভ—হাঁ। এই অবস্থায় শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ হয়।

ম—তা হতে পারে। কিন্তু শরীরটা কি নিজে ঘুমায় বা জেগে ওঠে? তুমি একটু আগে বলেছ যে ঘুমে মন নিশ্চেষ্ট থাকে। অবস্থা তিনটি মনের।

ভ—এ অবস্থাগুলো কি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জীবাত্মার সক্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়?

ম—এগুলো জীবাত্মা বা শরীরের নয়। জীবাত্মা সর্বদা নির্বিশেষ আর এই তিনটি অবস্থার আধার। জাগৃতি চলে যায়, আমি আছি; স্বপ্নাবস্থা চলে যায়, আমি আছি; সুষুপ্তি চলে যায়, আমি আছি। এগুলো বার বার আসে আর যায় তথাপি আমি আছি। এগুলো যেন সিনেমার পর্দার ওপর ছবির মত। এরা পর্দাকে বিচলিত করে না। অনুরূপভাবে যদিও অবস্থাগুলো চলে যায় তবুও আমি নির্বিকার থাকি। এগুলো যদি শরীরের হয়, তুমি কি সুষুপ্তিতে শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকো?

ভ—না।

ম—সেখানে শরীর সম্বন্ধে বোধ না থাক সত্ত্বেও শরীরটা ঘুমাচ্ছে কি ক'রে বলা যায়?

ভ—কারণ ঘুমিয়ে উঠলে শরীরটা দেখা যায়।

ম—শরীর বোধও একটা চিন্তা; চিন্তাটা মনের; 'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর মন ওঠে, 'আমি'-চিন্তাটাই মূল চিন্তা। যদি এটাকে ধরা যায় তাহলে অন্য চিন্তাগুলো চলে যায়। তখন আর শরীর নেই, মন নেই, এমনকি অহংকারও নেই।

ভ—সেখানে কি থাকবে?

ম—বিশুদ্ধ আত্মা।

ভ—মনের নাশ কি করে হবে ?

ম—একে নাশ করার চেষ্টা করা হয় না। এরূপ চিন্তা বা ইচ্ছাও একটা চিন্তা। যদি চিন্তককে খোঁজা যায়, চিন্তা চলে যায়।

ভ—তারা কি নিজেরাই অদৃশ্য হবে ? খুব কঠিন মনে হয়।

ম—তারা অদৃশ্য হয় কারণ তারা অসৎ। কঠিন মনে করাটা আত্মোপলব্ধির একটা বাধা। এটাকে জয় করতে হবে। আত্মায় থাকা শক্ত নয়।

ভ—বাহ্য জগতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে চিন্তা করা সোজা অন্যপক্ষে চিন্তাশূন্য হয়ে থাকা খুব কঠিন মনে হয়।

ম—এটা যুক্তিহীন ; বাইরের বস্তু দেখা সহজ আর অন্তরে দেখা কঠিন ! এর বিপরীতটাই হওয়া উচিত।

ভ—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। খুব শক্ত।

ম—কঠিন ভাবাটাই প্রধান বাধা। একটু অভ্যাস করলেই অন্যরকম মনে হবে।

ভ—অভ্যাসটা কি ?

ম—'আমি'র উৎস খোঁজা।

ভ—সেটা তো একজনের জন্মের আগের অবস্থা।

ম—জন্ম ও মৃত্যুর চিন্তা করবে কেন ? তুমি কি প্রকৃতই জন্মেছ ? মনের উদয়ই জন্ম। মনের পর শরীর-চিন্তা ওঠে আর একটা শরীর দেখা যায় ; তারপর জন্ম, জন্মের পূর্ব অবস্থা, মৃত্যু, মৃত্যুর পরের অবস্থার চিন্তা হয় - এসব মনের। জন্মটা কার হয় ?

ভ—আমি কি এখন জন্মাইনি ?

ম—যতক্ষণ শরীরটাকে 'আমি' মনে করা হয়, জন্ম সত্য। কিন্তু শরীরটা 'আমি' নয়। আত্মা জন্মায় না, আর মরেও না। নূতন কিছুই নেই। জ্ঞানীরা সবই আত্মাতে ও আত্মারই ব'লে দেখেন। এখানে নানাত্ব নেই। অতএব জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।

ভ—যদি সুষুপ্তি এত ভাল অবস্থা তবে লোকেরা সব সময়ে তাতেই থাকতে চায় না কেন ?

ম—সবাই সুষুপ্তিতেই আছে। বর্তমান জাগৃতি একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সুপ্তিতেই স্বপ্ন হয়। সুপ্তি এই তিনটি অবস্থার আধার। এই তিনটি অবস্থার প্রকাশও একটা স্বপ্ন, সেটাও আবার অপর কোন একটি সুপ্তি। এরূপে এই স্বপ্ন ও সুপ্তির অবস্থাও অনন্ত।

এই অবস্থাগুলোর অনুরূপ জন্ম ও মৃত্যুও সুপ্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখা মাত্র। প্রকৃত কথা, জন্মও নেই আর মৃত্যুও নেই।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৪৫। পার্শী মহিলাদ্বয় কুমারী গুলবাঈ ও সিবীণবাঈ বৈরামজী ঘুরে ফিরে একই বিষয়ে প্রশ্ন করছে। তাদের সব প্রশ্নের সার মর্ম হল—

"আমি বুঝতে পারছি যে আত্মা অহংকারের অতীত। আমার জ্ঞান বাস্তবিক নয়, তাত্ত্বিক। আমি কি উপায়ে বাস্তবিকভাবে আত্মাকে উপলব্ধি কবব ?"

ম—উপলব্ধি কিছু নূতন করে লাভ করার নয়। এটা রয়েছে। কেবল যা করতে হবে সেটা হল 'আমি উপলব্ধি করিনি' এই চিন্তা ত্যাগ।

ভ—তবে কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই।

ম—না। মনের স্থৈর্য ও শান্তিই উপলব্ধি। এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন আত্মা নেই।

যতক্ষণ সংশয় আছে বা উপলব্ধি হয়নি বোধ আছে ততক্ষণ এ চিন্তাগুলো ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে।

চিন্তাগুলো অনাত্মাকে আত্মা বলে ভাবার জন্য হয়। যখন অনাত্মা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন একমাত্র আত্মাই থাকে। কোথাও স্থান করতে হলে জিনিসগুলো সরালেই হয়। জায়গাটা কিছু নূতন করে আনা হয় না। কেবল তাই নয়, অধিকন্তু—ঘর জোড়া অবস্থাতেও স্থানটা আছে।

চিন্তার অভাবের অর্থ শূন্যতা নয়, শূন্যতা অনুভবের জন্যও কেউ থাকে। জ্ঞান ও অজ্ঞান মনের। এরা দ্বৈত বোধ হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত। এটা স্বয়ং প্রকাশ। এই আত্মাকে দেখার জন্য আর একটা আত্মার প্রয়োজন নেই। দু'টি আত্মাও নেই। যা আত্মা নয় সেটা অনাত্মা। অনাত্মা কখন আত্মাকে দেখতে পারে না। আত্মার কোন দেখা বা শোনাও নেই। এটা এসবের উপরে—একক, কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য।

একজন মেয়ে গলায় হার প'রে মনে করে যে সেটা হারিয়ে গেছে আর সেটা খুঁজতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ না একজন বান্ধবী তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ সে নিজেই তার অভাব, তার খোঁজার উদ্বেগ আর পাওয়ার আনন্দ সবই তৈরী করে। এরূপ তুমি খোঁজো বা না খোঁজো আত্মা সব সময়ে রয়েছে। মেয়েটি যেমন মনে করে যে হারানো হারটি আবার পাওয়া গেল তেমনি অজ্ঞান নষ্ট হয়ে যাওয়া ও মিথ্যা নির্ধারণ চলে যাওয়াতে যে আত্মা নিত্য-বর্তমান, মুহূর্তে তার প্রকাশ হয়। একেই উপলব্ধি বলে। এটা নূতন নয়। এটা অজ্ঞান দূর করা ছাড়া আর কিছু নয়।

মনকে খোঁজার ফুফল শূন্যতা। মনকে ঝাড়ে মূলে ত্যাগ করতে হবে। দেখ চিন্তক কে, অনুসন্ধিৎসু কে? ভাবক হয়ে, প্রেক্ষ্য হয়ে থাকো। সব চিন্তা মিলিয়ে যাবে।

ভ—তারপর সেখানে অহংকার থাকবে—অর্থাৎ যে চিন্তা করছিল।

ম—সেই অহংকারটা বিশুদ্ধ, চিন্তারহিত অহংকার। এটা

আর আত্মা এক। যতক্ষণ ভুল নির্ধারণ থাকবে ততক্ষণ সংশয় থাকবে, প্রশ্ন করাও থাকবে আর তার শেষও হবে না। অনাত্মার শেষ হলেই সংশয়েরও শেষ হবে। এর ফল আত্মার উপলব্ধি। সেখানে সংশয় ও প্রশ্ন করার জন্য কেউ থাকবে না। সব সংশয় নিজের মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। যত কথাই বলা হোক না কেন মন ভরবে না। চিন্তককে ধরো। একে না ধরে থাকলেই বাইরের বিষয় ওঠে বা মনে সংশয় জাগে।

২৪৬। ভাষা কেবল পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম। চিন্তা উঠলে পর একে ডাকা হয়; 'আমি'-চিন্তা উঠলেই অন্য চিন্তা ওঠে; 'আমি'-চিন্তাই সব কথাবার্তার আধার। একজন যখন চিন্তা-শূন্য অবস্থায় থাকে তখন মৌনরূপ সার্বজনীন ভাষা দ্বারা অন্যকে বুঝতে পারে।

মৌন শাশ্বত বাক্য; ভাষার নিরন্ত নির্ঝর; বলা কথায় তার গতি রুদ্ধ হয়। এই কথাগুলো সেই মৌন ভাষার বাধা। বিদ্যুৎ শক্তি তারের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। তার চলার পথে বাধা দিয়ে এখানে একটা আলো জ্বলছে বা ওখানে একটা পাখা ঘুরছে। তারে সে একটা বৈদ্যুতিক শক্তিরূপে রয়েছে। অনুরূপভাবে মৌন ভাষার ধারা-নির্ঝর, কথায় তার গতি প্রতিহত হয়।

বহু বছর ব্যাপী কথোপকথনে যা জানা যায় না, নিমিষের মধ্যে মৌন দ্বারা বা মৌনের সমক্ষে তা জানা হয়ে যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণামূর্তি ও তাঁর চারজন শিষ্য।

ওটাই সর্বোত্তম ও সর্বশক্তিমান ভাষা।

২৪৭। একটা সংশয় উঠল যে 'আমি'—'আমি' চেতনা ও 'নির্বিকল্প সমাধি' কি এক কিংবা এটা নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস।

শ্রীভগবান বললেন যে, হৃদয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে

সেটা সর্বদা রুদ্ধ থাকে, কিন্তু বিচারে সেটা খুলে যায় যার ফলে 'আমি'—'আমি' চেতনা প্রকাশ হয়। এটা আর সমাধি এক।

ভ—মূর্ছা ও ঘুমের মধ্যে কি পার্থক্য ?

ম—ঘুম হঠাৎ আসে আর যেন প্রবল শক্তিতে অভিভূত করে। মূর্ছা ধীরে ধীরে আসে আর সেখানে একটা প্রতিরোধের ভাব অনুভূত হয়। মূর্ছায় উপলব্ধি হওয়া সম্ভব কিন্তু ঘুমে নয়।

ভ—মৃত্যুর পূর্বক্ষণের অবস্থা কি ?

ম—যখন মানুষের নাভিশ্বাস শুরু হয় তখন বুঝতে হবে যে তার আর এ শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। আর একটা শরীর ধরা হয়ে গেছে আর সে দু'টির মধ্যে আসা যাওয়া করছে। শ্বাসের মধ্যে যখন মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বশ্বাস হয়, সেই আসা যাওয়ায় বোঝা যায় যে তখনও এই শরীরের বন্ধন সম্পূর্ণ কাটেনি। মা ও পালানীস্বামীর বেলায় আমি এটা লক্ষ্য করেছি।

ভ—সে অবস্থায় নূতন শরীরটা কি তার পুনর্জন্মের প্রতিরূপ ?

ম—হাঁ। যখন শ্বাস ওঠে তখন অনেকটা স্বপ্নাবস্থা, পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না।

(এখানে মনে করা যেতে পারে যে শ্রীভগবান তাঁর মার সঙ্গে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা অবধি প্রাণত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত ছিলেন। সবসময়ে একটা হাতে মাথা ধরে আর অন্য হাত বুকে রেখে বসেছিলেন। এর তাৎপর্য কি ? তিনি নিজেই পরে বলেছেন যে যতক্ষণ না জীবাত্মা হৃদয়ে পৌছাল ততক্ষণ যেন মহর্ষি ও তাঁর মার সঙ্গে একটা সংঘর্ষ চলছিল।

এখানে জীবাত্মা স্পষ্টতঃই পর পর কতগুলো সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যায় আর শ্রীভগবানের স্পর্শে একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে যা জীবাত্মাকে তার ঘুরে বেড়ানো বৃত্তি থেকে ফিরিয়ে হৃদয়ে নিয়ে আসে।

তবু সংস্কার ছিল আর তাঁর স্পর্শের আধ্যাত্মিক শক্তি ও

সেই সহজাত সংস্কারের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয়। অবশেষে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় আর জীবাত্মা পরম শান্তিতে হৃদয়ে বিশ্রাম নেয়, যা মুক্তিরই নামান্তর।

তার হৃদয়ে যাওয়া একটা অদ্ভুত সঙ্কেত দিয়ে বোঝা যায়, সেটা মহাত্মারা অনুভব করতে পারেন। সেটা অনেকটা একটা ছোট ঘণ্টার টুন টুন ধ্বনির মত।

যখন মহর্ষি পালানীস্বামীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন তখন তিনি এই সঙ্কেত পাওয়ার পর হাত তুলে নেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পালানী-স্বামীর চোখ খুলে যায়, তাতে বোঝা গেল যে পালানীস্বামীর জীবাত্মা সেই পথে চলে গেল। তার অর্থ পরজন্মে উচ্চ গতি লাভ হবে কিন্তু মুক্তি হল না। পালানীস্বামীর বেলায় এটা লক্ষ্য করার পর মহর্ষি মার ক্ষেত্রে যাতে তাঁর মুক্তি অবধারিত হয় সেজন্য জীবাত্মার হৃদয়ে আসার সঙ্কেত পাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ তাঁকে স্পর্শ করে বসে ছিলেন। এটি মায়ের মুখমণ্ডলের প্রশান্তি ও সমাহিতভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৪৮। শ্রীভগবান বললেন—

জ্ঞানী বলে 'শরীরটা আমি'; অজ্ঞানীও বলে 'শরীরটাই আমি'; পার্থক্য কি? 'আমি আছি'টাই সত্য। শরীর একটা উপাধি। অজ্ঞানী 'আমি'কে কেবলমাত্র শরীরেই সীমিত রাখে। সুষুপ্তিতে 'আমি' শরীর-নিরপেক্ষ থাকে। সেই এক 'আমি' এখন জাগৃতিতে রয়েছে। যদিও 'আমি'কে শরীরের মধ্যে রয়েছে কল্পনা করা হয় তথাপি এটা শরীর-রহিত। 'শরীরটা আমি' বলা ভুল নয়। 'আমি'ই (শরীর) এরূপ বলে, এটা ভুল। শরীরটা জড়, সে এটা বলতে

পারে না। ভুলটা হল সেই চিন্তা, যা 'আমি' নয় তাকে 'আমি' বলা। 'আমি' জড় নয়। 'আমি'টা জড় দেহ হতে পারে না। শরীরের ক্রিয়াপরতাকে 'আমি' ব'লে ভুল করা হয় আর তার ফলে দুঃখ ভোগ হয়। শরীর ক্রিয়াপর হোক বা না হোক 'আমি' মুক্ত ও আনন্দময়। অজ্ঞানীর 'আমি'টা কেবলমাত্র শরীর। এটাই মূল ভ্রান্তি। জ্ঞানীর 'আমি' শরীর ও আর সব কিছু নিয়ে। স্পষ্টতঃই এ দু'টির মধ্যে কিছু জাগে আর যত ভ্রমের সৃষ্টি করে।

উকিল শ্রীবৈদ্যনাথ আইয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি জ্ঞানীও বলে 'শরীরটা আমি' তবে মৃত্যুতে তার কি হয়?"

ম—এমনকি এইক্ষণেও সে নিজেকে শরীরের সঙ্গে এক নির্ধারণ করে না।

ভ—কিন্তু আপনি একটু আগেই বলেছেন যে জ্ঞানীও বলে 'শরীরটাই আমি'.

ম—হ্যাঁ। তার 'আমি'টা শরীরটাকে অন্তর্ভুক্ত করেই বলা হয়। কারণ তার কাছে 'আমি'র অতিরিক্ত আর কিছু নেই। শরীর পড়ে গেলে 'আমি'র কোন ক্ষতি নেই। 'আমি' সমান থাকে। শরীর যদি মৃত মনে করে তবে সে-ই প্রশ্ন করুক। সে জড় হওয়ার জন্য প্রশ্ন করতে পারে না। 'আমি' মরে না আর প্রশ্নও করে না। তবে কে মরে? কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে?

ভ—তবে কার জন্যই বা এত শাস্ত্র? এগুলো প্রকৃত 'আমি'র জন্য হতে পারে না। এগুলো নিশ্চয় অসৎ 'আমি'র জন্য। প্রকৃত আমির এসব প্রয়োজন নেই। আশ্চর্যের কথা যে অসৎ-এর জন্য এত শাস্ত্র রচনা করা হয়েছে।

ম—হ্যাঁ। ঠিক তাই। মৃত্যু কেবলমাত্র একটা চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। যে চিন্তা করে সেই-ই অসুবিধার সৃষ্টি করে। চিন্তকই বলুক মৃত্যুর পর তার কি হয়! প্রকৃত 'আমি' মৌন। 'আমি এটা, —আমি ওটা নই' ভাবা উচিত নয়। 'এটা বা ওটা' বলা ভুল। এ

সবই উপাধি। কেবল 'আমি আছি'ই সত্য। মৌনই আমি। যদি একজন ভাবে 'আমি এরূপ', অন্য একজন ভাবে 'আমি এরূপ' ইত্যাদি, সেখানেই মতের বিরোধ হয় আর এত ধর্মবাদ সৃষ্টি হয়। সত্য যা তা একভাবে থাকে; কোন সপক্ষ বা বিপক্ষ বিবৃতিতে প্রভাবিত হয় না।

ভ—মৃত্যু কি? এটা কি শরীরটা পড়ে যাওয়া নয়?

ম—তুমি কি ঘুমে সেটা কামনা কর না? তবে আর আপত্তি কিসের?

ভ—কিন্তু আমি জানি যে জেগে উঠব।

ম—হাঁ—এও একটা চিন্তা। একটা পূর্ববর্তী চিন্তা রয়েছে 'আমি জেগে উঠব'; চিন্তাগুলোই জীবনকে শাসন করে। চিন্তা থেকে মুক্তিই মানুষের স্বরূপ—পরমানন্দ।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৪৯। ম—অজ্ঞান দু'প্রকার—

(১) আত্মার বিস্মৃতি

(২) আত্মজ্ঞানের বাধা

উপায়গুলো চিন্তা দূর করার জন্য; এই চিন্তাগুলো বীজাকার সংস্কারের পুনঃপ্রকাশ; তাতেই নানাত্ব হয় আর দুঃখের উদয় হয়। উপায়—শ্রবণ, গুরুর কাছে সত্যের স্বরূপ শোনা ইত্যাদি।

শ্রবণের ফল প্রত্যক্ষ হতে পারে আর শিষ্যও তৎক্ষণাৎ সত্য উপলব্ধি করে। এটা কেবল উচ্চ অধিকারী শিষ্যের হয়।

অন্যপক্ষে শিষ্য মনে করে যে বার বার শুনেও সে সত্য উপলব্ধি করতে পারছে না। এটা কেন হয়? মনের মলিনতা—অজ্ঞান, সংশয়, ভুল নির্ধারণ এই সব বাধা দূর করতে হয়।

(ক) অজ্ঞানকে নিঃশেষে দূর করতে হলে, যতক্ষণ না তার এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হয় ততক্ষণ তাকে বার বার সত্য শুনতে হবে।

(খ) সন্দেহ দূর করতে হলে, যা শুনেছে তাকে সেই বিষয়ে মনন করতে হবে, শেষে তার জ্ঞান সকল সংশয় মুক্ত হবে।

(গ) অনাত্মাতে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি) আত্মার ভুল নির্ধারণ দূর করতে হলে, মনকে একাগ্র করতে হবে।

এগুলো সব হলে বাধা চলে গিয়ে সমাধি হয় অর্থাৎ শান্তিই রাজত্ব করে।

অনেকে বলে যে শ্রবণ, মনন ও একাগ্রতার অভ্যাস কখন ত্যাগ করবে না। এটা বই পড়ে হয় না কিন্তু মনকে অন্তর্মুখী করার দৃঢ় অভ্যাসে হয়।

সাধক কৃতোপাসক বা অকৃতোপাসক হতে পারে। প্রথমোক্ত সাধক সামান্য উদ্দীপনায় আত্মোপলব্ধি করার উপযুক্ত, সামান্য সংশয় তার বাধা থাকে; একবার গুরুমুখে শুনলেই সে বাধা সহজে দূর হয়। তার তৎক্ষণাৎ সমাধি হয়। ধরে নেওয়া হয় যে সে পূর্ব জন্মে শ্রবণ মনন করে এসেছে; এগুলো তার আর প্রয়োজন নেই।

অন্যদের পক্ষে সব উপায়গুলো করা দরকার; তাদের বহুবার শুনলেও সংশয় জাগতে থাকে; সুতরাং যতক্ষণ না সমাধি হয় ততক্ষণ এই উপায়গুলো ত্যাগ করবে না।

শ্রবণে আত্মার শরীর ইত্যাদির সহিত অভিন্নতারূপ ভ্রম দূর হয়। মননে জ্ঞানই আত্মা বলে বোধ স্পষ্ট হয়। একাগ্রতায় আত্মার আনন্ত্য ও আনন্দ প্রকাশ হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৫০। একজন ভক্ত মহর্ষির অতি পরিচিত কোন এক ব্যক্তির তাঁর সম্বন্ধে করা মন্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

তিনি বললেন, "আমি তাকে এরূপ করতে অনুমতি দিচ্ছি। আগেই অনুমতি দিয়েছি। সে আরও করুক। অন্যেরাও করুক। কেবল আমাকে শান্তিতে থাকতে দিক। এই মন্তব্যের জন্য যদি আর কেউ না আসে তবে আমার একটা বিশেষ উপকার করা হল বিবেচনা করব। এছাড়া অপবাদ দিয়ে যদি বই ছাপাতে চায় আর তা থেকে পয়সা করে, ভালই হবে। সে বইগুলো আরও তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে। অন্যগুলোর থেকে অনেক বেশী বিক্রি হবে। মিস্ মেয়োর বই দেখো। সেই বা কেন তা করবে না? সে আমার ভালই করছে", ব'লে তিনি হাসতে লাগলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

মহর্ষি যখন একলা ছিলেন আবার উপর্যুক্ত বিষয়ে কথা হল। অপবাদকারী মনে হয় তার অবিবেচনার জন্য খুবই বিপদে পড়েছে। তার নিরাপত্তার জন্য মহর্ষিকে চিন্তিত মনে হল। তিনি স্পষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, "নিজের ইচ্ছামত অর্থোপার্জন করতে দিলেও মানুষ বিপদে পড়ে। সে যদি আমাদের সহানুভূতি কাজে লাগাতো আর সুবিবেচনার সহিত কাজ করত তবে বেশ মানিয়ে চলতে পারত। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?"

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৫১। একজন সম্ভ্রান্তা, খুবই বুদ্ধিমতী, চিন্তাক্লিষ্টা মহিলা বললেন, "আপনার দয়া ও মহত্ত্বের কথা আমরা শুনেছি, মহারাজজী! আপনাকে দর্শন কবার ইচ্ছা বহুদিনের। আমি গতমাসের ১৪ই একবার এসেছিলাম কিন্তু আপনার পুণ্য-সান্নিধ্যে ইচ্ছানুরূপ সময়

থাকতে পারিনি। স্ত্রীলোক ও অল্প বয়সী হওয়ায় এত ভীড়ের মধ্যে দু-একটা সাধারণ প্রশ্ন ক'রে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের এদিকে আপনার মত মহাত্মা আর কেউ নেই মানুষের যা প্রয়োজন সবই আমার আছে, সেজন্য আমি ভাগ্যবতী। কিন্তু মনে শান্তি না থাকায় আনন্দ নেই। এখন আপনার কৃপায় যদি তা লাভ হয় সেই আশায় এসেছি।"

ম—ভক্তি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

ভ—আমি জানতে চাই কি ক'রে মনে সেই শান্তি পাব। কৃপা ক'রে আমাকে উপদেশ দিন।

ম—হাঁ—ভক্তি আর সমর্পণ।

ভ—আমি কি ভক্ত হওয়ার উপযুক্ত?

ম—সবাই ভক্ত হতে পাবে। আধ্যাত্মিক সামগ্রী সবার জন্য. কাউকে বঞ্চিত হতে হয় না—তা সে বৃদ্ধ বা যুবা, স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোক।

ভ—ঠিক সেটাই আমি জানতে চাই। আমি অল্প বয়সী ও সংসারের গৃহিণী। গৃহস্থধর্ম আছে। এ অবস্থার সঙ্গে কি ভক্তির সামঞ্জস্য হয়?

ম—নিশ্চয়। তুমি কি? তুমি শরীর নও। তুমি শুদ্ধ চেতনা। গৃহস্থধর্ম ও জগৎ বিশুদ্ধ চেতনার ওপর একটা ব্যাপার মাত্র। এটা (চেতনা) অবিচলিত থাকে। তোমার নিজের আত্মা হতে কি বাধা?

ভ—হাঁ। মহর্ষির উপদেশের ধারা সম্বন্ধে আমার আগেই জানা আছে। এটা আত্মানুসন্ধান। আমার সংশয়, সেটা গৃহস্থধর্মের সঙ্গে সুসঙ্গত কিনা।

ম—আত্মা সব সময়ে আছে। সেটা তুমি। তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। তোমার অতিরিক্তও কিছু নেই। সঙ্গতি ইত্যাদির প্রশ্ন ওঠে না।

ভ—আমি আরও স্পষ্ট করে বলি। যদিও আমি একজন অপরিচিতা তবুও আমি আমার দুঃখের কারণ বলতে বাধ্য। আমি সন্তানভাগ্যে ভাগ্যবতী। একটি ছেলে—সদ্‌ব্রহ্মচারী – গত ফেব্রুয়ারী মাসে চলে গেছে। আমি শোকে অভিভূত হই। সংসারে বিতৃষ্ণা হয়। আমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাই। কিন্তু গৃহিণীর কর্তব্য আমায় নির্জনবাস করতে দেয় না। এটাই আমার সংশয়।

ম—নির্জনবাসের অর্থ আত্মাতে থাকা। তাছাড়া আর কিছু নয়। এটার অর্থ এই নয় যে একটা পরিবেশ ছেড়ে অন্য পরিবেশে জড়ানো কিংবা এও নয় যে বাস্তব জগৎ ছেড়ে মনোময় জগতে জড়িয়ে পড়া।

পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি আত্মাতেই দর্শন হয়।

ঘুমের কথা ভেবে দেখো। কিছু ঘটেছে বলে কি সচেতন ছিলে? যদি ছেলে কিংবা জগৎ সত্য হত সেগুলো কি ঘুমের মধ্যেও তোমার সঙ্গে থাকত না? সুষুপ্তিতে তুমি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর না। আর এও বলতে পার না যে তুমি তখন আনন্দে ছিলে না। তুমি সেই একই ব্যক্তি যে এখন কথা বলছে ও সংশয় তুলছে। তোমার মতানুসারে তুমি সুখী নও। কিন্তু সুষুপ্তিতে তুমি আনন্দে ছিলে। তবে ইতিমধ্যে কি হল যে সুষুপ্তির আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল? এটা হল অহংকারের উৎপত্তি। এটাই জাগ্রত অবস্থায় নবাগত। সুষুপ্তিতে কোন অহংকার ছিল না। অহংকারের জন্মই ব্যক্তির জন্ম। এছাড়া আর কোন জন্ম নেই। যা জন্মেছে তা মরতে বাধ্য। অহংকারকে নষ্ট কর—যেটা একবার মরে যায় তার আর মরে যাওয়ার ভয় নেই। অহংকার মরে গেলেও আত্মা থাকে। সেটাই পরমানন্দ—সেই অমরতা।

ভ—সেটা কি করে করা যায়?

ম—সংশয়গুলো কার জন্য হয়েছে দেখো। সংশয়ী কে?

চিন্তক কে? সেটা অহংকার। একে ধরো। অন্য সব চিন্তা চলে যাবে। একটা বিশুদ্ধ অহংকার থাকবে; দেখ কোথা থেকে সেই অহংকারটা উঠছে। সেটাই বিশুদ্ধ চেতনা।

ভ—এটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে। ভক্তিপথে যাওয়া যায় না?

ম—সেটা ব্যক্তিগত মানসিকতা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। ভক্তি ও বিচার এক।

ভ—আমি বলতে চাই ধ্যান ইত্যাদি।

ম—হাঁ। ধ্যান একটা মূর্তি অবলম্বন ক'রে করা হয়। সেটা অন্য চিন্তাগুলোকে সরিয়ে দেয়। এক ঈশ্বরের চিন্তা আধিপত্য করে। সেটাই একাগ্রতা। এরূপে ধ্যানের বিষয় ও বিচারের বস্তু একই।

ভ—ইশ্বরকে কি মূর্তরূপে দেখা যায় না?

ম—হাঁ। মনে ঈশ্বর দর্শন হয়। মূর্তিরূপেও দেখা যায়। তবুও সেটা ভক্তেরই মনে। মূর্তি ও ঈশ্বরের দর্শন ভক্তের মনের দ্বারাই নিরূপিত হয়। এটাই শেষ কথা নয়। সেখানেও দ্বৈতবোধ আছে।

এটা স্বপ্ন দর্শনের মত। ঈশ্বর-দর্শন হলে বিচার শুরু হয়। আত্মোপলব্ধিতে তার শেষ হয়। বিচারই অন্তিম পথ।

অবশ্য কেউ কেউ বিচার সুসাধ্য, অন্যেরা ভক্তিকে সহজ মনে করে।

ভ—শ্রীপল ব্রাণ্টন কি আপনাকে লণ্ডনে দেখেন নি? সেটা কি কেবলমাত্র স্বপ্ন?

ম—হাঁ। তার একটা দর্শন হয়েছিল। সে আমাকে তার মনে দর্শন করেছিল।

ভ—তিনি কি এই স্থূলরূপ দেখেন নি?

ম—হাঁ, সেটাও তার মনে।

ভ—কি করে আত্মাকে পাব ?

ম—আত্মাকে পাওয়ার কিছু নেই। যদি আত্মাকে পাওয়া যেত তার অর্থ আত্মা নিত্যবর্তমান নয়, পরন্তু তাকে নূতন করে পেতে হবে। যা নূতন করে পাওয়া যায় তা আবার হারিয়ে যায়। সুতরাং সেটা অস্থায়ী। যেটা চিরস্থায়ী নয় তারজন্য চেষ্টা করার সার্থকতা নেই। তাই আমি বলি, আত্মা পাওয়া যায় না। তুমিই আত্মা। তুমি আগে থেকেই আছ। ব্যাপারটা হল, তুমি তোমার আনন্দময় অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অজ্ঞান আচ্ছন্ন করে আর বিশুদ্ধ পরমানন্দের ওপর একটা আবরণ দেয়। এই অজ্ঞানকে দূর করার জন্যই প্রয়াসকে নিয়োজিত করা হয়। ভুল জানাই এই অজ্ঞান। ভুল জানাটা—শরীর, মন ইত্যাদিকে আত্মা বলে জানা। এই মিথ্যা নির্ধারণকে যেতে হবে আর তখন আত্মাই থাকে।

ভ—সেটা কি করে হবে ?

ম—আত্মার অনুসন্ধানে।

ভ—খুব শক্ত। আমি কি আত্মোপলব্ধি করতে পারব, মহারাজ ? অনুগ্রহ করে বলুন। খুব কঠিন মনে হচ্ছে।

ম—তুমি আত্মাই আছ। সুতরাং আত্মোপলব্ধি সকলের সমান। উপলব্ধি সাধক বিচার করে না। 'উপলব্ধি করতে পারব কি ?' সংশয় বা 'আমি উপলব্ধি করিনি' অনুভবগুলোই বাধা। এগুলো থেকে মুক্ত হও।

ভ—কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা হওয়া চাই। সেই অভিজ্ঞতাটা না হলে আমি এই দুশ্চিন্তা থেকে কি করে মুক্ত হব ?

ম—এগুলোও মনে। এগুলো রয়েছে কারণ তুমি নিজেকে শরীরের সঙ্গে অভিন্ন মনে কর। এই মিথ্যা নির্ধারণ চলে গেলে অজ্ঞান অদৃশ্য হয় আর সত্য প্রকাশ হয়।

ভ—তবুও আমার কঠিন মনে হচ্ছে। ভগবানের ভক্তেরা তাঁর কৃপা লাভ করেছেন আর বিশেষ কষ্ট না করে উপলব্ধি করেছেন।

আমিও সেই কৃপা লাভ করতে চাই। স্ত্রীলোক হওয়া ও বহুদূরে বাস করার জন্য ভগবানের পুণ্য-সান্নিধ্যের সহায়তা যতটা ও যত ঘন ঘন লাভের ইচ্ছা তা হওয়ার উপায় নেই। হয়ত আর আসাও হবে না। ভগবানের কৃপাই আমার একমাত্র কামনা। ফিরে গিয়েও তাঁকে স্মরণে রাখতে চাই। ভগবান আমার প্রার্থনাটুকু পূরণ করুন!

ম—তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কোথাও যাও না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে শরীরটা তুমি, তোমার শরীরটা কি লক্ষ্ণৌ থেকে তিরুভন্নমালাই এসেছে? তুমি কেবল গাড়ীতে বসেছ আর একটার পর একটা যান-বাহন চলে এসেছে; শেষে তুমি বলছ তুমি এখানে এসেছ। ব্যাপারটা হল তুমি শরীর নও। আত্মার যাতায়াত নেই। জগৎ তাতে যাতায়াত করে। তুমি যা আছ কেবল তাই। তোমার কোন বিকার হয় না। সুতরাং তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া মনে হলেও, তুমি এখানে, ওখানে আর সবখানে। এই দৃশ্যগুলোরই পরিবর্তন হয়।

আর কৃপার কথা—কৃপা তোমার অন্তরে। সেটা যদি বাইরে হয় তবে তা অকিঞ্চিৎকর। কৃপাই আত্মা। তুমি কখনই তার পরিচালনার বাইরে নও। কৃপা সব সময়ে আছে।

ভ—আমি বলতে চাই যে যখনই আপনাকে চিন্তা করব, আমার মন যেন শক্তিশালী হয় আর আপনার দিক থেকেও যেন সাড়া পাই। কেবলমাত্র আমার চেষ্টার ওপর ছেড়ে দিলে হবে না কারণ সে চেষ্টা অতি দুর্বল।

ম—কৃপাই আত্মা। আমি আগেই বলেছি 'তুমি যদি ভগবানকে স্মরণ কর সেটা আত্মার প্রেরণাতেই কর।' কৃপা কি আগে থেকেই নেই? এমন মুহূর্ত কি আছে যখন তুমি কৃপার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছ না? তোমার স্মরণই কৃপার আভাস। সেটাই সাড়া, সে-ই উদ্দীপনা, সে-ই আত্মা আর সে-ই কৃপা।

দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই

ভ—সংসারে থেকেও কি আমি আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারি ?

ম—হ্যাঁ নিশ্চয়, তাই করাই উচিত।

ভ—সংসার কি একটা বাধা নয় ? সব শাস্ত্র কি সন্ন্যাস উপদেশ করে না ?

ম—সংসার তোমার মনে। জগৎ ব'লে ওঠে না 'আমি জগৎ' তাহলে এটা সব সময়ে থাকত, সুষুপ্তিতেও বাদ যেত না। যেহেতু এটা সুষুপ্তিতে থাকে না সুতরাং এটা অস্থায়ী। অস্থায়ী ব'লে দুর্বল। দুর্বল ব'লে সহজেই আত্মার দ্বারা অভিভূত হয়। আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু। আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বোধ না করাই সন্ন্যাস। অজ্ঞান চলে গেলে অনাত্মাও থাকে না। এটাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

ভ—তবে আপনি কেন অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন ?

ম—সেটা আমার প্রারব্ধ। একজনের ইহ-জীবনের ধারা তার প্রারব্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমার প্রারব্ধ এই দিকে। তোমার প্রারব্ধ ওই দিকে।

ভ—আমায় কি সন্ন্যাস নিতে হবে না ?

ম—যদি তোমার সেরূপ প্রারব্ধ হত তবে এ প্রশ্ন উঠত না।

ভ—অতএব আমার সংসারে থেকে সাধনা করা উচিত। আচ্ছা, এ জীবনে কি আত্মোপলব্ধি হবে ?

ম—এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তুমি সর্বদাই আত্মা। আন্তরিক চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। সফলতা আসতে বাধ্য।

ভ—মহর্ষি কি আমায় অনুগ্রহ ক'রে কৃপা করবেন !

মহর্ষি হাসলেন আর 'হুঁ! হুঁ!' বললেন। প্রণাম ও আশীর্বাদে এই সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হল আর তারা সদলে চলে গেল।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

২৫২। ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে স্পর্শ করেছিলেন আর বিবেকানন্দ পরমানন্দ অনুভব করেছিলেন। এটা কি সম্ভব?

ম—শ্রীরামকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্যে সবাইকে স্পর্শ করেন নি। তিনি আত্মা তৈরী করেন নি। তিনি উপলব্ধিও সৃষ্টি করেন নি। বিবেকানন্দ পক্ক (উত্তম অধিকারী) ছিলেন। তিনি উপলব্ধির জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিশ্চয় অন্যান্য সাধনাগুলো পূর্বজন্মে করে এসেছিলেন। এরূপ ঘটনা পক্ক হলেই হয়।

ভ—এরূপ অলৌকিক ঘটনা কি সবার পক্ষে হতে পারে?

ম—যদি তারা উপযুক্ত অধিকারী হয় তাহলে হয়। অধিকারী হওয়াই আসল। একজন সবল লোক দুর্বল লোককে চালনা করতে পারে। একটা শক্তিমান মন দুর্বল মনকে শাসন করতে পারে। উক্ত ঘটনায় তাই হয়েছিল। প্রভাবটা সাময়িক। বিবেকানন্দ চুপ করে বসে গেলেন না কেন? এমন অলৌকিক ঘটনা হওয়ার পর তিনি চারদিকে ঘুরতে লাগলেন কেন? কারণ প্রভাবটা সাময়িক।

ভ—মন কি করে হৃদয়ে নিমজ্জিত হবে?

ম—মন এখন নিজেকে নানাভাবে জগতরূপে দেখছে। যদি নানত্বের প্রকাশ না হয় তবে সে তার আপন সত্তায় থাকে, সেটাই হৃদয়। হৃদয়ে প্রবেশের অর্থ বিচলিত না হয়ে থাকা।

হৃদয়ই একমাত্র সত্য। মনটা একটা অস্থায়ী অবস্থা। নিজের আত্মাতে থাকার অর্থই হৃদয়ে প্রবেশ করা।

মানুষ নিজেকে শরীরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে বলেই জগতকে নিজের থেকে পৃথক দেখে। এই ভুল নির্ধারণ ওঠে কারণ সে তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে আর তার নিজস্ব অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাকে এখন এই সব ভুল ধারণা ত্যাগ করে নিজের উৎসে

ফিরে গিয়ে আত্মা হয়ে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সে অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। কোন প্রশ্নও উঠবে না।

সব শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই কেবলমাত্র মানুষকে তার মূল উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাকে নূতন ক'রে কিছু পেতে হবে না। সে কেবল তার ভুল ধারণাগুলো ও নিরর্থক উপাধিগুলো ত্যাগ করুক। এটা করার পরিবর্তে সে একটা অদ্ভুত রহস্যময় কিছু ধরতে চায় কারণ তার বিশ্বাস যে তার আনন্দ অন্য কোথাও আছে। এটাই ভুল।

সে যদি আত্মাতে থাকে, সেখানেই আনন্দ। সম্ভবতঃ সে মনে করে যে শান্ত হয়ে থাকলে পরমানন্দ অবস্থা আসে না। এটা তার অজ্ঞানের জন্য হয়। একমাত্র সাধনা, "প্রশ্নগুলো কোথা থেকে উঠছে?" খোঁজা।

ভ—কি করে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি দমন হয়?

ম—এ প্রবৃত্তিগুলো কার? খোঁজো। তুমি যদি আত্মস্থিত থাকো তবে দেখবে যে আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন সেখানে দমন ইত্যাদি ব'লেও কিছু থাকবে না।

ভ—যাকে ভালবাসি এমন কেউ মারা গেলে শোক হয়। এই শোক দূর করতে গেলে কি সবাইকে ভালবাসব, না মোটেই কাউকে ভালবাসব না?

ম—তারা নিজেরা বেঁচে আছে বলেই কেউ মারা গেলে শোক হয়। শোক থেকে উদ্ধারের উপায় বেঁচে না থাকা। যে শোক করে তাকে নষ্ট কর। কষ্ট পাওয়ার জন্য কে থাকবে? অহংকারকে মরতে হবে। এই একমাত্র উপায়।

দু'টি বিকল্পতেই এক অবস্থা। যখন সবই এক আত্মা হয়ে যায় তখন সেখানে ভালবাসা ও ঘৃণা করার জন্য কে থাকে?

ভ—সূর্যমার্গ কি? চন্দ্রমার্গই বা কি? দু'টির মধ্যে কোনটি সহজ?

ম—রবি (সূর্য) মার্গ জ্ঞানমার্গ। চন্দ্রমার্গ যোগমার্গ। ওরা

মনে করে ৭২,০০০ নাড়ী শুদ্ধ হলে সুষুম্নায় প্রবেশ হয়; মন সহস্রারে যায় আর সেখানে অমৃতক্ষরণ হচ্ছে।

এগুলো সব মনের কল্পনা। মানুষ এমনিতেই জগৎ-কল্পনার দ্বারা মুহ্যমান হয়ে আছে। যোগের নামে আরও কল্পনা যোগ করা হয়েছে। সকলেরই মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সব কল্পনা মুক্ত ক'রে তাকে বিশুদ্ধ আত্মায় অর্থাৎ চিন্তারহিত পূর্ণ চেতনায় রাখা। সোজাসুজি সেখানে যাও না কেন? যা আছে তার ওপর আরও বোঝা বাড়াও কেন?

১লা অক্টোবর, ১৯৩৬

২৫৩। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীএফ. জি. পিয়ার্স—ভগবান সদ্‌বিদ্যা অনুবন্ধে (২৭ শ্লোকে) বলেছেন, "যাদের আত্মানুসন্ধানে অহংকার নাশ হয় নি এরূপ সাক্ষরদের থেকে নিরক্ষরেরা ভালই আছে।" যদি তাই হয় তবে একজন স্কুলমাস্টারকে (যে এটা সত্য মনে করে) ভগবান কিভাবে অতি প্রয়োজনীয় আত্মার অনুসন্ধানের কাজকে তুচ্ছ না ক'রে বুদ্ধিজ জ্ঞান ও সাক্ষর শিক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দেন? এ দু'টি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি তা না হয় তবে কোন্ বয়সে আর কি উপায়ে বালক বালিকাদের অন্তরে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানের প্রেরণা দেওয়া যায়?

ম—বিদ্যার অহংকার ও যশোলাভের ইচ্ছাকে নিন্দা করা হয়েছে, বিদ্যাকে নয়। সত্যানুসন্ধানের উপযোগী বিদ্যা ও বিনয় ভাল।

[এই জিজ্ঞাসুর আর একটি অনুরোধ—

প্রশ্নকারী দু'টি মহামূল্যবান দিন ভগবান মহর্ষির সন্নিধানে কাটালেন। (এঁকে তিনি ১৭ বছর আগে কয়েক মিনিটের জন্য

পাহাড়ে দর্শন করার পর আর দেখেন নি।) তাঁর কর্তব্য তাঁকে তাঁর শরীরটাকে উত্তরে বহুদূরে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে আর হয়ত বহু বছর তিনি এখানে আসতেও পারবেন না।

তিনি বিনয়ের সঙ্গে ভগবানকে অনুরোধ করলেন যে ভগবান যেন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখেন আর আত্মানুসন্ধানে সাহায্য করতে থাকেন। ভগবান মিষ্টি করে হাসলেন।]

২৫৪। শ্রীডানকান গ্রীনলেস শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে কয়েকটি শ্লোক বললেন যাদের অর্থ এরূপ —

"আত্মাকে নিজের মধ্যে নির্মল আকাশের মত দেখ, সবার সত্তায়, ভিতরে ও বাইরে।"

"লজ্জা ত্যাগ ক'রে পড় পায়, একজন চণ্ডাল, গাভী কি গর্দভের।"

"যাবৎ সব কিছুর মধ্যে 'অহম্' অনুভব না হয়, কায়মনে সবার পূজা।"

"সম্যক জ্ঞানে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, একবার স্পষ্ট হলে সকল বাসনা ক্ষয়, অবস্থান আত্মায়।"

তিনি তারপর এই প্রশ্নগুলো করলেন—

ভ—এটাই কি আত্মোপলব্ধির প্রকৃত পথ? না তার থেকে প্রথমে সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন অভ্যাস ক'রে তারপর 'আমি কে?' অনুসন্ধানে সেই 'অতি মানস'কে খোঁজা ভাল?

ম—হাঁ। যখন তুমি সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন করছ তখন ঈশ্বর চিন্তা কর, কি কর না? ঈশ্বরকে সর্বময়রূপে দেখার জন্য নিশ্চয়ই তোমায় ঈশ্বরকে মনে রাখতে হয়। ঈশ্বরকে মনে রাখাই ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান উপলব্ধির পূর্বাবস্থা। উপলব্ধি আত্মাতেই হয়। এর আগে ধ্যান হওয়া চাই। ঈশ্বরের ধ্যান বা আত্মার ধ্যান কর কিছু এসে যায় না। লক্ষ্য এক।

তুমি কিন্তু আত্মাকে ছাড়তে পার না। তুমি সবেতে ঈশ্বর দর্শন করতে চাও, কেবল নিজের মধ্যে ছাড়া? যদি সবই ঈশ্বর হয়, তুমিও কি তাদের মধ্যে নও? নিজে ঈশ্বর হলে সব কিছু ঈশ্বর হওয়া আর এমন কি আশ্চর্য? এমনকি অভ্যাস করার জন্যও একজন দর্শক ও ভাবক আছে। সে কে?

ভ—কবিতা পাঠ, গান, জপ ও ভজন ইত্যাদি, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন, মহাজনদের জীবনী পাঠে এক এক সময়ে একটা প্রকৃত তন্ময়তা অনুভূত হয়। এরূপ গভীর আনন্দময় শান্তি (যেখানে ব্যক্তিসত্তার কোন স্থান নেই) কি ভগবান যার কথা বলেন সেই 'হৃদয়ে প্রবেশ'? এই অভ্যাস কি আরও গভীর সমাধি ও অবশেষে সত্যের পূর্ণ দর্শনে পর্যবসিত হবে?

ম—আবার, সুন্দর দৃশ্য ইত্যাদিতে আনন্দ আছে। এ আনন্দ আত্মার অন্তর্নিহিত। সে আনন্দ পরক্ বা দূরে নয়। তুমি যাকে সুখময় অবস্থা মনে করছ সেই সময়ে তুমি তোমার আত্মায় ডুবে যাচ্ছ! এই ডুবে যাওয়াতেই স্বতঃসিদ্ধ আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু ধারণার সম্বন্ধের জন্যই এই আনন্দকে তুমি সেই বস্তু বা ঘটনার ওপর আরোপ করছ। বস্তুতঃ এটা তোমার মধ্যে। এইসব ঘটনাকালে অজ্ঞাতসারে হলেও তুমি আত্মাতেই ডুবে যাচ্ছো। এই ডুবে যাওয়া যদি সচেতনভাবে হয়, তুমি একে উপলব্ধি বল। আমি চাই, তুমি সচেতনভাবে আত্মাতে অর্থাৎ হৃদয়ে নিমজ্জিত হও।

২১৫। ভ—আত্মা যদি সর্বদা অনুভবনীয় বস্তু হয় তবে আমাদের শান্ত হয়ে থাকলেই হয়, তাই না?

ম—যদি কোন বিষয়ে চঞ্চল না হয়ে শান্ত হয়ে থাকতে পারো তবে খুবই ভাল হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কেবল উপলব্ধির বিষয়ে চুপ ক'রে বসে থেকে কি হবে? যতক্ষণ কর্ম প্রেরণা আছে ততক্ষণ আত্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৫৬। সৃষ্টির ক্রমে মন্দজ্ঞানীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন হল। সংশয় হল মন্দজ্ঞানী 'কেবল নির্বিকল্পে'র নীচের অবস্থায় থাকে কি না।

ম—এমনকি 'তনুমানসী' অবস্থায়ও 'কেবল নির্বিকল্প' সমাধি হতে পারে।

ভ—বলা হয়, মধ্যম ও উত্তম জ্ঞানীরা জীবনমুক্ত। যদি 'তনুমানসা' অবস্থায় 'কেবল নির্বিকল্প' সমাধি হয় তবে মন্দজ্ঞানীর অবস্থাকে কি বলে?

ম—তাকে 'সত্ত্বাপত্তি' আর মধ্যম ও উত্তম জ্ঞানীকে যথাক্রমে 'অসংসক্তি' ও 'পদার্থাভাবিনী' অবস্থায় আছে বলা যায়। এই মন্দ, মধ্যম ও উত্তম বিভাগ প্রারব্ধানুসারে। যদি প্রারব্ধ প্রবল হয় জ্ঞানী মন্দ; যদি মধ্যম হয় জ্ঞানীও মধ্যম; যদি দুর্বল হয় তবে উত্তম; যদি অতি দুর্বল হয় তবে সে তুর্য্যগা অবস্থায় থাকে।

সমাধি অবস্থা বা জ্ঞানের কোন পার্থক্য নেই। এই শ্রেণী বিভাগ কেবল দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভ—তনুমানসী ও মুমুক্ষুত্ব কি এক?

ম—না। ছ'টি গুণ বিবেক, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব ইত্যাদি 'শুভেচ্ছা'র পূর্বগামী। জ্ঞানের প্রথম স্তর শুভেচ্ছা মুমুক্ষুত্বকে অনুসরণ করে, তারপর বিচারণা, তারও পর তনুমানসা। প্রত্যক্ষ দেখা সত্ত্বাপত্তি (উপলব্ধি)।

এসব আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তিকেও ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কখন কখন দেহ থাকতে বিদেহমুক্তি হয়েছে বলা হয়। বস্তুতঃ 'অহমে'র (আমির) আর একটা নাম মুক্তি।

জ্ঞানের সপ্তভূমি—(১) শুভেচ্ছা (জ্ঞান লাভের ইচ্ছা); (২) বিচারণা (শ্রবণ, মনন); (৩) তনুমানসী (মনের তনুতা বা ক্ষীণতা); সত্ত্বাপত্তি (উপলব্ধি); (৫) অসংসক্তি (অনাসক্তি).

(৬) পদার্থাভাবিনী (পদার্থজ্ঞানের অপ্রকাশ); (৭) তুর্য্যগা (অনির্বচনীয়)।

যারা শেষোক্ত চারটি ভূমি লাভ করেছেন তাঁদের যথাক্রমে ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয় ও ব্রহ্মাবিদ্বরিষ্ঠ বলে।

২৫৭। ডিণ্ডিগুলের জনৈক যুবক শ্রীভগবানকে বললে যে এখানে কয়েকদিন থেকে সে এই বুঝেছে যে তাকে মাত্র 'আমি কে?' অনুসন্ধান করতে হবে। সে জানতে চাইলে আর কোন সংযম অভ্যাস করতে হবে কিনা আর এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে "কোথায় অনুসন্ধান করব?" অর্থাৎ সে এটা গুরু সন্নিধানে (গুরুর সমীপে) করবে কি না।

ম—যেখানে 'আমি' আছে সেখান থেকেই অনুসন্ধান করা উচিত।

ভ—লোকে চরম কল্যাণের জন্য কত চেষ্টা করে। মনে হয় তারা ঠিক পথে চলে না। শ্রীভগবান বহু তপস্যা ক'রে লক্ষ্যে পৌঁচেছেন। শ্রীভগবান চান যে সকলেই লক্ষ্যে পৌঁছাক; তিনি তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক। তাঁর আমাদের প্রতিনিধি হয়ে তপস্যা করাতে অন্যের লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়েছে। শ্রীভগবান যে সব কঠিন তপস্যা করেছেন তাদের আর সে সব করার দরকার নেই। শ্রীভগবান তাদের পথ সহজ ক'রে দিয়েছেন। আমি কি ঠিক বলছি?

ভগবান হাসলেন ও বললেন—তা যদি হত তবে সবাই সহজে লক্ষ্যে পৌঁছাত কিন্তু প্রত্যেককেই নিজের কাজ করতে হবে।

২৫৮। মহীশূরের একজন যুবক একটা লেখা কাগজ ভগবানকে দিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলে। সে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছে যে তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য মহাত্মা কোথায় পাওয়া যাবে। সে স্বীকার করেছে যে মহাত্মাদের সাহায্যে ঈশ্বর লাভের কামনায় সে বাড়ীতে না বলে এসেছে। এ কথাও সত্য যে সে ঈশ্বর

বা তাঁর অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সেজন্য সে মহাত্মাদের দর্শন করতে চায়।

শ্রীভগবান কাগজটা ফেরত দিয়ে বললেন—আমাকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তা না দিলে আমি আর মহাত্মা নই।

ছেলেটি কাগজটা ছিঁড়ে আর একটা লিখলে, তাতে লখা ছিল, "আপনি কাঠবিড়াল ও খরগোশের ওপর দয়াশীল। তারা আপনার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করলে আপনি তাদের আদর করেন। অপরপক্ষে আপনি মানুষের প্রতি উদাসীন। উদাহরণসরূপ আমি বাড়ী ছেড়ে এসেছি আর পনের দিন এখানে অপেক্ষা করছি। কতদিন এমন হয়েছে যে আমার আহার হয় নি। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি তবুও আপনি দৃক্‌পাত করেন না।"

ম—দেখ বাপু। আমার কোন দূরদর্শন ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর আমাকে এরূপ বর দেন নি। আমি কি করতে পারি? কি করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো? লোকে আমায় মহর্ষি বলে ও সেইমত ব্যবহার করে। আমি নিজেকে মহর্ষি মনে করি না। অপর পক্ষে আমার কাছে সবাই মহর্ষি। এই অল্পবয়সে তুমি যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করছ সেটা খুবই ভাল। তাঁর প্রতি একাগ্র হও। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিজের কাজ করে যাও। ব্যস্, এইটুকুই যা করতে হবে।

২৫৯। নাদ, বিন্দু ও কলা যথাক্রমে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি।

ঈশ্বর নাদের অতীত।

নাদ, জ্যোতি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর এ সবের অতীত।

রক্তের সঞ্চালন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং আরও অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াতে শব্দ হতে বাধ্য। সেগুলো অনৈচ্ছিক ও ধারাবাহিক। সেটাই নাদ।

২৬০। সানডে টাইম্‌স্‌-এ 'এ হারমিট ইন দি হিমালয়াস্‌' বইটির সংক্ষিপ্ত-সার দেখা গেল। এতে পূর্বজন্মের স্মৃতির সম্বন্ধে লেখা আছে। এই বই-এ শ্রীপল ব্রান্টন এই শক্তি লাভের জন্য বৌদ্ধ প্রণালী অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন। শ্রীভগবান বললেন, "এক দল লোক আছে যারা তাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জানতে চায়। তারা বর্তমানটা অগ্রাহ্য করে। পূর্বজন্মের দায়েই বর্তমান কষ্ট। পূর্বজন্ম স্মরণ করার চেষ্টা একটা সময় নষ্ট।"

২৬১। পুনর্জন্মের উল্লেখ হল। শান্তি দেবীর পুনর্জন্ম মানুষের কাল ও মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু সর্বশেষ ঘটনার, সাত বছরের ছেলের ব্যাপারটা অন্যরকম। ছেলেটির বয়স এখন সাত বছর। সে তার পূর্বস্মৃতি বলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে তার আগের শরীর মাত্র দশ মাস আগে ত্যাগ হয়েছে।

প্রশ্ন হল, পূর্বের শরীর ছাড়ার আগে ছ'বছর দু'মাস ব্যাপারটা কিভাবে ছিল। আত্মা কি সে সময়ে এক সঙ্গে দু'টি শরীরে ছিল ?

শ্রীভগবান বললেন যে, সাত বছর ছেলেটির পক্ষ থেকে আর দশমাস দর্শকের পক্ষ থেকে। পার্থক্যটা দু'টি উপাধির পার্থক্যের জন্য। ছেলেটির সাত বছরের অভিজ্ঞতা দর্শকের দিক থেকে তার নিজের কালমান অনুযায়ী দশমাস মনে হচ্ছে।

শ্রীভগবান আবার যোগবাশিষ্ঠের লীলার উপাখ্যানের উল্লেখ করলেন।

২৬২। মুসলমান অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ এখন এখানে রয়েছেন। তাঁর একজন সন্দেহবাদী বন্ধু তাঁর বিরোধিতা ক'রে জিজ্ঞাসা করে "তোমার মহর্ষি কি অলৌকিক ক্রিয়া করতে পারেন ?" তিনি উত্তর দিয়েছেন যে সাধারণ মানুষ পশুর থেকে বেশী কিছু নয়, তাকে মানবতা

প্রদান করা হয়েছে আর আমরা তাঁর সন্তান হওয়ায় মহর্ষির কাছে শক্তি লাভ করি। "ক্লান্তিহর শান্তিতে হৃদয় ভরিয়ে দেওয়াই সব থেকে বড় অলৌকিক ক্রিয়া, মহর্ষি তা পারেন", তিনি জানতে চাইলেন তাঁর এই উত্তর ঠিক হয়েছে কি না।

অন্য লোকটি জিজ্ঞাসা করে, "তাতে আমাদের কি লাভ?" আমি উত্তর দিলাম, "এক শান্তি সমানভাবে সকল দর্শনার্থীর ওপর বর্ষিত হয়। শ্রীপল ব্রান্টন তাঁর বই-এ এর উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক লোক প্রতিদিন তাঁর সান্নিধ্যে এটা অনুভব করে।"

এইসব কথাবার্তা শ্রীভগবানকে বলা হল আর তার সঙ্গে এও যোগ করা হল—

পরশুরাম বলেছেন যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পথে দেখা হলে তিনি একটা ক্লান্তিনাশিনী শান্তি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে মহাত্মা বলে চিনতে পারলেন। এইরূপ শান্তি কি মহাত্মাদের উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ নয়? এ ছাড়া আরও কিছু কি আছে?

শ্রীভগবান বললেন—একজন মধ্ব সম্প্রদায়ের মহাত্মা তত্ত্বারোয়ার তাঁর গুরু স্বরূপানন্দের সম্বন্ধে একটা 'ভরণী' রচনা করেছিল। পণ্ডিতেরা এই রচনায় আপত্তি করলে যে, 'ভরণী' কেবল যে যুদ্ধে সহস্র হস্তী বধ করতে পারে তার সম্বন্ধে লেখা হয়, অপরপক্ষে স্বরূপানন্দ একজন কোথাও অলসভাবে বসে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তি; সে এরূপ প্রশংসাবাদের উপযুক্ত নয়। তারা যাতে নিজেরাই বিচার করতে পারে যে তিনি সহস্র হস্তী বধ করতে পারেন কিনা সেজন্য তত্ত্বারোয়ার সবাইকে তার গুরুর সমীপে একত্র হতে বললে। তারা সেখানে পৌঁছানমাত্র নীরব হয়ে গেল আর নিথর হয়ে সেই অতিশয় সুখকর শান্তিময় পরিবেশে কয়েকদিন কাটালে। তাদের সম্বিৎ ফিরলে, তারা গুরু ও শিষ্যকে প্রণাম করে বললে যে তারা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। স্বরূপানন্দ যোদ্ধাদের অপেক্ষা শক্তিমান কারণ তিনি

অহংকারকে নষ্ট করতে পেরেছেন, এই কাজ সহস্র হস্তী বধ করা অপেক্ষা কঠিন।

মহর্ষি বললেন যে গল্পের নীতিবাক্য স্পষ্ট। শান্তিই মহাত্মার উপস্থিতির একমাত্র নির্ণায়ক।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৬

২৬৩। ডঃ সৈয়দ—শ্রীভগবান বলেন হৃদয়ই আত্মা। মনস্তত্ত্ব বলে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ও আর সব প্রবৃত্তি হৃদয়ে থাকে। এ দু'টির সামঞ্জস্য কি করে হয়?

ম—হৃদয়ের একটা সূচীছিদ্রের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই প্রবৃত্তিগুলো ব্রহ্মাণ্ডের অংশ। ওগুলো অবিদ্যা (অজ্ঞান)।

ভ—অবিদ্যা কি করে উদয় হয়?

ম—অবিদ্যা মায়ার মত [যা নাই তাই মায়া (ভ্রম)]। অনুরূপভাবে যা নাই তাই অজ্ঞান। সেজন্য এ প্রশ্ন ওঠে না। তা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন হয়। তবে জিজ্ঞাসা কর 'অবিদ্যাটা কার?' অবিদ্যা অজ্ঞান। এটা বিষয়ী ও বিষয়ের দ্যোতক। বিষয়ী হও, সেখানে আর বিষয় থাকবে না।

ভ—অবিদ্যা কি?

ম—আত্মাকে না জানা। কে আত্মাকে জানে না? আত্মাই আত্মাকে জানে না। আত্মা কি দুজন?

২৬৪। ভ—ভগবান কি জগতকে নিজের অপরিহার্য অংশ বলে দেখেন? তিনি কিভাবে জগতকে দেখেন?

ম—আত্মাই একমাত্র আছে আর কিছু নেই। তবু অজ্ঞানের জন্য ভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ভেদ তিন প্রকার—(১) সজাতীয় (একই

প্রকার) ; (২) বিজাতীয় (অন্য প্রকার) ; আর (৩) স্বগত (নিজের অংশ)। জগৎ আত্মার মত আর একটা আত্মা নয়। আত্মা থেকে পৃথক নয় ; আবার আত্মার অংশও নয়।

ভ—জগৎ কি আত্মাতে প্রতিফলিত হয় না ?

ম—প্রতিফলনের জন্য একটা বিষয় ও তার প্রতিবিম্বের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মাতে এসব স্বীকৃত হয় না।

ভ—তবে কি ভগবান জগৎ দেখেন না ?

ম—কাকে ভগবান বল ?

ভ—আমার থেকে কোন এক উন্নত জীব।

ম—তুমি যদি তোমার জীবকে বুঝতে তবে অন্য জীবও জানা হয়ে যেত।

ভ—আমি আলোচনা করতে চাই না। শিখতে চাই। আমায় উপদেশ করুন।

ম—শিখতে চাও বলেই আলোচনা অপরিহার্য। এসব ছাড়ো। ঘুমটা বিবেচনা কর। তখন কি বন্ধনের বোধ থাকে বা মুক্তির উপায় খোঁজো ? তুমি কি তখন শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকো ? বন্ধনের বোধ শরীরের সঙ্গে যুক্ত। নতুবা কোন বন্ধন নেই, যা দিয়ে বাঁধা যায় তাও নেই ; যাকে বাঁধা হয় তাও নেই। তথাপি তোমার জাগ্রত অবস্থায় এগুলো সব মনে হয়। বিবেচনা কর, মনে হওয়াটা কার।

ভ—মনের।

ম—মনকে লক্ষ্য কর, তোমায় মন থেকে দূরে দাঁড়াতে হবে। তুমি মন নও। আর তখন আত্মাই অবশিষ্ট থাকবে।

ভ--ভগবান কি ক্রম-বিকাশ বিশ্বাস করেন ?

ম—বিকাশ নিশ্চয়ই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা হওয়া। যখন কোন পার্থক্যই স্বীকার করা হচ্ছে না তখন আর বিকাশ কি করে হয়।

ভ—শ্রীকৃষ্ণ কেন বললেন 'অনেক জন্মের পর সাধক জ্ঞান লাভ করে আর আমায় জানে,' তাহলে নিশ্চয় ক্রম-বিকাশ আছে।

ম—ভগবদ্গীতা কিভাবে শুরু হল? 'আমিও নেই, তুমিও নেই, রাজারাও নেই ইত্যাদি', 'এটা জন্মায় না, মরেও না।' সুতরাং কোন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে তাও নেই। সত্য ছিল; আছে; থাকবে। এটা অপরিবর্তনশীল। পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কি করে আদিত্যের পূর্বে ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে অর্জুন তাঁকে স্থূল শরীর বলে ভুল করছে, সেজন্য সেইভাবে বললেন। যে ভেদ দেখে তার জন্য উপদেশ। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর দিক থেকে তাঁর বা অন্যের কোন বন্ধন বা মুক্তি নেই।

ভ—সবাই মুক্ত?

ম—সবাই কোথায়? মুক্তি বলে কিছু নেই। বন্ধন থাকলে তো মুক্তি। আসলে কোন বন্ধন নেই, সে অনুসারে মুক্তিও নেই।

ভ—জন্ম-জন্মান্তরে বিকাশ হতে গেলে অভ্যাস চাই, বহু বছরের অভ্যাস।

ম—অভ্যাস কেবল অন্তর্নিহিত শান্তির বাধাকে দূরে রাখা। অনেক বছরের প্রশ্ন নেই। এই মুহূর্তে এ চিন্তাকে থামাও। অভ্যাস কর বা না কর তুমি সর্বদাই স্বরূপে আছো।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—তবে সবাই উপলব্ধি করে না কেন?

ম—এটা একই প্রশ্ন অন্যভাবে বলা হল। এ প্রশ্ন তুলছ কেন? যেহেতু অভ্যাসের কথা তুলছ তার অর্থ তোমার অভ্যাস দরকার। করো।

কিন্তু প্রশ্ন ও সংশয় ছাড়া থাকাই স্বরূপ।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন; মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। দু'জনেই কেবলমাত্র নাম ও রূপের স্রষ্টা। প্রকৃত কথা, ঈশ্বর বা মানুষের সৃষ্টি হয়নি!

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৬

২৬৫। সেই সম্ভ্রান্তা মহিলাটি কয়েকদিন পরে আবার এসে সোজা ভগবানের নিকটে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, "গতবার স্বামী ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে এসেছিলাম। সময়ও কম ছিল আর তাঁদেব খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবছিলাম। সুতরাং ইচ্ছামত এখানে থাকতে পারিনি। পরে ব্যস্তভাবে দর্শনের জন্য মন খারাপ হয়, তাই এখন শান্ত হয়ে শ্রীভগবানের কৃপা অনুভবের ইচ্ছায় ফিরে এসেছি। কৃপা ক'রে আমার মনে শক্তি দিন।"

ঘরটি আগেই খালি করানো হয়েছিল। তিনি শ্রীভগবানের সামনে একটা সাধারণ আসনে বসলেন। শ্রীভগবান হেসে বললেন, "হাঁ, মৌনই অখণ্ড বাক্য। সাধারণ কথা অন্তরের আদান-প্রদানের বাধা।"

তিনিও সম্মত হয়ে নীরবে বসে রইলেন। শ্রীভগবান সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি মহিলার দিকে, মুখে করুণাপূর্ণ হাসি। দু'জনে এরূপ স্থির মৌন হয়ে একঘণ্টা কাটালেন।

প্রসাদ দেওয়া হল। মহিলা বললেন, "এখন ফিরে যেতে চাই। বাঙ্গালোর আর এখানে আসার রাস্তার মধ্যে একটা নদীতে বান এসেছে। আসার পথে বানের টানে একটা বাস উল্টে গেছে দেখলাম। আমার গাড়ী পিছনে আসছিল। এই দুর্ঘটনা দেখলাম। তবুও নদী পার হতে ভয় হল না। গাড়ীও নিরাপদে পেরিয়ে এল। দিনে দিনেই ফিরতে চাই।

"এবার আর আগের মত, যেমন আগে কয়েকবার বলেছি, শেষবার আসা বলব না। কি জানি, হয়ত তাই হবে। তথাপি মহর্ষি আমার মনে শক্তি দিন।

"আমি ভক্তি কামনা করি। আমার আকূতি যেন আরও

বৃদ্ধি পায়। আমার কাছে এমন কি আত্মোপলব্ধিরও কোন গুরুত্ব নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা যেন আরও প্রবল হয়।"

ম—যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তুমি না চাইলেও উপলব্ধি জোর ক'রে হবে। শুভেচ্ছা উপলব্ধির দুয়ার।

ভ—তাই যেন হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা থাকলেই আমি সন্তুষ্ট হব। এখান থেকে দূরে গেলে আমার ভক্তি যেন হ্রাস না হয়। শ্রীভগবান কৃপা ক'রে মনে বল দিন। এরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁর কৃপাতেই হতে পারে। আমি নিজে খুবই দুর্বল।

আবার, আগের বার যখন এসেছিলাম, অনেক প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু আমি শ্রীভগবানের উত্তরগুলো বুঝতে পারি নি! আমি ভেবেছিলাম আর প্রশ্ন করব না; কেবল নীরবে বসে তাঁর সান্নিধ্যের শান্তি, যা আমার ওপর বর্ষিত হবে, আহরণ করব। সেজন্য এবার আব মহর্ষিকে প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করব না। কেবল তাঁর কৃপা প্রার্থনা করি।

ম—তোমার বার বার এখানে আসা কৃপারই লক্ষণ।

তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এখুনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যে তিনি আমাকে ডেকেছেন কি না; কারণ হঠাৎ আমার স্বামী আজ সকালে আমায় বললেন, 'দু'দিন সময় আছে। মহর্ষিকে দেখে আসতে পারো'।"

"আমি আশ্চর্যচকিত ও আনন্দিত হলাম আর এটা মহর্ষির আহ্বান ব'লে মনে করলাম।"

তিনি মহর্ষির কাছাকাছি বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ও আশীর্বাদ চাইলেন।

মহর্ষি বললেন—একটা উচ্চ শক্তি তোমায় পরিচালিত করছে। তার দ্বারা চালিত হও!

ভ—কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে সচেতন নই। আমায় সে সম্বন্ধে সজাগ করুন।

ম—সে শক্তি জানে কি করতে হবে ও কিরূপে করতে হবে। তাকে বিশ্বাস কর।

২৬৬। মুসলমান অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন—কামনা ত্যাগ করতে বলা হয়। কিন্তু শরীরের অনেক প্রয়োজন আছে, সেগুলো দমন করা যায় না। কি করা উচিত?

ম—একজন সাধকের তিনটি প্রয়োজনীয় গুণ থাকা আবশ্যক, (১) ইচ্ছা; (২) ভক্তি; (৩) শ্রদ্ধা। ইচ্ছার অর্থ আসক্তিশূন্য হয়ে শারীরিক প্রয়োজন মেটানো (যথা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শৌচাদি ক্রিয়া)। এটা না করলে ধ্যানের উন্নতি হয় না। ভক্তি ও শ্রদ্ধা আগেই জানা আছে।

ভ—ইচ্ছা দু'প্রকার—শুভ ও অশুভ। আমাদের কি অশুভ ইচ্ছাকে শুভ ইচ্ছায় পরিণত করা কর্তব্য?

ম—হাঁ।

ভ—আচ্ছা ভগবান, আপনি বললেন তিনট আবশ্যিক গুণের মধ্যে ইচ্ছা হল স্বাভাবিক প্রয়োজন ইত্যাদি আসক্তি শূন্য হয়ে মেটানো। আমি দিনে তিন চারবার খাই আর শরীরের এত প্রয়োজন মেটাতে হয় যে আমি শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এমন একটা অবস্থা কখনো কি হবে যখন আমি শরীরবোধশূন্য হব আর শরীরের দাবীর অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবো?

ম—আসক্তি (অনুরাগ ও দ্বেষ) ক্ষতিকর। কাজগুলো খারাপ নয়। তিনচারবার খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেবল 'আমি এই খাবারটা চাই আর ওটা চাই না' ইত্যাদি বলো না।

তাছাড়া তুমি জাগ্রত অবস্থায় বারো ঘণ্টায় এই খাদ্য গ্রহণ কর কিন্তু ঘুমের সময়ে খাও না। ঘুমেতে কি মুক্তি লাভ হয়? কেবল কাজ না করলে মুক্তি হয় এ ধারণা ভুল।

ভ—লোকে বলে সদেহ ও বিদেহ মুক্ত আছে।

ম—মুক্তিই নেই তো মুক্ত কোথায় ?

ভ—হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তির কথা বলে না ?

ম—মুক্তি আত্মার সমার্থ। জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তি এসব অজ্ঞানীর জন্য। জ্ঞানী মুক্তি বা বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন নন। বন্ধন, মুক্তি ও মুক্তির বিভাগ এসব অজ্ঞানীর অজ্ঞান দূর করার জন্য। কেবল মুক্তিই আছে আর কিছু নেই।

ভ—ভগবানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা ঠিক। কিন্তু আমাদের কি হবে ?

ম—'তিনি' ও 'আমি' এই ভেদই জ্ঞানের বাধা।

ভ—এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে ভগবান উচ্চ কোটির পুরুষ আর আমরা সীমিত মানুষ। ভগবান কি আমাকে তাঁর মতন করবেন ?

ম—তুমি কি তোমার সুষুপ্তিতে তোমার সীমিতভাব জানতে ?

ভ—আমি আমার সুষুপ্তির অবস্থা এখন আনতে পারি না, আর বলতেও পারি না।

ম—তোমায় তা করতেও হবে না। অপরিবর্তনশীল আত্মার সামনে এই তিনটি অবস্থা পর্যায়-ক্রমে হয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার সুষুপ্তির অবস্থা স্মরণ করতে পারো। সেটাই তোমার প্রকৃত অবস্থা। তখন কোন সীমিতভাব ছিল না। 'আমি'-চিন্তা হওয়ার পরই সীমাবদ্ধতা জেগেছে।

ভ—কি করে আত্মা লাভ হবে ?

ম—আত্মা লাভ করার কিছু নেই কারণ তুমিই আত্মা।

ভ—হাঁ। একটা অপরিবর্তনশীল আত্মা ও একটা পরিবর্তনশীল কিছু আমার মধ্যে আছে। দু'টি আত্মা।

ম—পরিবর্তনশীলতা একটা কল্পনামাত্র। সব চিন্তাই 'আমি'-চিন্তা ওঠার পর জাগে। চিন্তাগুলো কার ওঠে, দেখো। তাহলেই এদের অতীত হতে পারবে আর তারাও থেমে যাবে। তার অর্থ

'আমি'-চিন্তার মূল উৎস খুঁজে তাতে ফিরে যাওয়া ; তুমি পূর্ণ 'আমি' 'আমি' বোধ অনুভব করবে। আত্মারই নাম 'আমি'।

ভ—আমি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ধ্যান করব ?

ম—'আমি ব্রহ্ম' এই বাক্য চিন্তা করার জন্য নয়। 'অহম্' (আমি) সবার জানা। ব্রহ্ম 'অহম্'রূপে সবার মধ্যে আছে। 'আমি'কে খোঁজো। 'আমি'ই ব্রহ্ম। তোমাকে এরূপ ভাবতে হবে না। কেবল 'আমি'কে খোঁজো।

ভ—শাস্ত্রে কি কোষত্যাগের কথা নেই ?

ম—'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর সেই 'আমি'কে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির সঙ্গে ভুল নির্ধারণ হয়। ভুল ক'রে 'আমি'কে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, আর প্রকৃত 'আমি' দৃষ্টির অগোচর হয়। প্রকৃত 'আমি'কে মলিন 'আমি' থেকে পৃথক করার জন্য কোষত্যাগের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাৎপর্য ঠিক অনাত্মাকে ত্যাগ করা নয়, প্রকৃত আত্মাকে খোঁজা।

প্রকৃত আত্মা একটা অসীম 'আমি'—'আমি' বোধ অর্থাৎ 'আমি'র পূর্ণাবস্থা। এটা শাশ্বত। এর আদি নেই, অন্তও নেই। অন্য 'আমি' জন্মায় ও মরে। এটা অস্থায়ী। এই পরিবর্তনশীল চিন্তাগুলো কার দেখো। দেখা যাবে যে সেগুলো 'আমি'-চিন্তা হলেই হয়। 'আমি'-চিন্তাকে ধরো। এগুলো চলে যাবে। 'আমি'-চিন্তার মূল উৎসে ফিরে যাও। কেবল আত্মাই অবশিষ্ট থাকবে।

ভ—অনুসরণ করা খুব কঠিন। আমি তত্ত্বটা বুঝেছি কিন্তু সাধনাটা কি ?

ম—যারা আত্মার অনুসন্ধান করতে পারে না তাদের জন্য অন্য উপায় বলা হয়েছে। এমনকি 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বলার জন্য বা চিন্তা করার জন্য একজন কর্তা চাই। সেটা কে ? সেটা 'আমি'। সেই 'আমি' হও। এটাই ঋজু (সোজা) পথ। সব পথই অবশেষে এই আত্মানুসন্ধানের পথেই নিয়ে আসবে।

ভ—আমি 'আমি' সম্বন্ধে সচেতন। তবুও আমার সমস্যা যাচ্ছে না।

ম—এই 'আমি'-চিন্তা বিশুদ্ধ নয়। এটা শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত হওয়ায় মলিন। সমস্যাটা কার দেখার চেষ্টা করো। এটা 'আমি'-চিন্তার। এটাকে ধরো। তাহলে সব চিন্তা চলে যাবে।

ভ—হাঁ, কি করে করা যায় ? সেই তো সমস্যা।

ম—'আমি' 'আমি' 'আমি' চিন্তা করো আর সব চিন্তা ছেড়ে সেই একটা চিন্তাকে ধরে থাকো।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৬

২৬৭। শ্রীভগবান তাঁর পাহাড়ের জীবজন্তু সাথীদের কথা বলতে গিয়ে আভৈয়ারের একটি তামিল পদ বললেন।

সেই বৃদ্ধা মহিলা কবি একবার পথে যেতে কাম্বারের (রামায়ণ লেখকের) প্রশংসা শুনতে পায়। সে আর একটা পদে তার উত্তর দিলে—

"স্ব-স্ব-ভাবে সবাই মহান। কাম্বারের কি বিশেষত্ব যখন তুলনা করা যায় সেই পাখীর সনে, যে কত সূক্ষ্ম কারুকার্যে বাসা বোনে; যে কীট লাক্ষা সৃষ্টি করে, যে মধুমক্ষিকা মধুচক্র গড়ে, পিপীলিকা যারা নগর রচে আর ঊর্ণনাভ যারা জাল বোনে ?"

তারপর ভগবান তাদের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে লাগলেন—

পাহাড়ে থাকতে তিনি একটা পাথর ও মাটির তৈরী ঘর দেখেছিলেন, চালটা খড়ের ছিল। উইপোকার খুব উৎপাত ছিল। ছাতটা খুলে ফেলা হল আর ঘরের দেওয়ালে যেখানে উই ধরেছিল সেটা ভেঙ্গে ফেলা হল। শ্রীভগবান দেখলেন যে পাথর দিয়ে ঘেরা ফাঁকগুলোতে সহর বসানো হয়েছে। সেগুলো কালো রঙের পলেস্তারা

করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আর তার মধ্যে অন্য সহরে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। সেই আশপাশের সহরগুলোও কালো রঙের পলেস্তারা করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে পথ। সহরের মধ্যে একটা ফাঁক সেখানে উইপোকারা থাকে। সমস্ত ঘরের দেওয়াল ভরা উই-এর বাসা, তারা ছাতও খেয়ে ফেলেছিল।

শ্রীভগবান একটা মাকড়সাকে জাল বুনতে দেখেছিলেন। সেটা বর্ণনা করলেন। একবার তাকে এখানে দেখা গেল, আবার অন্যখানে, তৃতীয়বার আর এক জায়গায়। জালটা এই সব জায়গায় লাগানো হয়ে গেল। মাকড়সা উঠছে, নামছে, ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, জালটা তৈরী হয়ে গেল, একেবারে জ্যামিতিক অঙ্কনের মত নিখুঁত। জালটা সকালে ছড়ানো হয় আর সন্ধ্যায় গুটিয়ে নেওয়া হয়।

এরূপ বোলতারাও অশোধিত গালা দিয়ে তাদের বাসা তৈরী করে ইত্যাদি।

সুতরাং প্রত্যেক জীবের কতগুলো আশ্চর্য স্বাভাবিক শক্তি আছে। কাম্বারের পাণ্ডিত্য কিছু আশ্চর্য নয় কারণ যেমন অন্যদের বেলায় দেখা যায় সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা।

২৬৮। ডঃ সৈয়দ—মুক্তি কি? যীশুখ্রীস্ট মুক্তি বলতে কি বুঝতেন?

ম—কার মুক্তি? কিসের থেকে?

ভ—ব্যক্তির মুক্তি, সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে।

ম—দুঃখ ইত্যাদি কার?

ভ—মনের।

ম—তুমি কি মন?

ভ—কেন প্রশ্নটা এল বলছি। আমি ধ্যান করছিলাম। মুক্তি লাভ করেছে এরূপ ভক্তদের ওপর যীশুর কৃপার কথা চিন্তা করছিলাম। শ্রীভগবানকেও আমি সেরূপ মনে করি। এরূপ কৃপার

ফলেই কি মুক্তি হয় না? আমার প্রশ্নে আমি এই কথাই বলতে চাই।

ম—হ্যাঁ। ঠিক।

ভ—'আমি কে?' পুস্তিকাতে 'স্বরূপ-দৃষ্টি' কথাটা আছে। তবে একজন দ্রষ্টা ও দৃশ্য আছে। অদ্বৈত অবস্থার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কি করে হয়?

ম—তুমি কেন মুক্তি, দুঃখ নিবৃত্তি ইত্যাদি বল? যে এসব বলে সেই এসব দেখে। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টিই চেতনা। এটাই বিষয়ী ও বিষয় হয়। আত্মা ছাড়া কি দৃষ্টি আছে? আত্মাই দৃষ্টি ইত্যাদি সব।

ভ—অহংকারকে প্রকৃত 'আমি'—'আমি' বোধ থেকে কি করে পৃথক করা যায়?

ম—যেটা ওঠে আর মিলিয়ে যায় সেটা অস্থায়ী 'আমি'। যার আদিও নেই অন্তও নেই সেটাই নিত্য 'আমি'—'আমি' বোধ।

ভ—অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মচিন্তা করলে কি মন শুদ্ধ হ'য়ে অন্য চিন্তা ত্যাগ ক'রে কেবল উচ্চ চিন্তা করবে?

ম—মনের শান্ত ভাবটাই পরম। যখন মন চঞ্চল তখন এটা চিন্তা-দোষ যুক্ত হয়। মনই আত্মার গতীয় (ডাইন্যামিক) শক্তি।

ভ—কোষগুলো কি বাস্তব আর আত্মা থেকে পৃথক?

ম—চেতনা ও জড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক বিজ্ঞানও সব জড়কে শক্তি ব'লে স্বীকার করে। শক্তিই বল বা গতি। অতএব সব কিছুই অবশেষে শিব ও শক্তি বা আত্মা ও মনে পর্যবসিত হয়।

কোষগুলো কেবলমাত্র কল্পনা। এদের কোন বাস্তবিক সত্যতা নেই।

ভ—দিনে কত ঘণ্টা ধ্যান করা উচিত?

ম—ধ্যানই তোমার স্বরূপ।

ভ—পক্কতা হলে হবে, এখন নয়।

ম—তুমি এ সম্বন্ধে পরে সচেতন হও। তার অর্থ এই নয় যে তোমার স্বরূপ এখন ধ্যান ছাড়া অন্য কিছু।

ভ—অভ্যাসের সম্বন্ধে কি করব ?

ম—সব সময়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হবে।

ভ—একজন পারসিক মরমিয়া সাধক (মিস্টিক) বলেন 'ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই', কোরান বলে 'ঈশ্বর সবার মধ্যে নিহিত আছেন।'

ম—ঈশ্বর ছাড়া 'সব' ব'লে কিছু নেই যে তিনি তাদের ব্যাপ্ত করবেন। কেবল তিনিই আছেন।

ভ—যদি একবার অনুভব হয় যে আত্মচিন্তাই একমাত্র কর্তব্য তবে কি সাংসারিক কাজকর্ম ত্যাগ করা নীতিগত ভাবে ন্যায্য।

ম—বিষয় ত্যাগের ইচ্ছাই বাধা। আত্মার অর্থই ত্যাগ। আত্মা সবই ত্যাগ করেছে।

ভ—ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সত্য। কিন্তু আমাদের···। আমার কাজে সমস্ত সময় ও শক্তি চলে যায় ; বেশীর ভাগ সময়ে আমি আত্মচিন্তা করার সময়ে ক্লান্তি বোধ করি।

ম—'আমি কাজ করি' এই বোধটাই বাধা। "কে কাজ করে ?" খোঁজো। "আমি কে ?" মনে রাখো। কাজ তোমাকে বাঁধবে না। সেটা আপনা হতে হবে। কাজ করা বা ছাড়ার কোন চেষ্টা করো না। তোমার চেষ্টাই বন্ধন। যা হওয়ার হবেই।

তোমার যদি কাজ ছাড়বার হয়, তুমি খুঁজলেও কাজ পাবে না। যদি কাজ করার হয়, তুমি ছাড়তেও পারবে না ; তোমাকে বাধ্য হয়ে করতে হবে। সুতরাং উচ্চশক্তির ওপর ছেড়ে দাও। তুমি তোমার ইচ্ছামত ত্যাগ বা গ্রহণ করতে পারো না।

২৬৯। ভ—সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে 'দহরাকাশে' (হৃদয়াকাশে) আছেন কি করে বলা যায়?

ম—আমরা কি একটা জায়গায় থাকি না? তুমি কি বল না যে তুমি শরীরে আছ? অনুরূপভাবে ঈশ্বরও 'হৃৎপুণ্ডরিকে' (হৃদয়-পদ্মে) আছেন বলা হয়। হৃদয়পদ্ম কোন একটা স্থান নয়। যেহেতু আমরা মনে করি যে শরীরে আছি সেজন্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের একটা নাম দেওয়া হয়। যারা কেবল আপেক্ষিক জ্ঞানই বোঝে তাদের এরূপ উপদেশ দিতে হয়।

সর্বব্যাপী হওয়ায় ঈশ্বরের থাকার কোন বিশেষ স্থান নেই। যেহেতু আমরা শরীরে আছি মনে করি সেজন্য জন্মেছিও মনে করি। যাইহোক আমরা সুষুপ্তিতে শরীর, ঈশ্বর বা উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে কিছুই ভাবি না। তথাপি আমাদের জাগ্রত অবস্থায় আমরা শরীরটা ধরে থাকি আর তাতে আছি মনে করি।

যা থেকে এ শরীরটা হয়েছে, যাতে জীবিত রয়েছে ও যাতে লয় পাবে তাই পরব্রহ্ম। তবুও আমরা ভাবি যে আমরা শরীরে আছি। সেজন্য এরূপ উপদেশ দিতে হয়। উপদেশের অভিপ্রায় "অন্তরে দেখো।"

২৭০। নেলোরের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীজি. ভি. সুব্বারামিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্ম সর্বব্যাপী (যেন সর্বমিদম্ ততম্)। কিন্তু তথাচ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় দশম অধ্যায়ে বিভূতিগুলোর বিশেষ উল্লেখ কি করে করলেন?

ম—বিশেষ উল্লেখগুলো অর্জুনের কোন বিশেষ প্রশ্নের উত্তর। অর্জুন উপাসনার সুবিধার (উপাসনা সৌকর্য্যম্) জন্য ঈশ্বরের বিভূতি জানতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরই সব। তাঁর অতিরিক্ত কিছু নেই।

ভ—বলা হয় একজন তার জীর্ণ শরীর (জীর্ণানি শরীরাণি)

ত্যাগ ক'রে নূতন (নবানি) শরীর গ্রহণ করে। শিশুর মৃত্যুর পক্ষেও কি এ কথা খাটে ?

ম—প্রথম কথা তুমি জীর্ণানি ও নবানি কি জানো না। দ্বিতীয়তঃ জীর্ণ ও নব আপেক্ষিক শব্দ। যেটা রাজার পক্ষে পুরাতন সেটা ভিখারীর পক্ষে নূতন। প্রকৃত কথা ব্যক্তিতার অর্থ মুক্তির পূর্ব অবধি দেহ-যুক্ত অবস্থা।

২৭১। ডঃ সৈয়দ—কৃপা কি করে লাভ হয় ?

ম—যেভাবে আত্মা লাভ হয়।

ভ—বাস্তবে আমাদের এটা কি করে হবে ?

ম—আত্মসমর্পণে।

ভ—বলা হয় আত্মাই কৃপা। তবে কি নিজের আত্মার কাছে নিজেকে সমর্পণ করব ?

ম—হাঁ। যার কাছ থেকে কৃপা পেতে ইচ্ছা কর। ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা একেরই বিভিন্ন বিভাব।

ভ—আরও ভাল করে বলুন যাতে বুঝতে পারি।

ম—যখন তুমি নিজেকে একজন ব্যক্তি মনে কর, তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর। ঈশ্বরকে উপাসনা করলে তিনি গুরুরূপে তোমার কাছে আসেন। গুরুকে সেবা করলে তিনি আত্মারূপে দেখা দেন। এটাই যুক্তিসহ ব্যাখ্যা।

২৭২। ভ—বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ব্যাপক ধ্বংসের লীলা চলছে। এ সব ঘটনার কারণ কি ?

ম—কার এ সব মনে হচ্ছে ?

ভ—তা হবে না। আমি দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পাচ্ছি।

ম—তুমি তোমার ঘুমের অবস্থায় জগৎ ও তার দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন ছিলে না ; কেবল তোমার জাগ্রত অবস্থায় তুমি এদের

বিষয়ে সচেতন হও। যে অবস্থায় এদের জন্য দুশ্চিন্তা ছিল না সেই অবস্থায় থেকে যাও। তার অর্থ জগৎ সম্বন্ধে সচেতন না হলে তাদের কষ্টে তুমি বিচলিত হও না। যখন তুমি আত্মাতে থাকো, যেমন সুষুপ্তিতে, তখন জগৎ ও তার কষ্ট তোমায় বিচলিত করে না। অতএব অন্তরে দেখো। আত্মাকে দেখো। সেখানেই জগতের ও তার কষ্টের নিবৃত্তি হবে।

ভ—কিন্তু সেটা স্বার্থপরতা।

ম—জগৎ বাইরে নয়। তুমি নিজেকে ভুল ক'রে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে জগতকে বাইরে দেখ আর তার কষ্ট তোমার কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারা সত্য নয়। সত্যকে খোঁজো আর এই অসৎ বোধ ত্যাগ কর।

ভ—খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ, বড় বড় সমাজসেবীরা সংসারের দুঃখ-সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি।

ম—তাঁরা অহংকার-কেন্দ্রিক আর সেজন্যই তাদের অক্ষমতা ; যদি তাঁরা আত্মাতে থাকতেন তবে তাঁরা ভিন্ন প্রকারের হতেন।

ভ—মহাত্মারা কেন সাহায্য করেন না ?

ম—কি করে জানলে যে তারা সাহায্য করেন না ? সভায় বক্তৃতা দেওয়া, বাস্তব কর্ম-কুশলতা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা মহাত্মাদের মৌনের কাছে কিছুই নয়। তাঁরা অন্যদের থেকে অনেক বেশী করেন।

ভ—সংসারের উন্নতির জন্য আমাদের কি করা উচিত ?

ম—"তুমি" যদি দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকো তবে কোথাও দুঃখ দেখবে না। তোমার সমস্যা হচ্ছে জগতকে বাইরে দেখা আর সেখানে কষ্ট আছে ভাবা। কিন্তু জগৎ ও তার কষ্ট তোমার ভিতরে। যদি ভিতরে দেখ তবে কোন কষ্ট থাকবে না।

ভ—ঈশ্বর পূর্ণ। তবে এই অপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন ? কর্তার মতই কর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে তা হয়নি।

ম—কে এই প্রশ্ন তুলছে ?

ভ—আমি—এই ব্যক্তি।

ম—তুমি কি ঈশ্বর ছাড়া যে এই প্রশ্ন করছ ?

যতক্ষণ তুমি নিজেকে শরীর মনে করবে ততক্ষণ তুমি জগতকে বাইরে দেখবে। তোমার কাছে অপূর্ণতা বোধ হবে। ঈশ্বর পূর্ণ (পরোৎকর্ষ)। তাঁর সৃষ্টিও পরোৎকর্ষ। তুমি একে অপূর্ণ দেখছ কারণ তোমার নির্ধারণটা ভুল।

ভ—আত্মা কেন বেদনাময় জগতরূপে প্রকাশিত হল ?

ম—যাতে তুমি তাকে খোঁজো। তোমার চোখহু'টি নিজেদের দেখতে পায় না। সামনে একটা আর্শি রাখলে তারা নিজেদের দেখে। সৃষ্টির পক্ষেও তাই।

"আগে নিজেকে দেখো তারপর সমস্ত জগতকে আত্মারূপে দেখো।"

ভ—সুতরাং এই বুঝায়—যে আমায় সর্বদা অন্তরে দেখতে হবে।

ম—হাঁ।

ভ—জগৎ কি মোটেই দেখব না ?

ম—তোমাকে জগৎ বিষয়ে চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে বলা হচ্ছে না। তোমাকে কেবল "আগে নিজেকে দেখে পরে সমস্ত জগতকে আত্মারূপে দেখতে" বলা হচ্ছে। যদি নিজেকে শরীর বলে বিবেচনা কর তবে জগৎ বাইরে বোধ হবে। তুমি যদি আত্মা হও, জগৎ ব্রহ্মময় মনে হবে।

২৭৩। ডঃ সৈয়দ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি 'স্তুতিপঞ্চকম্' পড়ছিলাম। দেখলাম যে আপনি অরুণাচলকে সম্বোধন করে ওগুলো লিখেছেন। আপনি অদ্বৈতবাদী। তবে কি করে ঈশ্বরকে পৃথকরূপে সম্বোধন করলেন ?"

ম—ভক্ত, ঈশ্বর ও স্তুতি সবই আত্মা।

ভ—কিন্তু আপনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন। আপনি বিশেষ করে অরুণাচল পাহাড়কে ঈশ্বর বলেছেন।

ম—তুমি তোমার আত্মাকে শরীর বলে পরিচয় দিতে পারো। ভক্ত কি আত্মাকে অরুণাচল ব'লে পরিচয় দিতে পারে না?

ভ—যদি অরুণাচল আত্মা হয় তবে অনেক পাহাড়ের মধ্যে একে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল? ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাঁকে বিশেষ ক'রে অরুণাচল বলা হল কেন?

ম—তোমায় এলাহাবাদ থেকে কে এখানে আকর্ষণ করে নিয়ে এল? এই সব লোকেদের কে আকর্ষণ করে এখানে এনেছে?

ভ—শ্রীভগবান।

ম—আমি কিভাবে আকর্ষিত হয়ে এখানে এলাম? অরুণাচলের দ্বারা। শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। আবার অরুণাচল অন্তরে, বাইরে নয়। আত্মাই অরুণাচল।

ভ—শাস্ত্রে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—আত্মন্, পরমাত্মন্, পর ইত্যাদি। এদের তারতম্য কি?

ম—যিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর কাছে এরা সব এক। কিন্তু যার যেমন মানসিক উন্নতি হয়েছে সেই অনুসারে সে বোঝে।

ভ—কিন্তু একই বস্তু বোঝাতে এতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয় কেন?

ম—অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। সবই আত্মাকে বুঝায়। 'পর' শব্দের অর্থ 'আপেক্ষিক নয়' বা 'আপেক্ষিকের অতীত' অর্থাৎ ব্রহ্ম।

ভ—হৃদয়ের ধ্যান করার জন্য আমি কি বুকের ডান দিকে ধ্যান করব?

ম—হৃদয় রক্তমাংসের নয়। ধ্যান ডান বা বাঁদিকে নয়। আত্মার ওপর ধ্যান। সবাই জানে 'আমি আছি'। 'আমি'টা কে?

এটা বাইরে নয়, ভিতরেও নয়, ডানদিকে বা বাঁদিকেও নয়। 'আমি আছি'—ব্যস্।

যা থেকে সব কিছু ওঠে তাই হৃদয়-কেন্দ্র। যেহেতু তুমি জগৎ, শরীর ইত্যাদি দেখ তাই বলা হয় যে এগুলোর একটা কেন্দ্র আছে আর তার নাম হৃদয়। যখন তুমি হৃদয়ে থাকবে তখন বুঝবে যে এটা কেন্দ্রও নয়, পরিধিও নয়। এটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিসের কেন্দ্র হবে?

ভ—আমি কি আত্মা ও অনাত্মাকে বস্তু ও তার ছায়া বলে মনে করতে পারি?

ম—বস্তু ও ছায়া তাদের জন্য যারা কেবল ছায়া দেখে আর তাকেই বস্তু বলে ভুল করে আর তার ছায়াও দেখে। কিন্তু যারা কেবলমাত্র সত্যের সম্বন্ধে সচেতন তাদের কাছে বস্তুও নেই আর তার ছায়াও নেই।

ভ—বুদ্ধকে যখন অহংকার আছে কিনা প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি নীরব ছিলেন; যখন অহংকার নেই বলা হল তখনও নীরব রইলেন। যখন ঈশ্বর আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হল তিনি মৌন রইলেন; ঈশ্বর নেই বলাতেও মৌন রইলেন। এসব বিষয়ে মৌনই তাঁর উত্তর। মহাযান ও হীনযান দুই সম্প্রদায়ই তাঁর মৌনের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। কারণ তারা বলে বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন।

তিনি যদি নাস্তিকই হবেন তবে নির্বাণ, জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, পুনর্জন্ম ও ধর্ম এসব কথা বলবেন কেন। তাঁর ব্যাখ্যাকারগণ ভ্রান্ত। তাই না?

ম—তোমার কথা ঠিক।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৬

২৭৪। মুসলমান অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন যে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য কি করে হয়?

ম—বৈষ্ণবেরা নিজেদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে। এটাও অদ্বৈতবাদ। যেমন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আত্মা, অহংকার, স্থূলশরীর থাকে সেরূপ পরমাত্মা, জগৎ ও জীব সব নিয়ে ঈশ্বর।

ভ—ভক্তিতে কি দ্বৈতভাব হয় না?

ম—'স্ব-স্বরূপানুসন্ধানম্ ভক্তিরিত্যভীধিয়তে' (আপন স্বরূপ অনুসন্ধানই ভক্তি)। ভক্তি ও আত্মানুসন্ধান এক। অদ্বৈতবাদীর আত্মাই ভক্তের ঈশ্বব।

ভ—সমস্ত ধর্মপ্রবর্তকদের কি একটা মহামণ্ডলী আছে যাঁরা সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর লক্ষ্য রাখেন?

ম—এরূপ মণ্ডলী থাকুক বা না থাকুক। খুব বেশী হলে এটা একটা ধারণা। আত্মা প্রত্যক্ষ। তাকে জানো। আর গবেষণা শেষ কর। একজন বলবে মহামণ্ডলী আছে আর একজন বলবে নেই। কিন্তু কেউ আত্মাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভ—শ্রীভগবান প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে কি বলেন?

ম—হাঁ। এ দু'টি বলা হয়, তাতে কি?

ভ—দু'টির মধ্যে কোন্‌টা ভাল?

ম—যদি তুমি কেবল বিশুদ্ধ আত্মাকে দেখো তবে নিবৃত্তি আর যদি আত্মাকে জগতের সঙ্গে দেখো তাহলে প্রবৃত্তি। অন্যভাবে অন্তর্মুখী মন নিবৃত্তি, বহির্মুখী মন প্রবৃত্তি। যে ভাবেই হোক আত্মা থেকে পৃথক কিছুই নয়। দু'টিই এক।

আধ্যাত্মিক মহামণ্ডলী সম্বন্ধেও সেরূপ। তারাও আত্মা ছাড়া পৃথক থাকতে পারে না। তারা আত্মাতে আর আত্মা হয়েই আছে। আত্মোপলব্ধিই সবার একমাত্র লক্ষ্য।

৫ই নভেম্বর ১৯৩৬

২৭৫। কথাবার্তা উপলক্ষ্যে কেউ একজন শ্রীপল ব্রান্টন ও একজন মহিলার রাত্রে বাড়ী ফেরার সময়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা উজ্জ্বল জ্যোতিকে ধীর মৃদু গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে দেখার কথা উল্লেখ করলে।

শ্রীভগবান বললেন—এই পাহাড়কে মূর্তিমান জ্ঞান বলা হয়।

ভ—কিন্তু স্থূল চোখে কি করে দেখা গেল ?

ম—সম্বন্ধর তার একটা গীতে বলেছেন, "আমার হৃদয়-হরণকারী বা হৃদয়-আকর্ষণকারীর গানই মনে গাইছি।" হৃদয় আকর্ষিত হয়—তার ফলে মন নিশ্চয় হৃদয়ে ডুবে যায় ; তা সত্ত্বেও তার স্মৃতিই মহাত্মাকে পরে ঈশ্বরের স্তুতি করায়।

তারপর একজন যুবক ভক্তের কথা উঠল। যুবকটি শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, অবস্থাপন্ন ও গম্ভীর প্রকৃতির, সে একবার তার বাড়ীতে শ্রীভগবানের ছবির সামনে বসে ধ্যান করছিল। হঠাৎ ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে যায় আর তাতে ছেলেটি ভীষণ ভয় পায়। সে তার মাকে ডেকে ওঠে। মা এসে কি ব্যাপার জানতে চাইলেন। সব আত্মীয়-স্বজন তার ভাবান্তর দেখে অবাক হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। সে যদিও তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ছিল তবু একটা রহস্যময় শক্তি, যাকে সে বাধা দিচ্ছিল, তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। সে কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য হয়ে যায়। লোকেরা ব্যস্ত হয়ে ওষুধ-পত্র দিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছিল।

পরে সে যখন তিরুভন্নমালাই এসেছিল তখন এইরূপ অভিজ্ঞতার পূর্বাভাস পেয়েছিল। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে কোন অঘটন ঘটেনি কিন্তু যখনই সে হলঘর থেকে বাইরে যেত তখনই সেই শক্তির প্রবলতা ও ভয়বিহ্বলতা অনুভব করেছে।

শ্রীভগবান বললেন, "তাই নাকি? কেউ তো আমায় আগে একথা বলেনি?"

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কি 'শক্তিপাত' নয়?"

ম—হাঁ তাই। একজন পাগল সংস্কার ধরে থাকে অপরপক্ষে জ্ঞানী ধরে থাকে না। দু'জনের মধ্যে এই পার্থক্য। জ্ঞানও এক রকম পাগলামী।

ভ—কিন্তু বলা হয় 'কর্মসাম্য' অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য সমান হলে 'শক্তিপাত' হয়।

ম—হাঁ। 'মল-পরিপাক' 'কর্মসাম্য' ও 'শক্তিপাতে'র অর্থ এক। একজন তার সংস্কারানুযায়ী চলছে; যখন তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে সে আত্মা, এটা তার মনকে প্রভাবিত করে আর তার মনের ক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। শক্তি প্রবাহে সে নিজেকে অসহায় বোধ করে। তার অভিজ্ঞতা কেবল তার 'আমি আত্মা' কল্পনারই অনুরূপ হয় তা সে সেটা যে ভাবেই বুঝুক না কেন। শক্তিপাতই সত্য ও প্রকৃত অনুভূতি লাভ করায়।

যখন মানুষ উপদেশ পাওয়ার উপযুক্ত হয় ও তার মন হৃদয়ে নিমজ্জমান হয় তখন উপদেশগুলো মুহূর্তের মধ্যে কাজ করে আর সে আত্মোপলব্ধি করে। না হলে সব সময়ে একটা সংঘর্ষ চলে।

মনোনাশ, জ্ঞান ও চিত্তৈকাগ্রতার অর্থ এক।

২৭৮। উত্তর প্রদেশের একজন মহিলা, তার ভাই, একজন মহিলা সঙ্গিনী ও এক বলিষ্ঠ দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছাল।

হলঘরে এসে সেই মহিলা মহর্ষিকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম ক'রে একটা কম্বলের আসনে তাঁর সামনে বসল। শ্রীভগবান তখন তেলেগু 'ত্রিলিঙ্গ' পত্রিকায় একটি ছেলের পুনর্জন্মের কথা পড়ছিলেন। ছেলেটির এখন তেরো বছর বয়স, সে লক্ষ্ণৌর কাছে এক গ্রামে সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ে। সে যখন তিন বছরের ছিল

তখন সে এখানে ওখানে খুঁড়ত, জিজ্ঞাসা করলে বলত যে সে তার মাটিতে পোঁতা একটা জিনিস খুঁজছে। যখন চার বছরের তখন তাদের বাড়ীতে একটা বিয়ে হয়। ফেরার সময়ে অতিথিরা পরিহাস করে বলে যে ছেলেটির বিয়েতে তারা আবার আসবে। সে ফিরে জবাব দেয় 'আমার বিয়ে হয়ে গেছে, দু'টি বৌ আছে।' কোথায় দেখাতে বললে সে তাকে কোন এক গ্রামে নিয়ে যেতে বলে ; সেখানে সে দু'জন স্ত্রীলোককে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের স্বামীর মৃত্যু ও ছেলেটির জন্মের মাঝে মাত্র দশমাস ব্যবধান হয়েছে।

যখন এটা সেই মহিলাকে বলা হল তখন সে জিজ্ঞাসা করলে যে কোন লোকের মারা যাওয়ার পরের অবস্থা জানা যায় কিনা।

শ্রীভগবান বললেন, "কেউ মারা যাওয়ার পরই জন্মায়, কেউ বেশ কিছুদিন পরে, অল্পসংখ্যক এ পৃথিবীতে জন্মায় না, অন্য কোন উচ্চলোকে গিয়ে মুক্তি লাভ করে ; আরও অল্প সংখ্যক কয়েকজন এখানেই মুক্তি লাভ করে।

মহিলা—আমি তা বলছি না। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর কি হয় জানা যায় কি ?

ম—যেতে পারে। কিন্তু জানার চেষ্টা করে লাভ কি ? সব ঘটনাই যে জানতে চায় তার মতই সত্য।

মহিলা—একজনের জন্ম, তার থাকা ও তার মৃত্যু আমাদের কাছে সত্য।

ম—কারণ তুমি নিজেকে ভুল ক'রে শরীর ব'লে নির্ধারণ করেছ আর অন্যদেরও শরীর বলে মনে কর। তুমি বা তারা কেউ শরীর নয়।

মহিলা—কিন্তু আমার বিবেচনার স্তর থেকে আমি নিজেকে ও ছেলেকে সত্য মনে করি।

ম—'আমি'-চিন্তাটার জন্ম হলে একজনের জন্ম- ও সেই চিন্তার মৃত্যু হলে সেই লোকের মৃত্যু হয়। 'আমি'-চিন্তা ওঠার পর শরীরের সঙ্গে ভুল নির্ধারণ শুরু হয়। নিজেকে শরীর বলে ভুল করার জন্য অন্যদেরও মিথ্যা মূল্যায়ণ হয় ও তাদের শরীর বলে ভুল হয়। যেমন তোমার শরীর জন্মেছে, বড় হয়েছে আর নষ্ট হয়ে যাবে সেরূপ অন্যকেও মনে কর সে জন্মেছে. বড় হয়েছে ও মারা গেছে। তোমার ছেলের জন্মাবার আগে কি তুমি তার কথা ভেবেছ? তার জন্মাবার পর চিন্তা এল আর মারা যাওয়ার পরও রয়েছে। যেহেতু তুমি চিন্তা করছ তাই সে তোমার ছেলে। সে কোথায় গেছে? যেখান থেকে এসেছিল সেই উৎসেই ফিরে গেছে। সে তোমার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণ সেও আছে। তুমি যদি তোমার শরীরকে তুমি বলারূপ ভুল নির্ধারণ ত্যাগ ক'রে প্রকৃত আত্মাকে দেখো তবে এই ভ্রান্তি মিটে যাবে। তুমি শাশ্বত। অন্যদেরও এরূপ শাশ্বত বলে বোধ হবে। এই সত্য উপলব্ধি না হওয়া অবধি অজ্ঞান ও ভুল নির্ধারণের জন্য মিথ্যা মূল্যায়ণের ফলে সর্বদা এরূপ শোক থাকবে।

মহিলা—শ্রীভগবানের কৃপায় আমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হোক।

ম—'আমি'-চিন্তা দূর কর। যতক্ষণ 'আমি' বেঁচে আছে ততক্ষণ শোক। 'আমি' না থাকলে কোন শোক নেই। ঘুমের কথা বিবেচনা কর।

মহিলা—হাঁ, কিন্তু যখনই আমি 'আমি'-চিন্তা করি তখন অন্য চিন্তা আসে আর বিচলিত করে।

ম—চিন্তাগুলো কার দেখো। এরা চলে যাবে। একটা 'আমি'-চিন্তাই এদের মূল। এটাকে ধরো, তারা সব অদৃশ্য হবে।

আবার মহর্ষি 'যোগবাশিষ্ঠে'র পুণ্য ও পাবনের গল্প উল্লেখ করলেন। সেখানে পুণ্য তাদের পিতামাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত পাবনকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে আত্মজ্ঞানের দিকে চালিত

করেছিল। আবার সৃষ্টি দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যায়, 'ঈশ্বর-সৃষ্টি' ও 'জীব-সৃষ্টি'। এই দুই-এর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রথমটা আর ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধ দ্বিতীয়টা। এই দ্বিতীয়টাই প্রথম-নিরপেক্ষ হয়ে সুখ ও দুঃখ দেয়। 'পঞ্চদশী' থেকে একটা গল্প বলা হল। দক্ষিণ ভারতে কোন গ্রামে দু'টি ছেলে ছিল। তারা উত্তর ভারতে তীর্থ-দর্শন করতে গিয়েছিল। একজন মারা যায়। অন্যজন অর্থোপার্জন করছিল, সে কিছুদিন পরে দেশে ফিরবে ঠিক করে। ইতিমধ্যে তার একজন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে তার ও তার মৃত সঙ্গীর খবর দক্ষিণ ভারতে তাদের গ্রামে দিতে বলে। যাত্রী তাই করলে কিন্তু ভুল করে নাম উল্টোপাল্টা করে ফেললে। ফলে মৃত ব্যক্তির মা-বাবা তার কুশল-সংবাদ পেয়ে আনন্দিত আর জীবিত ব্যক্তির মা-বাবা শোকাকুল হল। তাহলে দেখ, সুখদুঃখ বাস্তব ঘটনার ওপর নির্ভর না ক'রে কেবল মনের ধারণার ওপর নির্ভর করে। এর জন্য দায়ী জীবসৃষ্টি। জীবকে নষ্ট কর তাহলে আর সুখদুঃখ থাকবে না; মাত্র মনের শান্তি চিরস্থায়ী হবে। জীবকে নাশ করাই আত্মাতে থাকা।

মহিলা—সব শুনলাম। এ আমার বুদ্ধির অগম্য। শ্রীভগবান আমায় বুঝতে সাহায্য করুন, এই প্রার্থনা।

"মহীশূরে একটা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম, জলের ধারার দৃশ্য অপূর্ব। ধারাগুলো আঙ্গুলের মত পাথরকে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু ভিতরের জলের বেগ তাদের ঠেলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মনে হয় আমাদের বর্তমান পরিবেশকে ধরে থাকার চেষ্টাও সেরূপ, কিন্তু না ধরেও তো পারি না।

"এ কথা ভাবা যায় না যে আমরা গাছের ঋতুকালীন ফুল, ফল ও পাতা ছাড়া আর বেশী কিছু নই। যদিও ফুল ভালবাসি তবু এ ভাব মনে লাগে না।"

আরও কয়েক মিনিট পরে মহিলা মন্তব্য করলে যে তার মহর্ষিকে

মৃত্যু ও তৎ-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু করে নি। তথাপি মহর্ষি খবরের কাগজে সেই বিষয় পড়ছিলেন আর সেটাই উপদেশরূপে উত্থাপিত হল। সে লক্ষ্মীগরুকে দেখে ফিরে চলে গেল।

৯ই নভেম্বর, ১৯৩৬

২৭৭। শ্রীকোহেন—ইচ্ছা কি? আমি বলতে চাই যে সেটা পঞ্চকোষের মধ্যে কোথায় থাকে?

ম—'আমি'-চিন্তা প্রথমে ওঠে আর তারপর অন্যান্য চিন্তা হয়। এগুলোই মন। মন বিষয় আর 'আমি' বিষয়ী। 'আমি' ছাড়া কি ইচ্ছা থাকতে পারে? এটা 'আমি'তেই থাকে। 'আমি'-চিন্তা বিজ্ঞানময় কোষের। ইচ্ছাও তাতেই থাকে।

শ্রীভগবান আরও বললেন—এই স্থূল শরীর অন্নময় কোষ।

প্রাণের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বর্গ ও কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে প্রাণময় কোষ। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ মনোময় কোষ। এরা জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন কেবল চিন্তার সমষ্টি। ইদম্ (ইহা) বিষয়, আর অহম্ (আমি) বিষয়ী; এই দু'টি নিয়ে বিজ্ঞানময় কোষ।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৬

২৭৮। পোল্যাণ্ড দেশীয়া, হিন্দুধর্মে দীক্ষিতা মহিলা কুমারী ডব্লিউ উমা দেবী কাশ্মীরে গিয়েছিলেন আর সেখানকার ছবি এনেছেন। আমরা সকলে দেখছিলাম। শ্রীভগবান পরিহাস ক'রে বললেন, "আমাদের ভ্রমণের কষ্ট না ক'রে সব দেখা হয়ে গেল।"

ভ—কৈলাসে যেতে ইচ্ছা করে।

ম—ভাগ্যে থাকলে এসব হয়, না হলে হয় না। সব দেখলেও—এ গোলার্ধে না হলেও অন্যটাতে অনেক বাকী থাকবে। জানা মানেই যা জানা হল তার বাইরে অনেক অজ্ঞানা রয়ে গেল। বস্তু জ্ঞান সব সময়ে সীমিত।

কিছুক্ষণ পরে ভগবান বলে চললেন—অপ্পর জরাগ্রস্ত আর বৃদ্ধাবস্থায় কৈলাস যেতে মনস্থ করলে। পথে একজন বৃদ্ধ এসে তাকে অনেক করে ফিরে যেতে অনুরোধ করে বললে যে সেখানে যাওয়া খুব কঠিন। যাহোক অপ্পর জেদ ক'রে বললে যে প্রাণ গেলেও সে যাবে। বৃদ্ধ তাকে নিকটের পুষ্করিণীতে ডুব দিতে বললে। অপ্পর ডুব দিলে আর সেখানেই কৈলাস দেখতে পেল। এসব কোথায় হল? তিরুভায়ায়রে, তাঞ্জোর থেকে ন' মাইল দূরে। তবে কৈলাস কোথায়? এটা মনের মধ্যে না বাইরে? যদি তিরুভায়ায়র প্রকৃত কৈলাস হয়, অন্যদেরও দেখা উচিত। কিন্তু অপ্পর একাই সেটা দেখেছিল।

অনুরূপভাবে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য তীর্থ সম্বন্ধেও বলা হয় যে তারা শিবের নিবাস-স্থান আর ভক্তরাও তাই দেখে। এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সত্য। সবই অন্তরে। বাইরে কিছুই নেই।

২৭৯। ভ – মারা যাওয়ার কতদিন পরে জন্ম হয়? তৎক্ষণাৎ কিংবা কিছুদিন পরে?

ম—তুমি জন্মাবার আগে কি ছিলে জানো না তবু মারা গেলে কি হবে জানতে চাও। এখন তুমি কি তা কি জানো?

জন্ম ও পুনর্জন্ম শরীরের। তুমি আত্মাকে শরীর ভাবছ। এটা ভুল নির্ধারণ। তুমি বিশ্বাস কর যে শরীরটা জন্মেছে আর মারা যাবে, আর ভুল ক'রে একের ব্যাপারটা অন্যের ওপর চাপাও। নিজের প্রকৃত সত্তাকে জানো তাহলে এসব প্রশ্ন উঠবে না।

জন্ম ও পুনর্জন্ম যে নেই এই প্রশ্নটা তোমায় অনুসন্ধান ক'রে

জানার জন্যই জন্ম ও পুনর্জন্মের উল্লেখ করা হয়। এগুলো শরীর সম্পর্কিত, আত্মার নয়। আত্মাকে জানো আর সংশয় দ্বারা বিচলিত হয়ো না।

২৮০। ভ—আপনি আমায় মায়ামুক্ত হতে সাহায্য করতে পারেন ?

ম—মায়া কি ?

ভ—সংসারের প্রতি আসক্তি।

ম—সুষুপ্তিতে কি সংসার ছিল ? সেখানে কি তার প্রতি আসক্তি ছিল ?

ভ—ছিল না।

ম—তুমি ছিলে কি না ?

ভ—হতে পারে।

ম—তবে কি তুমি ঘুমে তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর ?

ভ—না, করি না।

ম অতএব 'ঘুমে যে ছিল' এখন তুমি সেই।

ভ—হাঁ।

ম—

সুষুপ্তি	জাগৃতি
জগৎ নেই	জগৎ
আসক্তি নেই	আসক্তি
আত্মা	আত্মা

তাহলে এখন যে মায়ার কথা বলছে সে কে ?

ভ—সুষুপ্তিতে মন ছিল না। জগৎ ও তার প্রতি আসক্তি মনের।

ম—ঠিক তাই। জগৎ ও তার প্রতি আসক্তি মনের, আত্মার নয়।

ভ—ঘুমে আমি অজ্ঞানে ছিলাম।

ম—কে বলছে যে সে অজ্ঞানে ছিল? সে কি এখনও অজ্ঞান নয়? সে কি জ্ঞানী?

মলিন সত্ত্বই এখন অজ্ঞানের কথা বলছে।

ভ—তবে কি গভীর ঘুমে আত্মা শুদ্ধ ছিল?

ম—সে তো কোন প্রশ্ন করে নি। অসম্পূর্ণ বা মলিন বলেও বোধ করেনি।

ভ—এরূপ আত্মা সবার আছে; এমনকি মৃতেরও আছে।

ম—কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি বা মৃত শরীর প্রশ্ন করে না। যে প্রশ্ন করছে তাকে বিশ্লেষণ কর। এটা তুমি। তুমি কি সুষুপ্তিতে ছিলে না? সেখানে কোন অপূর্ণতা ছিল না কেন? বিশুদ্ধ আত্মা কেবল সত্তা। এটা বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে না, আর জাগ্রতের মত সচেতন হয় না। বর্তমান অবস্থায় যাকে তুমি চেতনা বল সেটা মস্তিষ্ক, মন, শরীর ইত্যাদি নির্ভরশীল সংযুক্ত চেতনা। কিন্তু সুষুপ্তিতে এ সকল ছাড়াই চেতনা ছিল।

ভ—কিন্তু গভীর ঘুমে আমি আমার চেতনাকে জানি না।

ম—কে এ সম্বন্ধে সচেতন নয়। তুমি স্বীকার করছ 'আমি আছি'। তুমি বলছ সুষুপ্তিতে 'আমি ছিলাম'। অস্তিত্বের অবস্থাই তোমার আত্মা।

ভ—আপনি কি বলতে চান যে সুষুপ্তি আত্মোপলব্ধি?

ম—এটা আত্মা। উপলব্ধির কথা বলছ কেন? এমন মুহূর্ত আছে কি যখন আত্মা অনুভূত হয় না? যদি এরকম কোন মুহূর্ত থাকে তবেই অন্য সময়কে উপলব্ধিকাল বলা যায়। এমন কোন সময় নেই যখন আত্মা নেই বা আত্মার উপলব্ধি নেই। তবে কেবল সুষুপ্তির সম্বন্ধে এ কথা কেন বলছ? এমনকি এইক্ষণেও তুমি আত্মোপলব্ধি করছ।

ভ—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।

ম—কারণ তুমি আত্মাকে শরীর বলে ভাবছ। এই ভুল নির্ধারণ ছেড়ে দাও, আত্মার প্রকাশ হবে।

ভ—এটা আমার মায়া অর্থাৎ আসক্তি দূর করার জন্য আমায় সাহায্য করার প্রশ্নের উত্তর হল না।

ম—আসক্তি সুষুপ্তিতে ছিল না। এটা এখন আছে আর অনুভব হচ্ছে। এটা তোমার প্রকৃত স্বরূপ নয়। ভ্রান্ত ধারণাটা কার? যদি প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়, এটা থাকে না। যদি আত্মোপলব্ধি কর, বিষয় উপলব্ধি হয় না। সেটাই মায়া ত্যাগ। মায়া বাস্তব নয় যে তাকে অন্যভাবে দূর করা যাবে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৬

নেহাই-এর ফুলকি (১)

২৮১। কোন একজন লোক শ্রীমহর্ষির পূর্বতন শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে নিজেকে আশ্রমের ন্যায়সঙ্গত সর্বাধিকারীরূপে দাবী ক'রে আদালতে আর্জী করেছে।

তদন্ত কমিশন দ্বারা মহর্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। খুব ভিড় হয়েছিল, কিন্তু উত্তর-পূর্বদিকের ঘরে কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

কথোপকথনের কিছু অংশ দেওয়া হল। মহর্ষির উত্তর সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রশ্ন—শ্রীভগবান কোন্ আশ্রম অবলম্বন করেন?

ম—অত্যাশ্রম।

প্র—সেটা কি?

ম—এটা প্রচলিত চারটি আশ্রমের অতীত।

প্র—এটা কি শাস্ত্র-সঙ্গত?

ম—হ্যাঁ, শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে।

প্র—আপনি ছাড়া আর কেউ এরূপ আশ্রমে আছেন ?

ম—থাকতে পারে।

প্র—আর কেউ ছিল ?

ম—শুক, ঋষভ, জড়ভরত এবং আরও অন্যেরা।

প্র—বিষয়-সম্পত্তির ওপর আসক্তি না থাকায় আপনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এখানে আশ্রমে বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। এ কি করে হয় ?

ম—আমি চাইনি। এগুলো আমার ওপর চাপানো হয়েছে। আমি ভালও বাসি না, ঘৃণাও করি না।

প্র—এগুলো কি আপনাকে দেওয়া হয়েছে ?

ম—যে স্বামী তাকে এসব দেওয়া হয়েছে তা সে যেই হোক। কিন্তু সংসারে শরীরটাকে স্বামী বলা হয়। এটা সেই শরীর। তার অর্থ আমাকে।

প্র—তার অর্থ বিষয়ের প্রতি নূতন করে আসক্তি হয়েছে, তাই না ?

ম—আমি ঘৃণা করি না—এটাই আমার বক্তব্য।

প্র—বাস্তবিক জীবনে যা বললাম তাই দাঁড়ায়।

ম—বাস্তবক্ষেত্রে যেমন বেঁচে থাকা আর চলাফেরা করা।

প্র—আপনি কি উপদেশ দেন ? কখনও দিয়েছেন ?

ম—দর্শনার্থী প্রশ্ন করে। আমি যা জানি, উত্তর দি। এটা তারা যা ইচ্ছা হয় ভাবতে পারে।

প্র—এটা কি উপদেশ ?

ম—অন্যেরা কি ভাবে নেয়, আমি কি করে বলব ?

প্র—আপনার কি শিষ্য আছে ?

ম—আমি কাউকে দীক্ষা দি না। যেমন পূর্ণকুম্ভ পূজা ইত্যাদি ক'রে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলা।

লোকেরা নিজেদের শিষ্য বা ভক্ত বলতে পারে। আমি কাউকে শিষ্য মনে করি না। আমি কখন কারও কাছে উপদেশ নিতে যাইনি আর দীক্ষাও দি না। লোকে যদি নিজেদের শিষ্য মনে করে তবে অনুমোদন বা অস্বীকার করি না। আমার মতে সবাই সমান। তারা নিজেদের শিষ্য বলার উপযুক্ত মনে করে। আমি তাদের কি বলতে পারি? আমি নিজেকে শিষ্য বা গুরু কিছুই মনে করি না।

প্র—আগে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে আপনি কি ক'রে মন্দিরের জমির ওপর স্কন্দাশ্রম তৈরি করা অনুমোদন করলেন?

ম—যে শক্তি আমায় এখানে পাহাড়ে বাস করাচ্ছে তার দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে।

প্র—বিষয়-সম্পত্তি চান না বলেই এখানে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে টাকাপয়সা ইত্যাদি ফেলে দেন। টাকাপয়সা স্পর্শ করেন না। এখানে আসার পর অনেক বছর কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। এখন কি করে আশ্রমে দান গ্রহণ করা হয়?

ম—কয়েকজন সঙ্গী আমার নাম করে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে শুরু করার পর এটা চালু হয়ে গেছে। আমি তাদের কাজ অনুমোদন করি না বা বাধাও দি না। সুতরাং এটা চলছে। একজন যায় আর একজন আসে, রীতিটা চলছে। দান নেওয়া হোক আমি চাই না। কিন্তু লোকেরা সে পরামর্শ শোনে না। আমি অযাচিত উপদেশ দিতে চাই না। তাই তাদের বাধাও দি না। যেহেতু পয়সা আসে অতএব আপনা হতে বিষয়-সম্পত্তি হয়।

প্র—আপনি আপনার স্বাক্ষর দেন না কেন?

ম—'আত্মোপলব্ধি'র লেখক এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তাছাড়া কি নামে আমার পরিচয় হবে? আমি নিজেই জানি না। এখানে আসার পর থেকে লোকে আমায় বিভিন্ন সময়ে অনেক নাম দিয়েছে। আমি যদি একটা নামে সই করি সবাই বুঝবে না।

সুতরাং যারা আমার স্বহস্তাক্ষর চাইত তাদের বলতাম যে আমার স্বাক্ষর দেখলেও সাধারণ লোক এটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।

প্র—আমার বিশ্বাস, আপনি টাকাপয়সা বা অন্য জিনিস স্পর্শ করেন না।

ম—অনেক সময়ে লোকে আমার হাতে ফল দেয়, আমি সেটা স্পর্শ করি।

প্র—যদি এক প্রকার উপহার নিতে পারেন তবে টাকা-পয়সাও নেবেন না কেন?

ম—টাকা পয়সা খাওয়া যায় না। ওসব নিয়ে কি করব? যা নিয়ে কি করব জানি না সেটা নেবই বা কেন?

প্র—দর্শনার্থীরা আশ্রমে কেন আসে?

ম—তারাই জানে কেন আসে।

প্র—এখানে কেউ আসুক আর থাকুক তাতে আপনার আপত্তি নেই, মনে হয়।

ম—না।

প্র—অনুরূপভাবে যতদিন ইচ্ছা থাকলেও আপনার আপত্তি নেই।

ম—না। আমার পছন্দ না হলে আমি চলে যাব। ব্যস্।

একজন উকিল ভক্ত শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করে যে গতকালের কমিসনের জেরায় তাঁর কষ্ট হয়েছিল কিনা।

ম—আমি মন ব্যবহার করিনি তাই কোন কষ্ট হয়নি। তারা হাজারবার জিজ্ঞাসাবাদ করুক। আমার কিছু এসে যায় না।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮২। ভ—তান্ত্রিক সাধনায় কি আত্মোপলব্ধি হয়?

ম—হাঁ।

ভ—তন্ত্রের কোন্ উপাসনাটা ভাল ?

ম—সেটা মানসিকতার ওপর নির্ভর করে।

ভ—আত্মোপলব্ধিতে কুণ্ডলিনীর কি অবদান ?

ম—তোমার লক্ষ্য যাই হোক তা থেকেই কুণ্ডলিনী জাগে। কুণ্ডলিনী প্রাণশক্তি (প্রাণস্রোত)।

ভ—বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন চক্রে বিভিন্ন দেবতা আছেন। সাধনার সময়ে কি এদের দেখা যায় ?

ম—ইচ্ছা থাকলে দর্শন হয়।

ভ—আত্মোপলব্ধির পথ কি সমাধির মধ্যে দিয়ে যায়।

ম—এ দু'টি সমার্থ।

ভ—বলা হয় যে গুরু তাঁর নিজের শক্তি সঞ্চারিত ক'রে শিষ্যকে আত্মোপলব্ধি করাতে পারেন। এটা কি সত্য ?

ম—হাঁ। গুরু আত্মোপলব্ধি এনে দেন না। কেবল বাধাগুলো সরিয়ে দেন। আত্মা নিত্য অনুভূত।

ভ—আত্মোপলব্ধির জন্য কি গুরুর একান্তই প্রয়োজন ?

ম—যতক্ষণ তুমি আত্মোপলব্ধি খুঁজছ ততক্ষণ গুরু প্রয়োজন। গুরু আত্মা। গুরু্কে প্রকৃত আত্মা ও নিজেকে ব্যক্তিসত্তা বলে গ্রহণ কর। এই দ্বৈতবোধ দূর হওয়াই অজ্ঞান দূর হওয়া। যতক্ষণ তোমার মধ্যে দ্বৈতবোধ আছে ততক্ষণ গুরু প্রয়োজন। নিজেকে শরীর বলে মনে কর তাই গুরুকেও একজন শরীরী বলে বোধ কর। তুমিও শরীর নও আর গুরুও একটি শরীর নন। তুমি আত্মা, গুরুও তাই। যাকে তুমি আত্মোপলব্ধি বল তার দ্বারা এই জ্ঞানটা পাওয়া যায়।

ভ—কোন ব্যক্তিবিশেষ উপযুক্ত গুরু কিনা কি করে জানা যাবে ?

ম—তাঁর সান্নিধ্যে তোমার মনে যে শান্তি আসে আর তাঁর প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তার দ্বারা।

ভ—গুরু যদি অনুপযুক্ত হন তবে সেই একান্ত বিশ্বাসী শিষ্যের কি হবে?

ম—যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

ভ—সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

ম—আত্ম-সংস্কার স্বতঃই সমাজ-সংস্কারে পর্যবসিত হয়। আত্ম-সংস্কারে লেগে থাকো। সমাজ-সংস্কার আপনা হতে হবে।

ভ—গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার কি মত?

ম—তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

ভ—মৃতদেহ স্পর্শ করলে কি স্নান করা দরকার?

ম—দেহটা শব। যতক্ষণ তার সংস্পর্শে থাকা যায় ততক্ষণ আত্মোদকে স্নান করা উচিত।

ভ—যদি অদ্বৈতই শেষ কথা হয় তবে মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদ শিক্ষা দিলেন কেন?

ম—তোমার আত্মা দ্বৈত না অদ্বৈত? সব সম্প্রদায়ই আত্ম-সমর্পণ স্বীকার করে। আগে সেটা লাভ কর তারপর কোন্ মতবাদ ঠিক বা ভুল বিবেচনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

ভ—আপনি কেন লোকেদের ঠিক পথে চালিত করার জন্য ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন না?

ম—তুমি নিজেই আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছ যে আমি ধর্মোপদেশ দি না। তুমি কি জানো আমি কে আর ধর্মোপদেশ দেওয়া কি?

ভ—ব্রাহ্মণ-বিধবাদের মস্তক-মুণ্ডনের বিধি কি নিষ্ঠুরতা নয়?

ম—সেটা ধর্মশাস্ত্রী বা সংস্কারকদের জিজ্ঞাসা করা যায়। আগে নিজের সংস্কার কর তারপর অন্য বিষয় দেখা যাবে।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮৩। ভ—কি উপায়ে 'জিতসঙ্গদোষঃ' (সঙ্গজনিত দোষ বিজয়ী) হওয়া যায়?

ম—সৎসঙ্গের দ্বারা। "সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বম্, নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্বম্, নির্মোহত্বে নিশ্চলতত্ত্বম্, নিশ্চলতত্ত্বে জীবন্মুক্তিঃ।"

সৎসঙ্গের অর্থ সৎ-এর সহিত সঙ্গ। আত্মাই একমাত্র সৎ। যেহেতু এখন আত্মাকে সৎ বলে জানা যাচ্ছে না সেহেতু যে সাধু এটা জেনেছেন তাঁর সঙ্গ খোঁজা হয়। সেটাই সৎসঙ্গ। ফলে অন্তর্মুখীনতা হয়। তারপর সৎ-এর প্রকাশ হয়। সঙ্গ কার? দোষ কার?

ভ—আত্মার।

ম—না। আত্মা বিশুদ্ধ নিশ্চল। অহংকারই দোষযুক্ত হয়।

ভ—আত্মা কি শরীর ছাড়া থাকতে পারে?

ম—আর একটু পরে তাই হবে—গভীর ঘুমে। আত্মা শরীরহীন। এমনকি এইক্ষণেও তাই।

ভ—একজন সন্ন্যাসী কি সংসারে থাকতে পারে?

ম—যতক্ষণ একজন নিজেকে সন্ন্যাসী বলে মনে করে, সে সন্ন্যাসী নয়। একজন যদি সংসার-চিন্তা না করে সে সংসারী নয়; বরং তাকে সন্ন্যাসী বলা যায়।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮৪। ভ—ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, "শুদ্ধ বুদ্ধি, গুরুসেবা ও অনুসন্ধানের দ্বারা আত্মোপলব্ধি কর।" এগুলোর সামঞ্জস্য কি করে হয়?

ম—'ঈশ্বরোগুরুরাত্মেতি'—ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা এক। যতক্ষণ তোমার ভেদবুদ্ধি আছে ততক্ষণ গুরু দূরে আছেন ভেবে তুমি তাঁকে খোঁজো। যা হোক তিনি তোমায় প্রকৃত শিক্ষা দেন আর তুমি অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর।

ভ—কৃপা ক'রে এটা ব্যাখ্যা করুন—

অহমেকো ন মে কশ্চিৎ নাহমন্যস্য কস্যচিৎ।

ন তং পশ্যামি যস্যাহং তং ন পশ্যামি যো মম॥

(আমি একক; কেহই আমার নয়, আমিও কাহারও নই; এমন কাহাকেও দেখিনা যার আমি; এমন কেহই নাই যে আমার।)

ম—এই শ্লোকটি বিভিন্ন শাস্ত্রে যথা ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এটাই 'আত্মানুসন্ধান' বই-এর একাদশ পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য।

অহম্—'আমি' এক। অহংকার অনেক। একই আত্মাতে তারা রয়েছে। আত্মা অহংকারগুলোর দ্বারা বিচলিত হয় না। 'আমি' কেবলমাত্র এক। 'আমি'ই সত্য। আর যা কিছু সবই দ্বৈতবুদ্ধি খণ্ডন করার জন্য।

২৮৫। ভ—আত্মা যদি নিজেই চেতনা তবে এখন কেন আমি তার বিষয়ে সচেতন নই?

ম—কোন দ্বৈতবোধ নেই। তোমার বর্তমান জ্ঞান অহংকারের আর সেটা আপেক্ষিক। আপেক্ষিক জ্ঞানের জন্য একজন বিষয়ী ও একটা বিষয় দরকার। অপরপক্ষে আত্মার জ্ঞান পূর্ণ ও সেটা বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না।

স্মৃতিও অনুরূপভাবে আপেক্ষিক, একটা স্মরণের বিষয় ও যে স্মরণ করে দু'টি চাই। যখন কোন দ্বৈতভাব নেই তখন কে কাকে স্মরণ করে?

ভ—দেহত্যাগ হলে উদ্ভূত অহংকারের কি হয় ?

ম—'আমি'-চিন্তাই অহংকার। এর সূক্ষ্ম অংশে সে একটা চিন্তা হয়েই থাকে আর এর স্থূল অংশটা দিয়ে সে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর পরিব্যাপ্ত করে। এরা গভীর ঘুমে অহংকারের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আত্মা থাকে ; মৃত্যুতেও এরূপ হয়।

অহংকার আত্মা ছাড়া একটা পৃথক কিছু বস্তু নয় যে আপনা হতে জন্মাবে ও লয় হবে। এটা আত্মার হাতের যন্ত্রের মত পর্যায়ক্রমে একবার কাজ করে আর একবার করে না। তার অর্থ এর উদয় ও লয় হয় ; একেই জন্ম ও মৃত্যু ভাবা যেতে পারে।

আপেক্ষিক জ্ঞান মনের, আত্মার নয়। অতএব সেটা আরোপিত ও অস্থায়ী। একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টান্ত নাও। সে একটা সিদ্ধান্ত সূত্রবদ্ধ করলে যে পৃথিবী গোলাকার আর সেটা প্রমাণ ও অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠাও করলে। যখন সে ঘুমাতে গেল সব ধারণা মুছে গেল ; তার মন শূন্য হয়ে গেল ; যখন সে নিদ্রিত তখন পৃথিবী গোলাকার কি চেপ্টা তাতে তার কি এসে যায়। সুতরাং দেখছ, সব আপেক্ষিক জ্ঞান কিরূপ তুচ্ছ।

একজনকে এরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীতে যেতে হবে আর আত্মাতে থাকতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান এইরূপ একটা অনুভূতি, আর সেটা মনের ধারণা নয়।

ভ—শ্রীভগবান কেন বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সর্ব-সাধারণ্যে ধর্মোপদেশ দেন না ?

ম—কি করে জানলে যে আমি এটা করছি না ? উপদেশ বিতরণ কি একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া ? উপদেশ জ্ঞানের আদান-প্রদান। এটা মৌনের দ্বারাও করা যায়।

একজন একঘণ্টা জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে তার জীবনে পরিবর্তন আনার মত বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে চলে যায় ; সেটা কি রকম ? তাকে আর একজনের সঙ্গে তুলনা কর, যার পুণ্য-

সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থেকে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। নিষ্ফল বক্তৃতা দেওয়া বা নীরবে বসে স্বজ্ঞার শক্তি বর্ষণ ক'রে অন্যদের আপ্যায়িত করা, কোনটা ভাল?

আবার বাক্য কোথা থেকে ওঠে? অব্যক্ত জ্ঞান আছে। তার থেকে অহংকার ওঠে; সে আবার যথাক্রমে চিন্তা ও কথার জন্ম দেয়। সুতরাং—

অব্যক্ত জ্ঞান
|
অহংকার
|
চিন্তা
|
বাক্য

অতএব বাক্য মূল উৎসের প্রপৌত্র। যদি বাক্যের কোন প্রভাব থাকে তবে মৌনের কত শক্তি? নিজেই বিবেচনা কর।

২৮৬। ভ—আমরা জাগৃতির মত ইচ্ছামত ও ইচ্ছাকৃতভাবে সুষুপ্তিতে থাকতে পারি না কেন?

ম—এই অবস্থাতেও সুষুপ্তি রয়েছে। আমরা সদা-সুষুপ্ত। এই অবস্থায় তাতে সচেতনভাবে যাওয়া ও তাকে অনুভব করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে কোন যাওয়া বা আসা নেই। সেটার সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই সমাধি। একজন অজ্ঞানী অনেকক্ষণ সুষুপ্তিতে থাকতে পারে না, স্বভাব তাকে ঠেলে জাগিয়ে দেয়। তার অহংকার না মরার জন্য জেগে ওঠে। জ্ঞানী কিন্তু তাকে মূলেই নষ্ট করে দেয়। তারও স্বভাবের অর্থাৎ প্রারব্ধের প্রেরণায় অহংকার জাগে। অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই অহংকার অঙ্কুরিত হচ্ছে কিন্তু পার্থক্য এই যে অজ্ঞানীর যখন অহংকার জাগে তখন সে তার উৎস সম্বন্ধে অজ্ঞ কিংবা সে জাগ্রত ও স্বপ্নকালে তার সুষুপ্তির সম্বন্ধে সচেতন নয়;

অপরপক্ষে জ্ঞানীর যখন অহংকার জাগে সে তার উৎসে লক্ষ্য স্থির রেখে অহংকারের দ্বারা তুরীয় অবস্থা উপভোগ করে। এই অহংকার বিপদজনক নয়—যেন একটা পোড়া দড়ির আকারমাত্র; এজন্য সেটা নিষ্ফল। সর্বক্ষণ উৎসে লক্ষ্য রাখায় নুনের পুতুলের সাগরে গলে যাওয়ার মত আমাদের অহংকার মূলেই নষ্ট হয়ে যায়।

ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে একুশ দিনের বেশী নির্বিকল্প সমাধি হতে পারে না। হলে শরীর থাকে না। সেটা কি ঠিক?

ম—প্রারব্ধ শেষ হয়ে গেলে অহংকার নিশ্চিহ্ন হয়ে লয় হয়ে যায়। এই চরম মুক্তি। সম্পূর্ণরূপে প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া অবধি জীবনমুক্তেরও অহংকার বিশুদ্ধ রূপে প্রকাশ পায়। একুশ দিন যে সর্বাধিক দীর্ঘ সময় এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বলা হয় যে ৩০।৪০ দিনের বেশী উপবাস করা যায় না কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে লোকে ১০০ দিনও উপবাস করেছে। তার অর্থ তাদের তখনও প্রারব্ধ রয়েছে।

ভ—উপলব্ধি হওয়া কি করে সম্ভব হয়?

ম—পরমাত্মা রয়েছে, তার থেকে অগ্নির মত স্ফুলিঙ্গ ওঠে। এই স্ফুলিঙ্গগুলো অহংকার। অজ্ঞানীর পক্ষে সেই স্ফুলিঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে কোন বস্তুর সহিত অভিন্ন মনে করে। এই বস্তুর সম্পর্ক ছাড়া এটা স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে না। এই সম্বন্ধই অজ্ঞান আর এটা নষ্ট করাই আমাদের চেষ্টার লক্ষ্য। যদি এর বস্তুর সহিত সান্নিধ্য নষ্ট করা যায় তবে এটা বিশুদ্ধ থাকে আর আপন উৎসে মিলিয়ে যায়। শরীরের সঙ্গে ভুল নির্ধারণই দেহাত্মবুদ্ধি। সুফল লাভের পূর্বে এটা যাওয়া চাই।

ভ—কি করে নষ্ট করা যায়?

ম—আমরা সুষুপ্তিতে দেহ ও মন ছাড়াই থাকি। কিন্তু অন্য দু'টি অবস্থায় আমরা এদের সঙ্গে সংযুক্ত। যদি দেহের সঙ্গে এক হই তবে সুষুপ্তিতে দেহ ছাড়া কি করে থাকি? যা আমাদের

বাইরে তার থেকে আমরা পৃথক থাকতে পারি কিন্তু যা আমাদের সঙ্গে এক তার থেকে নয়। সে কারণে অহংকার ও দেহ এক নয়। জাগ্রত অবস্থায় এটা উপলব্ধি করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করার জন্যই অবস্থাত্রয় (জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) বিচার করতে হবে।

অহংকারের বিশুদ্ধ অবস্থা দু'টি অবস্থা বা দু'টি চিন্তার মধ্যবর্তীকালে অনুভূত হয়। অহংকার জোঁকের মত একটা কিছু ধরে তবে অন্যটাকে ছাড়ে। যখন এটা বস্তু বা চিন্তার সম্বন্ধ-রহিত অবস্থায় থাকে তখনই এর স্বরূপ বোঝা যায়। অবস্থাত্রয়ের বিশেষ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্যয় দিয়ে এই মধ্যবর্তী অবস্থাকে উপলব্ধি কর।

ভ—ঘুম কিভাবে আসে আর কি করেই বা জেগে উঠি ?

ম—যেমন সন্ধ্যাবেলায় মুরগী কঁ কঁ করে ডেকে ওঠে আর তার বাচ্চাগুলো ছুটে তার পাখার তলায় লুকিয়ে পড়ে ; মুরগীও বাচ্চাগুলোকে সামলে নিয়ে বাসায় ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হলেই বাচ্চাগুলো বেরিয়ে পড়ে আর তাদের সঙ্গে মুরগীও। ঠিক তেমনি অহংকারও মুরগীমায়ের মত সব চিন্তাগুলো জড়ো ক'রে ঘুমাতে যায়। সকালে সূর্যরশ্মি প্রকাশ পায় আর সন্ধ্যায় তা সংহিত হয়ে অস্ত যায়। অনুরূপভাবে অহংকারের প্রকাশ হলে সে তার আনুষঙ্গিক সব কিছু নিয়েই প্রকাশ পায়। আর যখন সে নিমীলিত হয় তখন সব কিছু তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়।

ভ—সুষুপ্তির রূপ কি ?

ম—মেঘলা রাত্রে কোন কিছুই বিশেষভাবে বোঝা যায় না আর চোখ খোলা থাকলেও একটা ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না ; সেরূপ সুষুপ্তিতে দ্রষ্টা কেবল 'কিছু জানি না'ই জানে।

শ্রীভগবান কোন এক জিজ্ঞাসুকে মন্তব্য করেছিলেন, "যেখানে জগতটা নিজেই অসৎ সেখানে সৎ ও অসতের আলোচনায় কি লাভ ?"

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮৭। জনৈক পাঞ্জাবী চিকিৎসক সস্ত্রীক শ্রীভগবানকে দর্শন করতে এলেন। শ্রীভগবান মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন হলঘরে এলেন তখন তিনি সেখানেই ছিলেন; তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"ধ্যান কি করে করব? আমার মনে শান্তি নেই।"

ম—শান্তিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এটা লাভ করার কিছু নেই। চিন্তাগুলো বিলোপ করতে হবে।

ভ—বিলোপ করার চেষ্টা করছি কিন্তু সফল হই না।

ম—গীতার উপায়ই একমাত্র পথ। যখনই মন চঞ্চল হয় তখনই তাকে ধরে এনে ধ্যানে বসাও।

ভ—মনকে ধ্যানে বসাতে পারি না।

অন্য একজন ভক্ত—হাতীর শুঁড়টা খালি থাকলে সে সেটা এদিক ওদিকে ঘোরায় আর অস্থির হয়। তাকে যদি খানিকটা শিকল দেওয়া যায় তখন সেটা শুঁড়ে ধরা থাকলে হাতীর আর অস্থিরতা থাকে না। সেরূপ লক্ষ্যহীন মন অস্থির, লক্ষ্যীকৃত মন শান্ত থাকে।

ভ—না, না, এসব তত্ত্বকথা। অনেক বই পড়েছি। কোন ফল হয়নি। মনকে স্থির করা একান্ত অসম্ভব।

ম—সংস্কার থাকা অবধি একাগ্রতা হওয়া শক্ত। তারা ভক্তিকেও বাধা দেয়।

দোভাষী প্রশ্নকারীকে 'আমি কে?' বইটি পড়তে পরামর্শ দিলে। চিকিৎসক প্রতিবাদ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন—"আমি ওটাও পড়েছি তবু মন স্থির করতে পারি না।"

ম—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা—'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্'।

ভ—বৈরাগ্যই দরকার…।

ম—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। এলোমেলো চিন্তার

অভাবই বৈরাগ্য ; কেবলমাত্র একটি বিষয় চিন্তাই অভ্যাস। একটা ধ্যানের নঞর্থক অন্যটা সদর্থক দিক।

ভ—আমি নিজে করতে পারছি না। তাই একটা শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ম—হ্যাঁ, তাকেই কৃপা বলে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মন দুর্বল বলে আমরা অক্ষম। কৃপার প্রয়োজন। এর জন্যই সাধুসেবার দরকার। যা হোক নূতন কিছু পাওয়ার নেই। যেমন একজন দুর্বল লোক সবল লোকের অধীন হয়, তেমনি দুর্বল মন সবল-মনা সাধুর সান্নিধ্যে অবদমিত হয়। যা আছে—সে কেবল কৃপা ; এ ছাড়া আর কিছু নেই।

প্রশ্নকারী বললেন, "আমার কল্যাণের জন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

ভগবান বললেন, "হাঁ—হাঁ"।

তিনি স্ত্রীর সহিত বিদায় নিলেন।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮৮। বেদান্তের 'মায়া' ও প্রত্যভিজ্ঞার 'স্বতন্ত্র' সম্বন্ধে শ্রীভগবান বললেন—বৈদান্তিক বলে শিবের ওপর আরোপিত ভ্রমের শক্তিই 'মায়া'। মায়ার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। মায়া জগৎ-ভ্রমকে সত্য বলে প্রকাশ করে ও জীবের অজ্ঞানের ওপর লীলা করে। যখন তার না থাকার সত্যতা জানা যায় তখন সে অদৃশ্য হয়। 'অভিজ্ঞা' বলে শিব ও শক্তি নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত (অবিনাভাব)। একটি ছাড়া অন্যটি থাকে না। শিব অব্যক্ত, অপরপক্ষে শক্তি তার স্বতন্ত্রতার (স্বাধীন-ইচ্ছার) জন্য ব্যক্ত। বিশুদ্ধ চেতনার ওপর তার ব্রহ্মাণ্ড রচনা যেন দর্পণের ওপর প্রতিচ্ছায়া। প্রতিবিম্ব দর্পণের অভাবে থাকতে পারে

না। স্থতরাং জগতের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে 'স্বতন্ত্র' ব্রহ্মের একটি গুণ। শ্রীশঙ্কর বলেন ব্রহ্ম নির্গুণ, 'মায়া' নেই আর এর কোন প্রকৃত সত্তা নেই। এ দু'টির মধ্যে কি পার্থক্য ? দু'জনেই স্বীকার করছে যে প্রকাশটা সত্য নয়। দর্পণের প্রতিবিম্ব কোন পক্ষেই সত্য নয়। জগৎ বস্তুতঃ নেই। দুই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। তাদের চরম লক্ষ্য পূর্ণ চৈতন্যের উপলব্ধি। প্রত্যভিজ্ঞাতে প্রপঞ্চের অসত্যতা পরোক্ষ (প্রচ্ছন্ন), অন্যপক্ষে বেদান্তে এটা প্রত্যক্ষ (স্পষ্ট)। যদি জগতকে চিৎ বলা হয় তবে এটা সর্বদাই সত্য। বেদান্ত বলে 'নানাত্ব' নেই অর্থাৎ সবই অপরিবর্তিত সত্য। দুই-এর মধ্যে সব বিষয়েই মিল রয়েছে কেবল যা ভাষা ও বলার ভঙ্গীর পার্থক্য।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৬

২৮৯। কর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বললেন—"কর্মের ফল আছে। তারা ঠিক যেন কার্য ও কারণ। যাকে আমরা ঈশ্বর বলি সেই শক্তির জন্যই কার্য ও কারণ সম্বন্ধ হয়। ঈশ্বর ফল দাতা।"

একজন দর্শনার্থী আত্মার নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যাওয়ার কথা বলছিল। শ্রীভগবান কিছুক্ষণ পরে বললেন—"লোকে আত্মার পূর্ণতা সম্বন্ধে স্মৃতি ও বিস্মৃতির কথা বলে। স্মৃতি ও বিস্মৃতি চিত্তবৃত্তিমাত্র। যতদিন চিন্তা আছে, এরা পর্যায়ক্রমে থাকবে। কিন্তু সত্য এ দু'টির অতীত। স্মৃতি বা বিস্মৃতিকে কোন বস্তু-সাপেক্ষ হতে হবে। সেই বস্তু নিশ্চয় তাদের সমপর্যায়ের নয় ; তা না হলে বিস্মৃতি হয় না। একেই সবাই 'আমি' বলে। খুঁজতে গেলে একে পাওয়া যায় না কারণ এ সত্য নয়। সেজন্য 'আমি'টা মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমার্থ। সমস্ত আধ্যাত্মিক উপদেশের লক্ষ্য অজ্ঞান যে আদৌ ছিল না সেটা

৬

জানা। যে সচেতন তারই অজ্ঞান হতে পারে। সচেতনতাই জ্ঞান। জ্ঞান শাশ্বত ও স্বরূপ। অজ্ঞান কৃত্রিম ও অসৎ।

ভ—এই সত্য শুনে সন্তুষ্ট থাকা যায় না কেন?

ম—কারণ সংস্কার নষ্ট হয় নি। সংস্কার লয় না হলে সর্বদা সন্দেহ ও বিপরীত জ্ঞান হবে। যা কিছু চেষ্টা সে কেবল সন্দেহ ও বিপরীত জ্ঞান দূর করার জন্য। এটা করতে গেলে তাদের মূল উচ্ছেদ করতে হবে। এদের মূল সংস্কার। গুরু উপদিষ্ট অভ্যাসে এগুলো নিষ্ফল হয়ে যায়। গুরু সাধকের করার জন্য মাত্র এইটুকুই অবশিষ্ট রাখেন যাতে সে নিজেই বুঝতে পারে যে অজ্ঞান বলে কিছু নেই। যে সত্যের কথা বলা হল সেটা শ্রবণের স্তর, কিন্তু দৃঢ় নয়। একে দৃঢ় করতে হলে মনন ও নিদিধ্যাসন করা দরকার। এ দু'টি অভ্যাসের দ্বারা বাসনার বীজ জ্বলে যায় সুতরাং তারা আর অঙ্কুরিত হতে পারে না।

কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তি 'সকৃচ্ছ্রবণ মাত্রেণ' অর্থাৎ একবার মাত্র শুনেই দৃঢ় জ্ঞান লাভ করে। কারণ তারা কৃতোপাসক (উত্তম অধিকারী), অন্যপক্ষে অকৃতোপাসকের (নিম্ন অধিকারীর) দৃঢ় জ্ঞান লাভ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। লোকে জিজ্ঞাসা করে—"অবিদ্যার কি করে উদয় হল?" তখন আমাদের বলতে হয়, "অবিদ্যার উদয় আদৌ হয়নি। এর কোন প্রকৃত সত্তা নেই। যা আছে তা কেবল বিদ্যা।"

ভ—তবে আমি এটা উপলব্ধি করতে পারছি না কেন?

ম—সংস্কারের জন্য। যাই হোক কে উপলব্ধি করছে না আর কি উপলব্ধি করছে না, খোঁজো। তা হলেই অবিদ্যা যে নেই তা স্পষ্ট হবে।

২৯০। বোম্বাই-এর বস্ত্র ব্যবসায়ী মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক, শ্রীসাগর মল্ল, মনে হয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলে 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিৎ' আর পরের সূত্রে বলে 'সূত্রে মণিগণাইব'—'আমার অতিরিক্ত কিছু নাই' আবার পরে 'সুতায় মণির মত'। যদি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নেই তবে জগতকে কি করে 'সুতায় গাঁথা মণির মত' বলা যায়?

ম—এর অভিপ্রায় এই যে সূত্র ও মণি 'আমার' থেকে পৃথক নয়। সূত্র ছাড়া মণিগণ নেই আর 'আমার' অতিরিক্ত সূত্রও নেই। শ্লোকে একত্বের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নানাত্বের ওপর নয়, নানাত্ব ওপরভাসা।

ভ—ঈশ্বরে লয় হলেই একত্ব হতে পারে এটা সত্য কিন্তু ততক্ষণ অবধি নানাত্ব আছে। এটাই সংসার।

ম—এখন আমরা কোথায় আছি? আমরা কি ঈশ্বর থেকে পৃথক? সংসার ও আমরা সবই ঈশ্বরে রয়েছে।

ভ—কিন্তু এটা জ্ঞানীর অনুভূতি। জ্ঞান না হওয়া অবধি বৈচিত্র্য থাকে। সুতরাং আমার কাছে সংসার আছে।

ম—সংস্কারই সংসার।

ভ—ঠিক। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'—এই সত্য আমাদের বিস্মরণ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা নিজেকে ঈশ্বর বলে বুঝতে পারি না।

ম—বিস্মরণ কোথায়?

ভ—স্বপ্নের মত।

ম—কার স্বপ্ন?

ভ—জীবের।

ম—কে জীব?

ভ—এটা পরমাত্মার।

ম—তবে পরমাত্মাই জিজ্ঞাসা করুক।

ভ—আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আমার সন্দেহ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ম—সন্দেহের আবার উদাহরণ ও বোঝানো কি? প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বোঝাবার জন্য কোন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।

ভ—প্রত্যক্ষ আর বিস্মরণও আছে।

ম—কি বিস্মরণ আর কার দ্বারা হয়েছে?

ভ—শুনুন! একজন স্বপ্ন দেখে, জেগে উঠলে স্বপ্ন চলে যায়।

ম—সেরূপ বর্তমান স্বপ্ন থেকেও জেগে ওঠো।

ভ—প্রকৃতি অত্যন্ত বলবতী।

ম—পুরুষকেও দেখো। তবে প্রকৃতি আর কি করবে?

ভ—এদের মধ্যে গ্রন্থি আছে।

ম—গ্রন্থিটা কার? এটা পুরুষের না প্রকৃতির কিংবা দু'জনের?

ভ—ব্রহ্মের জন্য।

ম—তবে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসা করুক কিংবা ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। স্বপ্নটা কার? বা গ্রন্থিটা কার? তুমি সব সময় বলছ 'আমি জিজ্ঞাসা করছি'। সেই 'আমি'টা কে?

ভ—আমি দেখতে পাই না।

ম—'আমি' নিত্য। এটা বিশেষ একটা কিছু হলে অদৃশ্য হয়ে যেত। এটা পূর্ণ। সুতরাং একে একটা বিষয়রূপে দেখা যায় না।

ভ—কিন্তু আমি অসম্পূর্ণ।

ম—অপূর্ণতা আনছ কেন? কেনই বা পূর্ণ নও? সুষুপ্তি-তে কি অসম্পূর্ণতা অনুভব করেছিলে? এক্ষণেও সেরূপ থাকো না কেন? জাগ্রত অবস্থায় সুষুপ্তিকে (জাগ্রত-সুষুপ্তি) নিয়ে এস তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। "যা নিশা সর্বভূতানাম্···পশ্যতো মুনেঃ" (যা অজ্ঞানীর রাত্রি সেটা জ্ঞানীর পক্ষে দিন)।

ভ—হাঁ, যদি সে মুনি হয়।

ম—কে মুনি ? সে কি একজন মানুষ নয় ?

ভ—আপনাকে আঘাত করলে কি আপনি অনুভব করেন না ? পার্থক্য কি নেই ? এটা কি জ্ঞান ?

ম—একজন লোককে ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করা হলে বা সে মদ্য পান করলে অনুভব করে না। সে কি জ্ঞানী ? এই অনুভব করার সঙ্গে জ্ঞান কি অসঙ্গত ?

ভ—দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য আছে। এরা জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

ম—ঘুম, মূর্ছা বা অন্যমনস্ক হলে কোন ভেদভাব থাকে না। তুমি কি একে জ্ঞান বল ? এইসব অবস্থায় কি হয় ? তখন যা হয়, এখন কি সেটা নেই ? যা আছে তা সব সময়ে আছে। ভেদভাবটা মনের জন্য হয়। মন এক সময়ে আছে আবার এক সময়ে নেই। সত্যের কোন বিকার হয় না। সত্য সর্বদা আনন্দময়।

ভ—সাধনার ফলে আনন্দ হয়। সেই সাধনা কি ?

ম—কার এসব সন্দেহ জাগছে তার অনুসন্ধানই সাধনা।

ভ—এটা অহংকারের।

ম—অহংকার কোথা থেকে উঠছে ?

ভ—আমাকে পথ দেখানো দরকার।

ম—অন্তরে যাও আর পথ খোঁজো। বাইরে থেকে পাবে না কিংবা বাইরে খুঁজলেও হবে না।

ভ—আমি অহংকারকে খুঁজে বার করতে পারি না। সেখানে আমায় থেমে যেতে হয়।

ম—কি করে একে পাবে ? এটা তোমার থেকে পৃথক নয়। না পাওয়ার কথা থাক। এখন তুমি কোথায় রয়েছ ? তুমি কি বলতে চাও "আমি নেই" ?

ভ—আমি কি বা কেমন ?

ম—তারজন্য চিন্তা করো না। যা আছে থাক। তোমার ভাবনা কিসের ? তুমি কি সুষুপ্তিতে সমষ্টি বা ব্যষ্টি সম্বন্ধে ভেবেছিলে ?

একই লোক এইক্ষণেও রয়েছে। তুমি সুপ্তি ও জাগরণে এক সমান আছ।

ভ—ঘুম ও জাগ্রত দু'টি পৃথক অবস্থা আর তাদের প্রভাব···।

ম—তাতে তোমার কি এসে যায়? সবার মধ্যে আত্মা এক সমান।

ভ—ধ্যানে মন স্থির হয় না।

ম—যখন মন চঞ্চল হয় তখন বার বার তাকে অন্তর্মুখীন কর।

ভ—যখন দুঃখ মনকে অভিভূত করে তখন আত্মানুসন্ধান করা অসম্ভব।

ম—কারণ মন খুব দুর্বল। একে শক্তিমান কর।

ভ—কি করে?

ম—সৎসঙ্গ, ঈশ্বরারাধনা, প্রাণায়ামের দ্বারা।

ভ—কি হয়?

ম—দুঃখ দূর হয়, আমাদের লক্ষ্য দুঃখ দূর করা। তুমি আনন্দ অর্জন কর না। তোমার স্বরূপই আনন্দ। আনন্দ নূতন ক'রে অর্জিত হয় না। যা করা হয় তা কেবল দুঃখ নিবৃত্তি। এই সব উপায়ে তা হয়।

ভ—সৎসঙ্গে মনের শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে। তার সঙ্গে সাধনারও প্রয়োজন। কি সাধনা করতে হবে?

ম—হাঁ, অভ্যাসও দরকার। সংস্কার দূর করাই অভ্যাস। নূতন কিছু লাভ করার জন্য অভ্যাস করা হয় না; কেবল সংস্কার নষ্ট করা।

ভ—অভ্যাসের আমাকে সেই শক্তি দেওয়া উচিত।

ম—অভ্যাসই শক্তি। যদি সব চিন্তাকে একাগ্র ক'রে একটা চিন্তায় আনা যায়, বলা হয় মন শক্তিমান হয়েছে। যখন অভ্যাস দৃঢ় হয় তখন সেটা সহজ (স্বাভাবিক) হয়।

ভ—সে অভ্যাস কি ?

ম—আত্মানুসন্ধান। ব্যস্। আত্মনের বশং নয়েৎ···মনকে 'আত্মা'তে একাগ্র কর।

ভ—কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ? অভ্যাসের জন্য একটা লক্ষ্য চাই।

ম—আত্মাই লক্ষ্য। তাছাড়া আর কি লক্ষ্য হতে পারে ? অন্যগুলো যারা আত্মলক্ষ্য হতে পারে না তাদের জন্য। তারাও অবশেষে আত্ম-বিচারে নিয়ে যায়। সব অভ্যাসের ফলই একাগ্রতা। একজন হয়ত শীঘ্র পায়. অন্যজন দেরীতে। অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে।

ভ—শান্তির প্রশংসা সব থেকে বেশী করা হয়। আমরা কি করে সেটা লাভ করব ?

ম—এটাই তোমার বাস্তবিক স্বরূপ। বিস্মৃতি আত্মাকে আবৃত করে না। আত্মা এখন অনাত্মার সঙ্গে বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই তোমাকে আত্মা, শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্মৃতির কথা বলাচ্ছে। এই বিপরীত জ্ঞান নষ্ট হলে বিস্মৃতি আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

ভ—সেটা কি ক'রে করা যায় ?

ম—আত্মানুসন্ধানে। একাগ্রতার উদ্দেশ্য মনের ক্রিয়ার নিবৃত্তি। আত্মার বিস্মৃতি—আচ্ছা, কিসের বিস্মৃতি ?—আত্মার ?··· তবে কি দু'টি আত্মা আছে ? অভ্যাস সংস্কার দূর করে।

ভ—কিন্তু সংস্কার অনাদি ও অনন্ত—আবহমানকালের।

ম—এটাও একটা সংস্কার। এই ধারণা ছাড়ো, সব সংস্কার একেবারে অদৃশ্য হবে। এই বিশ্রান্তি, শান্তি। শান্তি নিত্য বর্তমান। কিন্তু তুমি একে দাবিয়ে রেখে তার ওপর নিজেকে বসিয়ে এই শান্তি ভঙ্গ কর। তারপর বল 'আমি শান্তি চাই।'

ভ—শান্তি কি ধীরে ধীরে আসবে ?

ম—হাঁ, ভগবদ্গীতা বলে ক্রমে ক্রমে মন স্থির কর (শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ)।

কিছুক্ষণ পরে দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলেন যে একজন শ্রীজি. কি এ মাসের ২০শে নাগাদ এখানে ছিলেন। তিনি মহর্ষির কথা তাঁর কাছে শুনেছেন। শ্রীজি. এখান থেকে যাওয়ার পর খুব আনন্দে আছেন।

ম—আমি সব দর্শনার্থীর নাম কি করে জানব? সে আসলেও আসতে পারে। সবই আনন্দময়। কোন নাম নেই, কোন রূপ নেই···যা হোক লোক-ব্যবহারের জন্য নামের প্রয়োজন।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

নেহাই-এর ফুলকি (২)

২৯১। প্রশ্ন—আপনি সেদিন অত্যাশ্রমের কথা বলেছেন। এর কি কোন প্রামাণিকতা আছে? এর উল্লেখ কি কোথাও আছে?

ম—হাঁ—উপনিষদ, সূত সংহিতা (স্কন্দ পুরাণ), ভাগবত, মহাভারত আরও অন্যান্য বই-এ আছে।

প্র—এই আশ্রমের কি কোন সংযম বা নিয়ম-পদ্ধতি আছে?

ম—এর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।

প্র—সব আশ্রমের গুরু আছে। এই আশ্রমেরও কি গুরু আছে?

ম—হাঁ।

প্র—কিন্তু আপনি গুরুবাদ স্বীকার করেন না।

ম—সবারই গুরু আছে। আমিও আমার গুরুকে স্বীকার করি।

প্র—আপনার গুরু কে?

ম—আত্মা।

প্র—কার জন্য ?

ম—আমার জন্য। গুরু অন্তরে কিংবা বাইরে হতে পারেন। তিনি নিজেকে অন্তরে প্রকাশ করতে পারেন কিংবা বাইরে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্র—অত্যাশ্রমী কি বিষয়-সম্পত্তির মালিক হতে পারে ?

ম—তাদের কোন বিধি-নিষেধ নেই। তারা যা ইচ্ছা হয় করতে পারে। বলা হয় শুক বিবাহ করেছিলেন আর তাঁর সন্তানাদিও ছিল।

প্র—সে ক্ষেত্রে অত্যাশ্রমী গৃহস্থ।

ম আমি আগেই বলেছি যে সে প্রচলিত চারটি আশ্রমের অতীত।

প্র—যদি তারা বিবাহ, বিষয়-সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারে তবে তারা গৃহস্থমাত্র।

ম—এটা তোমার ধারণা।

প্র—তারা কি বিষয়-সম্পত্তির মালিক হতে পারে আর সেটা হস্তান্তর করতে পারে ?

ম—করতে পারে আবার নাও পারে। সবই তাদের প্রারব্ধের ওপর নির্ভর করে।

প্র—তাদের কি কোন কর্ম আছে ?

ম—তাদের আচার-ব্যবহার কোন বিধি-নিষেধের অধীন নয়।

প্র—যখন দর্শনার্থীরা এখানে দু'তিন দিন থাকতে চায় তারা কি আপনার অনুমতি নেয় ?

ম—পরিচালকবর্গের অনুমতিই আমার সম্মতি। দর্শনার্থীরা আমার জন্য আসে, পরিচালকবর্গও আমারই জন্য। যখন উভয়পক্ষের পরস্পর বনিবনা আছে, আমি হস্তক্ষেপ করি না। দর্শনার্থীরা এখানে এলে তাদের স্বীকার করি ; অন্যেরা কি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে

সাহস করবে ? পরস্পরের শুভেচ্ছায় যে সকল কাজ এখানে হয় তাতে আমার অনুমোদন আছে মনে করতে হবে।

শ্রীভগবানকে তাঁর হাতের লেখা, নিজেকে সুব্রমণীয় বলে স্তুতি করা একটা কবিতা দেখানো হল।

শ্রীভগবান বললেন যে হাতের লেখাটা তাঁর কিন্তু ভাব-ধারাটা পেরুমলস্বামীর।

প্র—কিন্তু এতে যা বলা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই আপনার সম্মতি নেই ?

ম—একটি মূর্তিকে সুব্রমণীয় বলে স্তুতি করা হয়, এও সেরূপ।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯২। 'তন্মাত্রা' স্বপ্নের কারণ কি না প্রশ্ন করা হলে শ্রীভগবান বললেন—না। তন্মাত্রা সূক্ষ্ম—স্বপ্নের থেকেও সূক্ষ্ম। যদিও জাগ্রত অবস্থার স্থূল জগৎ থেকে স্বপ্ন-জগৎ সূক্ষ্ম তবুও তন্মাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে সেটাও স্থূল। তন্মাত্রার পঞ্চীকরণ হলে অন্তঃকরণের আকার হয়। সেখানেও ক্রিয়াপরতার কারণসমূহের বিভিন্ন সমাবেশে, ব্যাপক আকাশরূপী সত্বের নিয়ন্ত্রণাধীনে জ্ঞানের (বস্তুজ্ঞান) উদয় হয়, এই জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্ক।

বায়ু থেকে মনের উৎপত্তি হয়,
তেজ থেকে বুদ্ধির উৎপত্তি হয়,
জল থেকে চিত্ত (স্মৃতি ইত্যাদির) উৎপত্তি হয়,
পৃথিবী থেকে অহংকারের উৎপত্তি হয়।

তারা (তন্মাত্রা) সমষ্টিগত, কারণ তারা সমষ্টিগত বা একক-ভাবে এক কিংবা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত কর্ম করতে সমর্থ।

তারা রজোগুণের দ্বারা ব্যষ্টিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়, তমোগুণের দ্বারা ব্যষ্টিতে কর্মেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। জগৎ ও ব্যষ্টিতে একই তন্মাত্রা থাকার ফলে এই দুই-এর মধ্যে সম্বন্ধ হওয়ার সুবিধা হয়।

প্রকৃতি থেকে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। যুগপৎ ও ক্রমসৃষ্টি বাদেব উল্লেখ করা হয। সৃষ্টির ওপর না দিয়ে সৃষ্টিব মূল উৎসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়াই এর তাৎপর্য।

২৯৩। শ্রীকে. কে. ভি. আইয়ার—ধ্যানের দ্বারা অন্তরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ম—তা ছাড়াই বা আমরা এখন কোথায় আছি? আমাদের সত্তাই তাই।

ভ—তা হলেও আমরা তার সম্বন্ধে অজ্ঞ।

ম—কি বিষয়ে অজ্ঞ আর কাবই বা অজ্ঞতা। যদি আত্মার সম্বন্ধে হয় তবে কি দু'টি আত্মা আছে?

ভ—দু'টি আত্মা নেই। সীমিত-বোধ অস্বীকার করা যায় না। এই সীমিত-বোধের জন্য…।

ম—সীমিত-বোধ কেবল মনের। তুমি কি সুষুপ্তিতে এটা অনুভব করেছিলে? তুমি সুষুপ্তিতে থাকো। তুমি তখন তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করো না। সেই আত্মা এক্ষণেও এখানে এই জাগ্রত অবস্থায় রয়েছে। তুমি এখন বলছ সীমিত-বোধ আছে। এখন কি-ই বা এমন হয়েছে যে দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হয়েছে? পার্থক্যটা মনের জন্য হয়। সুষুপ্তিতে কোন মন ছিল না। অপরপক্ষে এখন সেটা সক্রিয়। আত্মা কিন্তু মনের অভাবেও থাকে।

ভ—বোঝা গেলেও অনুভব হয় না।

ম—ধ্যানের দ্বারা ক্রমে ক্রমে অনুভূত হয়।

ভ—ধ্যান মনের দ্বারাই হয় তবে সে কি ক'রে মনকে নষ্ট ক'রে আত্মাকে প্রকাশ করবে ?

ম—(একটা চিন্তায় লেগে থাকাই ধ্যান। সেই এক চিন্তা অন্য চিন্তাদের দূরে রাখে ; চঞ্চলতা দুর্বল মনের লক্ষণ। অবিরত ধ্যানে মনের শক্তি বাড়ে অর্থাৎ সতত অপসৃয়মান চিন্তাজনিত দুর্বলতা ক্রমশঃ চিন্তারহিত আধারের শক্তিকে স্থান ছেড়ে দেয়।) এই চিন্তা-শূন্য ব্যাপ্তিই আত্মা। মনের বিশুদ্ধ অবস্থাই আত্মা। শ্রীভগবান পূর্ববর্তী প্রশ্নকারীকে উত্তর দিয়ে চললেন—সবাই বলে 'আমি শরীর'। এটা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই অভিজ্ঞতা। অজ্ঞানী বিশ্বাস করে যে আত্মা কেবল দেহতেই সীমিত, অপরপক্ষে জ্ঞানী বিশ্বাস করে যে দেহটা আত্মা থেকে পৃথক থাকতে পারে না। তার আত্মা অসীম আর দেহটাও তারই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবোস বললেন যে তিনি তাঁর (শ্রীভগবানের) সান্নিধ্যে শান্তি অনুভব করেন আর সেটা কিছুকাল থাকে। আরও যোগ করলেন, "এটা স্থায়ী হয় না কেন ?"

ম—এই শান্তিই প্রকৃত স্বরূপ। বিপরীত ধারণাগুলো আরোপিত। এটাই প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত যোগ ও প্রকৃত জ্ঞান। তুমি বলবে যে অভ্যাসে এই শান্তি হয়। অভ্যাসে বিপরীত ধারণা-গুলোই ত্যাগ হয়। ব্যস্। তোমার প্রকৃত স্বরূপ সর্বদা থাকে। এরূপ সাময়িক অনুভূতিগুলো আত্মোপলব্ধির পূর্বাভাস।

প্রথম প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন—হৃদয়ই আত্মা। এটা অন্তরে বা বাহিরে নয়। মন তার শক্তি। মনের উদয় হলে জগৎ প্রকাশ হয় আর শরীরটা জগতে আছে মনে হয়। বাস্তবিকপক্ষে সবই আত্মায় রয়েছে আর তারা আত্মা ছাড়া পৃথক থাকতে পারে না।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯৪। শ্রীপারথী—ধ্যান কিভাবে অভ্যাস করা হয়?

ম—ধ্যানের প্রকৃত অর্থ আত্মনিষ্ঠা। কিন্তু যখন মনে চিন্তা ওঠে তখন সেগুলো দূর করার জন্য একটা চেষ্টা করা হয়; এই চেষ্টাকেই ধ্যান বলে। আত্মনিষ্ঠা তোমার প্রকৃত স্বরূপ। তুমি যা তাই হয়ে থাকো। এটাই লক্ষ্য।

ভ—কিন্তু চিন্তা ওঠে। আমাদের চেষ্টা কি কেবল চিন্তা দূর করা?

ম—হাঁ। একটা চিন্তার ওপর ধ্যান হওয়ায় অন্য চিন্তাগুলো দূরে স'রে থাকে। যেহেতু অন্য চিন্তাগুলো দূরে রাখা হয় সেজন্য ধ্যান নিষেধাত্মক।

ভ—বলা হয় 'আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা' (মনকে আত্মায় স্থির করে)। কিন্তু আত্মা অচিন্তনীয়।

ম—তুমি আদৌ ধ্যান করতে চাও কেন? যেহেতু তুমি চাও সেজন্য তোমাকে 'আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা' বলা হয়; তুমি ধ্যান না ক'রে যা আছ তাই হয়ে থাকো না কেন? সেই 'মনঃ'টা কি? যখন সব চিন্তা পরিত্যক্ত হয়, এটা আত্মসংস্থমে (আত্মস্থিতিতে) পরিণত হয়।

ভ—যদি একটা মূর্তি দেওয়া হয় আমি তার ওপর ধ্যান করতে পারি আর অন্য চিন্তাও চলে যায়। কিন্তু আত্মা নিরাকার।

ম—কোন আকার বা বস্তুর ওপর চিন্তা করাকে ধ্যান বলে; অন্যপক্ষে আত্মার অনুসন্ধানকে বিচার বা নিদিধ্যাসন বলে।

অধ্যারোপাপবাদভ্যাম্ (আরোপ ও তার নিরসন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীভগবান দেখালেন যে প্রথমটা তোমাকে আত্মার দিকে অন্তর্মুখীন করে; তারপর দ্বিতীয়ের দ্বারা তুমি জানো যে জগৎ আত্মার অতিরিক্ত নয়।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯৫। শ্রীনটবর লাল পারেখ একজন গুজরাটী ভদ্রলোক; ইনি বরোদা রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন; এখানে দর্শনের জন্য এসেছেন। ইনি উৎসাহী, বুদ্ধিমান যুবক ও তাঁর অর্জিত সম্মান বিষয়ে বেশ সচেতন। ইনি কয়েকটি প্রশ্ন সমন্বিত একটি কাগজ শ্রীভগবানকে দিলেন।

ভ—আমাকে আত্মা—পরমাত্মা—সৎ-চিদানন্দ অনুভব করতে সাহায্য করুন।

ম—আত্মা—পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দের অভিপ্রায় এক অর্থাৎ আত্মা। আত্মা নিত্য-অনুভূত। তা না হলে তাতে কোন সুখ নেই। যদি নিত্য না হয় তবে তার আরম্ভ আছে; যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে; সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। একটা ক্ষণস্থায়ী বস্তু খোঁজার কোন অর্থ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এটা একটা চেষ্টাশূন্য সদাজাগ্রত শান্তি। নিশ্চেষ্টতা অথচ আনন্দ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা—সেটাই উপলব্ধি।

ভ—আমি বুদ্ধিগত উত্তর চাই না। আমি চাই সেটা বাস্তব হোক।

ম—হ্যাঁ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য কোন বৌদ্ধিক আলোচনার দরকার নেই। যেহেতু আত্মা সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সেজন্য আলোচনার প্রয়োজন মোটেই নেই। সবাই বলে 'আমি আছি'। এছাড়া উপলব্ধির আর বেশী কি আছে?

ভ—এটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

ম—তুমি আছ। তুমি বল 'আমি আছি'। তার অর্থ অস্তিত্ব।

ভ—কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নই অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

ম—ও। তাহলে এখন কে কথা বলছে?

ভ—নিঃসন্দেহে আমিই। কিন্তু আমি আছি কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ নই। অধিকন্তু আমার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ম—এমন কি অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্যও একজনকে থাকতে হবে। তুমি যদি না থাকো, কোন প্রশ্নকারীও নেই আর কোন প্রশ্নও উঠতে পারে না।

ভ—আচ্ছা, মেনে নিলাম যে আমি আছি।

ম—কি করে জানলে যে তুমি আছ?

ভ—কারণ আমি ভাবছি, অনুভব করছি, দেখছি ইত্যাদি।

ম—তার অর্থ এদের থেকে তোমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু সুষুপ্তিতে চিন্তা, অনুভব করা ইত্যাদি নেই তবুও সেখানে অস্তিত্ব আছে।

ভ—কিন্তু না। আমি একথা বলতে পারি না যে আমি সুষুপ্তিতে ছিলাম।

ম—তুমি কি সুষুপ্তির সময়ে তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর?

ভ—ঘুমে আমি থাকতেও পারি, নাও থাকতে পারি। ঈশ্বর জানেন।

ম—যখন তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠ, তুমি ঘুমিয়ে পড়ার আগে কি করেছিলে তা স্মরণ করতে পারো।

ভ—আমি ঘুমের আগে ও পরে ছিলাম বলতে পারি, কিন্তু ঘুমের সময় ছিলাম কিনা বলতে পারি না।

ম—তুমি ঘুমিয়ে ছিলে বল কি না?

ভ—হাঁ।

ম—যদি তুমি স্মরণ না কর তবে বল কি করে?

ভ—তার অর্থ এই নয় যে আমি ঘুমেতেও ছিলাম। এরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত হয় না।

ম—তুমি কি বলতে চাও যে প্রত্যেকবার মানুষ যখন ঘুমায় তখন মরে যায় আবার জেগে ওঠার আগে বেঁচে ওঠে ?

ভ—হতে পারে। ঈশ্বরই জানেন।

ম—তবে ঈশ্বর এসে এই সব সমস্যার সমাধান করুন। যদি ঘুমালে লোকে ম'রে যেত তবে সবাই যেমন মরতে ভয় পায় তেমনি ঘুমাতেও ভয় পেত। অপরপক্ষে সবাই ঘুমের কামনা করে। যদি ঘুমে সুখ না থাকবে তবে ঘুমের কামনা হবে কেন ?

ভ—ঘুমে কোন নিশ্চিত সুখ নেই। শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘুমের কামনা করা হয়।

ম—বেশ, এটা ঠিক। 'ক্লান্তি দূর করার জন্য'। তবে একজন কেউ আছে যে ক্লান্তিহীন হয়েছে।

ভ—হাঁ।

ম—সুতরাং তুমি ঘুমে থাকো আর এক্ষণেও আছ। তুমি ঘুমে না চিন্তা ক'রে, না অনুভব ইত্যাদি ক'রে সুখে ছিলে। সেই একজনই এখন রয়েছে তবে তুমি সুখী নও কেন ?

ভ—সুখ আছে কি করে বলা যাবে ?

ম—সবাই বলে 'সুখমহমস্বাপ্সম্' (আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম কিংবা সুখময় নিদ্রায় ছিলাম)।

ভ—আমার মনে হয় না, এটা ঠিক। কোন সুখ নেই কেবল দুঃখের অভাব।

ম—তোমার অস্তিত্বই আনন্দময়। সেজন্যই সবাই বলে সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম। তার অর্থ একজন নিদ্রার সময়ে তার মৌলিক নির্বিশেষ অবস্থায় থাকে। আর দুঃখ সম্বন্ধে, সেখানে কোন দুঃখ নেই। দুঃখ কোথায় যে তুমি দুঃখের অভাব বলবে ? বর্তমানে আত্মাকে শরীরের সঙ্গে ভুল নির্ধারণের জন্যই এই সব ভ্রমের উৎপাত হয়েছে।

ভ—আমি যা চাই তা হল উপলব্ধি। আমি আমার অন্তর্নিহিত আনন্দ-স্বরূপকে অনুভব করি না।

ম—কারণ এখন আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়। অনাত্মাও আত্মার অতিরিক্ত নয়। যা হোক একটা ভুল নির্ধারণ আছে যে শরীর পৃথক আর আত্মাকে শরীর-রূপে নিরূপণ করা হয়েছে। আনন্দের প্রকাশের জন্য এই ভুল নির্ধারণ নষ্ট করতে হবে।

ভ—আমি নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম।

এঞ্জিনীয়ার গুরুর নিকট সমর্পণের পরামর্শ দিলেন।

ভ—স্বীকৃত!

ম—তোমার স্বরূপ সুখময়। তুমি বলছ, তা বোধগম্য হয় না। তোমার প্রকৃত সত্তা হওয়াকে কি বাধা দিচ্ছে, দেখো। তোমাকে দেখানো হয়েছে যে বাধাটা একটা ভুল নির্ধারণ। ভুলটা দূর কর। রোগমুক্ত হওয়ার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ওষুধ রোগীকেই খেতে হবে।

ভ—রোগী নিজের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ আর সে বিনাশর্তে চিকিৎসকের কাছে আত্ম-সমর্পণ করছে।

ম—চিকিৎসককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে আর রোগীকেও কিছু না বলে একেবারে চুপ করে থাকতে হবে। এরূপে শান্ত হয়ে থাকো। সেটাই চেষ্টাশূন্যতা।

ভ—সেটাই সব থেকে কার্যকরী ওষুধ।

আরও যে সকল প্রশ্ন তিনি লিখেছিলেন—

ভ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে আমায় নিঃসন্দেহ করুন।

ম—আত্মোপলব্ধিই এরূপ বিশ্বাস আনে।

ভ—প্রারব্ধের সঙ্গে পুরুষকারের কি সম্বন্ধ?

ম—প্রারব্ধও একটা কর্ম। তার জন্য একজন কর্তা চাই। দেখ, কে কর্তা। পুরুষকারের অর্থ চেষ্টা। দেখ, কে চেষ্টা করে। এখানেই এদের সমন্বয়। যে এদের সমন্বয় খুঁজছে সেই এদের যোগসূত্র।

ভ—কর্ম ও পুনর্জন্ম কি?

ম—কর্তাকে দেখ তাহলে কর্ম কি স্পষ্ট হবে। তুমি যদি জন্মে থাকো তবেই পুনর্জন্ম হবে। তুমি জন্মেছ কি না, দেখ।

ভ—আমায় জ্যোতির্দর্শন করতে সাহায্য করুন।

ম—দর্শন একজন দ্রষ্টার ঈঙ্গিত করে। তাকে খোঁজো আর দর্শনও তারই অন্তর্গত।

২৯৬। পূবন একজন মেষপালক, সে বলে, সে শ্রীভগবানকে তিরিশ বছর আগে সেই বিরূপাক্ষ গুহাবাসের সময় থেকে জানে। সেই সময়ে দর্শনার্থীদের জন্য সে দুধের জোগান দিত।

প্রায় তিরিশ বছর আগে একবার তার একটা ভেড়ী হারিয়ে যায়; সে তাকে তিনদিন খুঁজেছিল। ভেড়ীটা গর্ভবতী ছিল, বুনো জন্তুরা তাকে শেষ করেছে ভেবে সে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল; শ্রীভগবান তাকে দেখে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে সে একটি হারানো ভেড়ী খুঁজছে। শ্রীভগবান যথারীতি মৌন রইলেন। তারপর তিনি তাকে একটা পাথর তুলে দিয়ে সাহায্য করতে বললে, সে মহাখুশি হয়ে সেটা করলে। কাজ শেষ হলে শ্রীভগবান তাকে "ঐদিকে যাও" বলে সহরের দিকে একটা পায়ে চলা পথ দেখিয়ে দিলেন। "তুমি পথে হারানো ভেড়ীটা পাবে।" সে সেই পথে গিয়ে দু'টি বাচ্চা সমেত ভেড়ীটিকে পেয়েছিল।

সে এখন বলে, "এ ভগবানের কথা আর কি বলব! কথার কি শক্তি! কি মহান্! আমার মত একজন গরীবকেও ভোলেন না। আমার ছেলে মানিক্কম্‌কেও কৃপা ক'রে মনে রেখেছেন। মহাত্মারা এই রকম! আমি তাঁর জন্য সামান্য কাজ, যেমন আশ্রমের গরুদের পালে নিয়ে যাওয়াটুকু, করতে পারলেও খুশি হই।"

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯৭। শ্রীকোহেন জিজ্ঞাসা করলেন—জাগ্রত অবস্থায় মনের দ্বারা ধ্যান হয়। স্বপ্নেও মন থাকে। তবে স্বপ্নে ধ্যান হয় না কেন? কিংবা হওয়া সম্ভব নয় কেন?

ম—স্বপ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করো।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শ্রীভগবান বলতে লাগলেন—তোমাকে বলা হয়েছে এখন ধ্যান কর ও তুমি কে খোঁজো। তা না করে তুমি জিজ্ঞাসা করছ, "স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে কেন ধ্যান হয় না?" তুমি যদি জাগ্রত অবস্থাটা কার বুঝতে পারো তাহলে বুঝবে যে তারই স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তুমি জাগ্রতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সাক্ষী—বরং তারাই তোমার সামনে এসে চলে যায়। যেহেতু তুমি এখন ধ্যানস্থ নও সেজন্য এই সব প্রশ্ন উঠছে। ধ্যানে লেগে থাকো আর দেখো এ সব প্রশ্ন ওঠে কি না।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯৮। কোন একজন দর্শনার্থী এই বলে প্রশ্ন করলে যে অনুসন্ধানের থেকে ধ্যান সরল পথ কারণ ধ্যান সত্যকে ধরে থাকে অপর পক্ষে অনুসন্ধানে সত্যকে মিথ্যা থেকে বাছাই করা হয়।

ম—প্রবর্তকের পক্ষে কোন মূর্তির ওপর ধ্যান করা সহজ ও আনন্দ-দায়ক। এর অভ্যাস আত্মবিচারের দিকে চালিত করে; তাতে সত্যকে অসত্য হতে পৃথক করা হয়।

যখন তুমি বিভিন্ন বিরুদ্ধভাবে পূর্ণ তখন সত্যকে ধরে কি লাভ?

যা তোমায় মনে করাচ্ছে যে আত্মা ইতোমধ্যে অনুভূত নয়,

আত্মবিচার সেই বাধাগুলো দূর ক'রে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির পথে নিয়ে যায়।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

২৯৯। শ্রীটি. কে. এস. আইয়ার শ্রীভগবানকে বাক্যের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে।

প্রচলিত মতানুসারে পরা (বাক্) মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্ত মূলাধার থেকে ওঠে। বৈখরী (চিন্তাবৃত্তি) অবধি সকল প্রকার বাক্ পরার অন্তর্গত, এটা আবার কুণ্ডলিনী থেকে ওঠে; আর কুণ্ডলিনী হৃদয় থেকে পৃথক নয়। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত ষড়াধার (ষট্‌চক্র) হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সুষুম্না ও তার উৎস কুণ্ডলিনী হৃদয়েরই অন্তর্গত।

একজন দর্শনার্থী 'অন্তরেণ তালুকে সেন্দ্রযোনিঃ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে।

ম—ইন্দ্রযোনি সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গে পরারই অন্তর্ভুক্ত (লীনা)।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৩০০। একজন বিজ্ঞানের স্নাতক ব্রহ্মচারী যুবক গত চার পাঁচ মাস এখানে কৃপার আশায় অপেক্ষা করছে, তার আশা যে গাছের পাকা ফলের মত একটা চাকরী তার কাছে পড়বে। সে চাকরীর জন্য চেষ্টা করছে না। গতকাল তার ভাই তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করলে। শ্রীভগবানের কাছে আবেদন করা হল।

শ্রীভগবান বললেন, "আমি কাউকে আসতে বলি না বা যেতেও বলি না। যার যা ইচ্ছা করে। সে বলছে যে হলঘরে সে শান্তি পায় আর সে একটা চাকরীও চায়। স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে হলঘরেই তার একটা চাকরী হওয়া উচিত, যাতে তার শান্তি নষ্ট না হয়। শান্তি হলঘরে নেই। আত্মার বিশ্রামেই শান্তি। এটা যে-কোন জায়গায় পাওয়া যায়।"

কয়েকদিন পরে ছেলেটি উপবীত ফেলে দিয়ে, হাত পা কাঁপাতে কাঁপাতে শ্রীভগবানের সামনে এল, আর এটা সে আনন্দ বলে বর্ণনা করলে। শ্রীভগবান তাকে তাঁর সামনে হলে বসার অভ্যাস ত্যাগ করতে ও হল থেকে চলে যেতে বললেন। আরও বললেন, "পাখী তার ছানাদের ডানা না ওঠা অবধি রক্ষা করে। চিরকাল করে না। ভক্তদের পক্ষেও তাই। আমি পথ দেখিয়েছি। এখন তোমার সেটা অনুসরণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত আর যেখানেই থাকো শান্তি পাওয়া উচিত।"

যুবকটি মনে করে যে শ্রীভগবান তাকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন, "নিজেই নিজেকে (অর্থাৎ অহংকারকে) দমন করবে।"

যা হোক ছেলেটি স্থানীয় স্কুলে একটা চাকরীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে আর ভাবে যে পাহাড় কিংবা শ্রীভগবান তাকে একটা বিরাট চাকরী দিয়েছেন। সে বলে, "সেটা কি চাকরী পরে বিশ্ব-শুদ্ধ সবাই জানতে পারবে।" যা যা ঘটল সে কয়েক মাস আগেই সব অনুমান করেছিল আর তার মা ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। যা হল তাতে সে আরও খুশি হল।

শ্রীভগবান তাকে আর একজন লোকের সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে সে কোন মতেই উপযুক্ত অধিকারী নয়। তবুও ছেলেটি মনে করে যে সে একটি 'ক্ষুদে ভগবান।' পরে সে পাগল হয়ে যায় ও মারা যায়।

৩০১। একজন ভদ্রলোক শ্রীভগবানের উপদেশ অনুসরণ করার পর তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা আগ্রহ সহকারে বললে আর এও যোগ করলে যে শ্রীভগবান ও তার সপ্তাহের একই দিনে জন্ম হয়েছে আর তাঁদের দু'জনের নামও এক···।

শ্রীভগবান কথাটা শেষ করে দিলেন, "দু'জনের একই আত্মা।"

৩০২। (ত্রিচির জনৈক যুবক শ্রীভগবানকে 'উপদেশ মঞ্জরী'তে উপযুক্ত শিষ্যের যোগ্যতা সম্বন্ধে 'অত্যন্ত বৈরাগ্যে'র উল্লেখ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে। সে বলতে লাগল, "বৈরাগ্য কি? সংসারের বিষয়ে অনাসক্তি আর মুক্তির ইচ্ছা। তাই নয় কি?"

ম—কার এটা নেই?

সবাই আনন্দ চায় কিন্তু দুঃখ মিশ্রিত সুখকে আনন্দ ভেবে ভুল করে। এরূপ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। তার ভ্রমাত্মক কাজ তাকে ক্ষণিক সুখ দেয়। সংসারে সুখ ও দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে যায়। দুঃখজনক ও সুখজনক বিষয়কে পৃথক ক'রে কেবল আনন্দজনক বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাই বৈরাগ্য। কি এমন আছে যা পরিণামে দুঃখদায়ক হবে না? সে সেটা খোঁজে আর তাতে লেগে থাকে। তা না হলে মানুষের এক পা সংসারে আর অন্য পা আধ্যাত্মিক সাধনায় থাকে (তাতে কোন একটাতেও সাফল্য লাভ হয় না)।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আবার একটা প্রশ্ন হল।

ম—যেহেতু মানুষ নিজেকে সাহায্য করতে পারে না, সে নিজেকে দুর্বল জেনে গুরু-রূপের মধ্যে আরও শক্তি খোঁজে।

৩০৩। শ্রীকে. আর. ভি. আইয়ার নাদ সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা চাইলেন।

ম—যে এর ওপর ধ্যান করে সে একে অনুভব করে। দশ

প্রকার নাদ আছে। শেষে বজ্রধ্বনি শোনার পর মানুষ লয় লাভ করে। সেটাই তার স্বরূপ ও শাশ্বত অবস্থা। নাদ, জ্যোতি বা অনুসন্ধান এরূপে একই জায়গায় নিয়ে যায় (আগেরগুলো পরোক্ষ আর শেষেরটি প্রত্যক্ষ।

ভ—মন কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয় আবার জেগে ওঠে। কি করণীয় ?

ম—পুনঃ পুনঃ অনুভব করা শান্তিকে অন্য সময়ে স্মরণ করতে হবে। শান্তি তোমার স্বরূপ ও নিত্য অবস্থা। অবিরাম অভ্যাসে এটা স্বাভাবিক হবে। একেই 'স্রোত' বলে। এটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

নাদ, জ্যোতির্দর্শন ইত্যাদির অর্থ ত্রিপুটির (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান) অবস্থিতি। আত্মানুসন্ধানের দ্বারা উৎপন্ন 'স্রোত' শুদ্ধ ত্রিপুটি অর্থাৎ নির্বিশেষ ত্রিপুটি।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৩০৪। একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী মহিলা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে একটি দর্শনের বর্ণনা করলে। যখন সে চোখ খুলে ভগবানের সামনে বসেছিল সে দেখলে যে শ্রীভগবানের মুখটি দিব্য শিশুর মত হয়ে গেল আর সেটি যেন ফুল দিয়ে চমৎকার ভাবে সাজানো। তার মনে এই শিশুর প্রতি একটা স্নেহ জাগল।

ম—এ দর্শনটা তোমার মনে। তোমার স্নেহই এর কারণ। পল ব্রাণ্টন আমায় বিরাট পুরুষ রূপে দেখেছিল; তুমি আমায় শিশু-ভাবে দেখেছ। দু'টিই অলৌকিক দর্শন।

সেই মহিলা বললে—পল ব্রাণ্টন আমাকে এখানে কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি অস্বীকার করেছিলাম। এখন এটা হল।

ম—এই দর্শনে প্রতারিত হয়ো না।

ভ—যদি কেউ অনেক মাইল দূরে ইউরোপে থাকে ও আপনার সাহায্য প্রার্থনা····।

ম—ইউরোপ কোথায়? এটা তোমার মধ্যে।

ভ—আমি এখানে এসেছি। মহর্ষিও ওখানে চলুন।

(এই বলে সে নীচু গলায় হাসলে। কিছুক্ষণ নীরবতা।)

ম—তুমি স্থূল শরীরটা দেখছ তাই তার সীমিতভাবও দেখছ। স্থান ও কাল এই স্তরে কাজ করে। যতক্ষণ তুমি স্থূল শরীরটা দেখবে ততক্ষণ বিভিন্ন শরীরের পার্থক্য থাকবে। অপরপক্ষে প্রকৃত মহর্ষির জ্ঞান হলে সব সংশয় মিটে যাবে।

তুমি কি এখন ভারতে? কিংবা ভারত তোমাতে রয়েছে? এমনকি তুমি যে ভারতে এ ধারণাও চলে যেতে হবে। ভারতই তোমাতে। প্রমাণ করার জন্য ঘুমটা দেখো। তোমার সুষুপ্তিতে কি তুমি ইউরোপে আছ না ভারতে আছ জানতে? তা সত্ত্বেও তুমি এখন যেরূপ আছ তখনও সেরূপ ছিলে।

স্থান তোমার মধ্যে। স্থূল শরীরটা স্থানে আছে কিন্তু তুমি নও।

পল ব্রাণ্টন চোখ বন্ধ ক'রে দেখেছিল, অপরপক্ষে তুমি বলছ তোমার চোখ খোলা ছিল।

ভ—হাঁ। কিন্তু আমার কখনও এরূপ দর্শন হয়নি, অন্যপক্ষে তিনি সংবেদনশীল (সাইকিক্) ব্যক্তি।

কয়েক মিনিট পরে সে জিজ্ঞাসা করলে যে এরূপ দর্শনে কিছু লাভ বা ক্ষতি আছে কি না।

ম—এতে লাভ হয়।

শ্রীভগবান বলে চললেন—হয়ত তুমি কোন শিশুর কথা ভাবছিলে আর সে তোমার দর্শনে আবির্ভূত হয়েছে।

ভ—হ্যাঁ, কেবল শিবের কথা—তাঁর শিশু-সুলভ মুখের··।

ম—তাই।

ভ—কিন্তু শিব সংহারকারী···(অর্থাৎ শিশু নন)।

ম—হ্যাঁ—দুঃখের।

আরও কিছুক্ষণ পরে ভগবান বললেন—তুমি একটু পরে ঘুমাতে যাবে। সকালে উঠে বলবে "আমি বেশ সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম।" ঘুমে যা হয় সেটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। সেটা এমন কি এখনও রয়েছে ; তা না হলে সেটা তোমার প্রকৃত স্বরূপ হয় না। সেই ঘুমের অবস্থা এখন লাভ কর ; এটাই শিব।

আমাদের কি কোন আকার আছে ? শিবের রূপ ভাবার আগে এটা খোঁজো। ঘুমে কি তুমি ছিলে না? তখন কি কোন আকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলে ? ঘুমে কি তোমার কোন আকার ছিল ? তা সত্ত্বেও তুমি ছিলে। যে 'আমি' ঘুমে ছিল, সে এক্ষণেও এখানে বর্তমান রয়েছে। তোমার ঘুমের অভিজ্ঞতানুসারে তুমি শরীর নও। তুমি এখনও তাই—অর্থাৎ শরীর ছাড়া। ঘুমে শরীর বোধ রহিত অবস্থাতেও তুমি আনন্দে ছিলে। তুমি এক্ষণেও তাই। যা সব সময়ে থাকে সেটাই একমাত্র প্রকৃত স্বরূপ। ঘুমে কোন শরীর ছিল না, কেবল একটা আনন্দের অনুভূতি ছিল। সেটা এখনও আছে। আত্মা শরীর রহিত। এরূপে তুমি যদি শরীর রহিত হও তবে শিবের কি করে শরীর হয় ? তুমি যদি শরীর-যুক্তা হও তবে শিবও শরীরবান্। তুমি যদি তা না হও, সেও নয়।

ভ—তবে সে শিব হয় কি করে ?

ম—শিবের অর্থ আনন্দঘন সত্তা—মঙ্গলময় সত্তা।

সে খুব খুশি হল। কিছুক্ষণ পরে চলে গেল।

৩০৫। দর্শনার্থীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, তার মধ্যে একজন বললে—"যদিও আমরা আমাদের প্রচলিত উপদেশগুলোর সঙ্গে পরিচিত তা সত্ত্বেও এই উপদেশগুলো (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) অনুসরণ

করতে পারি না। আমাদের বিচার-ধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হয়ে বিদেশীরা কি করে এত সহজে শ্রীভগবানের কথা বুঝতে পারে?"

মনে হয় প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও তাদের বোঝার চেষ্টার জন্য শ্রীভগবান তাদের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন আর তাদের বোঝবার উপযুক্ত সাধনার অভাবের জন্য তিনি তাদের প্রতি করুণাও করেন।

অবশেষে শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—দর্শন না হওয়ার থেকে দর্শন হওয়া ভাল। তাতে আগ্রহ বাড়ে। তারা (বিদেশীরা) অপরের ধারণা সহজে নেয় না; কিন্তু একবার নিলে ধরে থাকে। এটাই তাদের বিশেষত্ব।

পরে শ্রীভগবান শিবপ্রকাশ পিল্লাই-এর দর্শন সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বললেন, "দর্শনগুলো বাইরে নয়। তারা কেবল অন্তরে আবির্ভূত হয়। যদি বাইরে হত তবে দর্শক ছাড়াও থাকত। তা হ'লে এদের থাকার প্রমাণ কি? কেবল দর্শক নিজেই।

৩০৬। ভ—ধ্যান করার জন্য একটা বস্তু দরকার। 'আমি'র ওপর কি করে ধ্যান হয়?

ম—আমরা আকারের ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গেছি তাই আমাদের ধ্যানের জন্য একটা বাস্তব আকারের দরকার হয়। যাকে ধ্যান করি শেষে তাই থাকবে। ধ্যান করলে অন্য চিন্তাগুলো চলে যায়। যতক্ষণ অন্য চিন্তা আছে ততক্ষণ ধ্যান করা দরকার। তুমি কোথায় রয়েছ? তোমার অস্তিত্ব আছে বলেই ধ্যান কর। ধ্যান করার জন্য একজন থাকলে তবেই সে ধ্যান করে। সে যেখানে রয়েছে ধ্যানও সেখানে হয়। ধ্যান অন্য চিন্তাগুলো দূর করে। তুমি নিজেকে উৎসে মিলিয়ে দাও। সময় সময় আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে উৎসে মিলিয়ে যাই, যেমন ঘুম, মৃত্যু, মূর্ছা ইত্যাদিতে। ধ্যানটা কি? সচেতনভাবে উৎসে মিলিয়ে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে

মৃত্যু, মূর্ছা ইত্যাদির ভয় চলে যাবে কারণ তুমি সজ্ঞানে উৎসে মিলিয়ে যেতে পারবে।

মৃত্যুকে কিসের ভয়? মৃত্যুর অর্থ অস্তিত্বহীনতা হতে পারে না। তুমি ঘুম ভালবাসো কিন্তু মৃত্যুকে নয় কেন? তুমি কি এখন চিন্তা করছ না? তুমি কি এখন নেই? তুমি কি সুষুপ্তিতে ছিলে না? এমন কি একটি ছোট ছেলেও বলে সে বেশ সুখে ঘুমিয়েছিল। অজ্ঞানে হলেও সেও ঘুমে তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সুতরাং চেতনা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আমরা অচেতন হয়ে থাকতে পারি না। যদিও আমরা বলি যে আমরা ঘুমে অচেতন ছিলাম সেটা কিন্তু একটা বিশিষ্ট চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়। জগৎ, শরীর ইত্যাদি ধারণা আমাদের এতই বদ্ধমূল যে এই আপেক্ষিক চেতনাকেই আমরা আত্মা বলে ধরেনি। কেউ কি ঘুমের সময়ে বলে যে সে অচেতন? সে এখন বলে। এটা একটা আপেক্ষিক চেতনার অবস্থা। অতএব সে নিরপেক্ষ চেতনার কথা না ব'লে আপেক্ষিক চেতনার কথা বলছে। প্রকৃত চৈতন্য অচেতনা ও আপেক্ষিক চেতনার অতীত।

আবার 'তিরুবাচকমের' কথায় ফিরে এসে শ্রীভগবান বললেন, "চারজন প্রধান মহাত্মাই প্রথম কবিতায় তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। (১) অভেদ উপাসনা। (২) অখণ্ড স্মরণ। (৩) অনুদিত চিন্তা। (৪) অহংকারের অস্তিত্বহীনতা, আত্মার বিদ্যমানতা। এ সবগুলোরই অর্থ এক।"

ভ—কিন্তু এ সত্য উপলব্ধি হয় না।

ম—সময়ে উপলব্ধি হবে। ততক্ষণ ভক্তি আছে—"ক্ষণমাত্রও তুমি আমার মনকে ত্যাগ করো না।" তিনি কি তোমায় কখনও ত্যাগ করে যান? তুমিই তোমার মনকে ঘুরে বেড়াতে দাও। তিনি তো অটল হয়েই রয়েছেন। যখন তোমার মন একাগ্র হয়, তুমি বল, "ক্ষণমাত্রও তিনি আমার মনকে ত্যাগ করেন না।" কি হাস্যকর!

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৩০৭। মহীশূরের শ্রীসামান্না শ্রীভগবানকে বললেন—কৃপা ক'রে 'অহম্ স্ফুরণ' ('আমি'—'আমি' প্রকাশ) কি বুঝিয়ে দিন ?

ম—সুষুপ্তিতে 'আমি' বোধ থাকে না। জাগ্রতে সাধারণতঃ শরীর, জগৎ আর অনাত্ম বস্তুর সংযোগে 'আমি' অনুভব হয়। এই সম্বন্ধ বিশিষ্ট আমি 'অহম্ বৃত্তি'। যখন এই 'অহম্' কেবলমাত্র আত্মাকে বোঝায় তখন সেটাই 'অহম্ স্ফুরণ'। এটা জ্ঞানীদের স্বাভাবিক আর একেই জ্ঞানীরা জ্ঞান ও ভক্তরা ভক্তি বলে। যদিও এটা নিত্যবর্তমান, এমন কি সুষুপ্তিতেও থাকে, তবু এটা অনুভূত হয় না। সুষুপ্তিতেও সহসা এটা অনুভূত হয় না। এটা তিনটি অবস্থার আধার ও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হওয়ায় একে প্রথমে জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করতে হবে। কেবল জাগ্রত অবস্থায় চেষ্টা করে এইক্ষণেই আত্মোপলব্ধি করতে হবে। পরে এটাই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড 'আত্মা' বলে বোঝা যাবে ও উপলব্ধি হবে। সেজন্য এটা 'অখণ্ডাকারা' বৃত্তি। আর কোন উপযুক্ত শব্দের অভাবে একে বৃত্তিই বলা হয়। যদিও এটা ঠিক আক্ষরিক অর্থে বৃত্তি নয়। সে ক্ষেত্রে বৃত্তিটা 'সমুদ্রাকারা নদী'র মত হয়, যা একেবারে অসম্ভব। বৃত্তি ক্ষণিক, বিশেষত্ব-যুক্ত, অভিক্ষিপ্ত চেতনা বা চিন্তা, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির দ্বারা অনুভূত অখণ্ড চেতনার খণ্ডিত অবস্থা। বৃত্তি মনের ক্রিয়া, অপর পক্ষে অখণ্ড চেতনা মনের অতীত। এটা জ্ঞানী বা জীবন্মুক্তের মৌলিক সহজ অবস্থা। একটা অখণ্ড অনুভূতি। আপেক্ষিক চেতনা অবদমিত হলে এর প্রকাশ হয়। অহম্ বৃত্তি ('আমি'-চিন্তা) অবচ্ছিন্ন (খণ্ডিত), অহম্ স্ফুরণ ('আমি'—'আমি' প্রকাশ) অখণ্ডিত ও নিরবচ্ছিন্ন। চিন্তা থেমে গেলেই বোধের প্রকাশ হয়।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৩০৮। অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল।

শ্রীভগবান বললেন—অনাত্মাই অস্পৃশ্য। সামাজিক অস্পৃশ্যতা মানুষের তৈরী, অপরপক্ষে অন্য অস্পৃশ্যতা স্বাভাবিক ও দেবকৃত।

ভ—অস্পৃশ্যদের কি আমাদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া উচিত?

ম—মতামত দেওয়ার জন্য অন্যেরা আছে।

বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল।

ম—আগে আমাদের নিজেদের অবতারত্ব সম্বন্ধে জানি; অন্য অবতারের কথা পরে আসবে।

আবার ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন হল।

ম—ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার অনুরূপ। কে তাঁর ধারণা করে সেটা আগে জানা যাক। ধারণাটা যে করে তার অনুযায়ী। তুমি কে আগে খোঁজো। অন্য সমস্যাগুলোর আপনা হতে সমাধান হবে।

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩০৯। ভ—'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম) ও 'ব্রহ্মৈবাহং' (ব্রহ্মই আমি)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

ম—প্রথমটি প্রত্যক্ষবৃত্তি (প্রত্যক্ষ অনুভূতি), অপরপক্ষে পরেরটি পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ অনুভূতি) জ্ঞান। প্রথমটির জ্ঞান অহমের ('আমি') উপলব্ধি থেকে শুরু হয়, অন্যপক্ষে পরেরটা পরোক্ষ (শোনা কথা) ব্রহ্ম থেকে শুরু হয়; যদি এর উপলব্ধি হয় তবে সেটা আত্মা ছাড়া পৃথক হতে পারে না।

৩১০। শ্রীগ্রীনলেস—অক্টোবর মাসে আশ্রম থেকে যাওয়ার পর ভগবানের শান্তি যে আমায় ঘিরে রয়েছে এ সম্বন্ধে আমি দশদিন সচেতন ছিলাম। কাজে ব্যস্ত থাকলেও সেই একত্বের শান্তির অন্তঃপ্রবাহ ছিল; অনেকটা নীরস বক্তৃতা শোনার সময় অর্ধঘুমন্ত অবস্থার মত দু'টি চেতনা। তারপর সেটা একেবারে চলে গেল আর তার পরিবর্তে পূর্বেকার মূঢ়তা ফিরে এল।

(কাজের জন্য পৃথক ধ্যান করার সময় পাওয়া যায় না। কাজের মধ্যে সর্বদা 'আমি আছি' মনে রাখলে আর অনুভব করার চেষ্টা করলেই কি যথেষ্ট হবে?

ম— মনের শক্তি বাড়লে এটা স্থায়ী হবে। ক্রমাগত অভ্যাসে মনের শক্তি বাড়ে আর সেই মনই এই স্রোতকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সে সময়ে কর্মপর বা কর্ম-বিরত যে অবস্থাই হোক না কেন স্রোত নির্বিকার ও নিরবচ্ছিন্ন হয়।

ভ—পৃথক ধ্যানের কি প্রয়োজন নেই?

ম—বর্তমানেও ধ্যান তোমার প্রকৃত স্বরূপ। তুমি ধ্যান বল কারণ এখন অন্য চিন্তাগুলো তোমায় বিচলিত করছে। যখন এই চিন্তাগুলো দূরীভূত হয় তখন তুমি একাই অর্থাৎ চিন্তাশূন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকো; আর সেটাই তোমার স্বরূপ যাকে তুমি অন্য চিন্তা-সমূহ দূর করে পাওয়ার চেষ্টা করছ। এরূপ অন্য চিন্তাগুলো দূরে রাখাকেই এখন ধ্যান বলা হয়। যখন অভ্যাস দৃঢ় হয় প্রকৃত স্বরূপ যথার্থ ধ্যান রূপে নিজেকে প্রকাশ করে।

তুমি ধ্যানের চেষ্টা করলে অন্য চিন্তাগুলো আরও প্রবল বেগে ওঠে।

তৎক্ষণাৎ সমবেত কণ্ঠে আরও অনেকেই প্রশ্ন করে উঠল।

শ্রীমহর্ষি বলে চললেন—হাঁ। ধ্যানে সবরকম চিন্তাই ওঠে। এটা হওয়াই ঠিক। যা তোমার ভিতরে সুপ্ত আছে তা ওপরে ওঠে। না উঠলে কি করে নষ্ট হবে? অতএব তা স্বতঃই

ওপরে উঠে আসে ও যথা সময়ে বিনষ্ট হয় যার ফলে মন শক্তিশালী হয়।)

একজন দর্শনার্থী—সবই ব্রহ্ম বলা হয়।

ম—হাঁ। তারা তাই। কিন্তু যতক্ষণ তুমি তাদের পৃথক মনে কর ততক্ষণ তাদের দূরে রাখা উচিত। অন্যপক্ষে তারা যদি আত্মা হয় তবে আর 'সব' বলার কি দরকার? কারণ যা আছে সব-কিছুই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই।

ভ—ঋভু গীতায় অনেক বস্তুকে অসৎ ব'লে শেষে যোগ করা হয়েছে যে সবই ব্রহ্ম, সেজন্য তারাও সত্য।

ম—হাঁ। যখন তুমি অনেক দেখ তখন তারা অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। অন্যপক্ষে যখন তাদের ব্রহ্ম বলে দেখ তখন তারা সত্য, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান থেকেই তাদের সত্যতা উপচিত হয়।

ভ—তাহলে 'উপদেশসার'-এ শরীর ইত্যাদিকে জড় অর্থাৎ অচেতন বলা হয়েছে কেন?

ম—যেহেতু তুমি একে আত্মার অতিরিক্ত পৃথক শরীর ইত্যাদি বল সেজন্য। কিন্তু যখন আত্মাকে পাওয়া যায় তখন এই শরীর ইত্যাদিকেও আত্মাতেই দেখা যায়। তারপর কেউ আর প্রশ্ন করবে না আর তাদের জড়ও বলবে না।

ভ—বলা হয় বিবেক আত্মা ও অনাত্মার বিচার। অনাত্মা কি?

ম—বস্তুতঃ অনাত্মা বলে কিছু নেই। অনাত্মা আত্মাতেই থাকে। আত্মাই নিজেকে ভুলে অনাত্মার কথা বলে। নিজের ওপর অধিকার হারিয়ে একটা কিছুকে অনাত্মা বলে ধারণা করে, সেটা যতই হোক নিজের অতিরিক্ত কিছু নয়।

অতঃপর বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকদের আলোচনায় হলঘরটি মুখর হয়ে উঠল

২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩১১। যে 'আমি'টা ওঠে সেটাও মিলিয়ে যায়। সেটা ব্যক্তিগত 'আমি' বা 'আমি'-চিন্তা। যেটা জাগে না সেটা মিলিয়ে যাবে না। এটা 'আছে' আর চিরকাল থাকবে। সেটাই সার্বিক 'আমি', পূর্ণ 'আমি' বা আত্মোপলব্ধি।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের মহিলাটি শ্রীভগবানকে বললে যে বেশীক্ষণ ধ্যান করলে মাথা ধরে।

ম—যে ধ্যান করে আর যাকে ধ্যান করা হয় সেই দু'জনকে এক জানলে মাথা ধরবে না বা অনুরূপ কষ্ট হবে না।

ভ—কিন্তু এরা পৃথক। এদের কি করে এক ভাবা যায়?

ম—এটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। একটাই আছে আর কোন পার্থক্য নেই। ধ্যানে আপেক্ষিক চেতনা চলে যাবে। সেটা ধ্বংস নয়; কারণ পরমচেতনার উদয় হয়। বাইবেল বলে, "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে···।' যদি তুমি নিজেকে শরীর মনে কর তবে বাক্যটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। অপরপক্ষে তুমি যদি প্রকৃত তুমি কে জানো তবে স্বর্গরাজ্য আর সব কিছু তোমার প্রকৃত সত্তার অন্তর্গত। অহংকারের উদয় হওয়ার পর ধারণাগুলোর উৎপত্তি হয়। 'দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ' (তোমার দৃষ্টি জ্ঞানময় কর আর জগতকে ব্রহ্মময় দেখো)। সেই পরমচেতনার উপলব্ধির দ্বারা বাইরে দেখো; তাহলে দেখবে যে অনুভূত পরমচেতনার থেকে ব্রহ্মাণ্ড পৃথক নয়।

তোমার দৃষ্টিভঙ্গী বহির্মুখী হওয়ার জন্য তুমি 'বাইরের' কথা বলছ। এই অবস্থায় তোমায় 'অন্তরে' দেখতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যে 'বাইরে' তুমি খুঁজছ তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা 'অন্তর'। বাস্তবিকপক্ষে আত্মা বাইরেও নয়, অন্তরেও নয়।

স্বর্গের কথা বলতে গিয়ে লোকে ওপরে বা নীচে, ভিতরে বা

বাইরে ভাবে কারণ তারা আপেক্ষিক জ্ঞানে অভ্যস্ত। লোকে বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান খোঁজে, সুতরাং এরূপ ধারণা হয়।

প্রকৃত কথা ওপর বা নীচু, অন্তর বা বাহির নেই। সেগুলো সত্য হলে তারা স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতেও থাকত। কারণ যা সত্য তা স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। তুমি কি ঘুমে কোন 'ভিতর' বা 'বাহির' অনুভব করেছিলে। নিশ্চয়ই করো নি।

ভ—আমার মনে নেই।

ম—যদি এরকম কিছু থাকত তবে মনে থাকত। কিন্তু তখনও তুমি তোমার অস্তিত্ব স্বীকার কর। সেই এক আত্মাই এখন কথা বলছে। যে আত্মা সুষুপ্তিতে নির্বিশেষ ছিল এখন বর্তমান অবস্থায় সে সবিশেষ হয়েছে আর নানাত্ব দেখছে। প্রকৃত অস্তিত্ব কেবলমাত্র এক, সেখানে বিষয়মুখ জ্ঞান নেই। সেটাই পরমচেতনা। সেটা আনন্দময় অবস্থা যা আমরা সবাই স্বীকার করি। সেই অবস্থাকে এক্ষণে এই জাগ্রত অবস্থায় আনতে হবে। একেই জাগ্রত-সুষুপ্তি বলে। সেটাই মুক্তি।

ভ—অহংকারেরই পুনর্জন্ম হয়।

ম—হাঁ। কিন্তু পুনর্জন্ম কি? অহংকার একই থাকে। নূতন শরীর হয় আর তাকে অধিকার করে। অহংকার বদলায় না। এটা একটা শরীর ছেড়ে, খুঁজে আর একটা শরীর নেয় না। এমন কি তোমার স্থূল শরীরে কি হয় দেখো। মনে কর তুমি লণ্ডন যাচ্ছ। কি করে যাও? তুমি একটা গাড়ী নিয়ে বন্দরে যাবে, জাহাজে চড়বে আর কয়েক দিনে লণ্ডনে পৌঁছাবে। কি ঘটল? যান-বাহনগুলোই চলে কিন্তু তোমার শরীরটা নয়। তবুও তুমি বল যে তুমি পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অন্য দিকে গিয়েছিল। যান-বাহনের গতি তোমার শরীরের ওপর আরোপ করা হয়েছে। তোমার অহংকারের পক্ষেও এইরূপ। পুনর্জন্মগুলো আরোপিত। দৃষ্টান্তসরূপ স্বপ্নে কি হয়? তুমি কি স্বপ্নের জগতে যাও, না সেটা তোমাতে

আসে? নিশ্চয় শেষেরটা। পুনর্জন্মের বেলায়ও তাই। অহংকার সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।

আবার ঘুমে কোন স্থান ও কাল নেই। এগুলো কতগুলো ধারণা যারা 'আমি'-চিন্তা উদয়ের পর ওঠে। 'আমি'-চিন্তা উদয়ের আগে এরা অনুপস্থিত থাকে। অতএব তুমি স্থান ও কালের অতীত। 'আমি'-চিন্তা একটা সীমিত আমি। প্রকৃত 'আমি' অসীম, সর্বব্যাপক এবং স্থান ও কালের অতীত। এরা সুষুপ্তিতে নেই। ঠিক ঘুম ভাঙ্গা ও জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মধ্যে একটা চেতন অবস্থা আছে, সেটা তোমার বিশুদ্ধ আত্মা। সেটাকে জানা চাই।

ভ—কিন্তু আমি এটা উপলব্ধি করি না।

ম—এটা কোন উপলব্ধির বস্তু নয়। তুমি তাই। সেখানে উপলব্ধি করার জন্য কে বা কি আছে?

৩১২। পুনার শ্রীভি. কে. চোলকার—বলা হয় 'নিজেকে জানো' বা তোমার মধ্যে 'আমিটা' কে দেখো। এটা করার উপায় কি? এটা কি কেবল যান্ত্রিকভাবে সর্বদা মন্ত্র জপ করে যাওয়া কিংবা জপ ক'রে কেন জপ করা হচ্ছে সেটা সর্বদা মনে রাখা?

ম—তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদা জপ করছ। যদি তুমি শাশ্বত অজপা সম্বন্ধে সচেতন না হও, তোমায় জপ করতে হবে। জপ চেষ্টা ক'রে করতে হয়। চেষ্টার অর্থ অন্য চিন্তাগুলোকে দূরে সরানো। তখন এটা মানস ও আন্তর জপ হয়। অবশেষে এর অজপা ও শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি হয়, কারণ তখন দেখা যাবে যে তোমার চেষ্টা ছাড়াই এটা হয়ে যাচ্ছে। এই চেষ্টাশূন্য অবস্থাই উপলব্ধির অবস্থা।

শ্রীচোলকার আবার বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু উপদেশের জন্য অনুরোধ করলেন অর্থাৎ তাঁর উপযুক্ত কোন উপদেশ।

ম—এটা বাইরে নয় সেজন্য অন্য কোথাও খুঁজতে হবে না। এটা অন্তরে আর শাশ্বতও বটে। এটা সর্বদা-অনুভূত। কিন্তু

তুমি বলছ যে তুমি এর সম্বন্ধে সচেতন নও। তার জন্য এর প্রতি অবিরাম মনোযোগ চাই। আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। তোমার চেষ্টা কেবল যাতে তুমি অন্য চিন্তার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হও।

ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হলেন।

৩১৩। শ্রীগ্রীনলেস—ভগবান গতকাল বলেছেন যে 'ঈশ্বরকে অন্তরে' খোঁজার সময়ে বাইরের কাজ আপনাহ'তে হয়ে যাবে। শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি তাঁর শিষ্যদের পড়াবার সময়ে যখন কৃষ্ণকে (আত্মাকে) খুঁজতেন, তখন তিনি তাঁর শরীর কোথায় আছে ভুলে গিয়ে কৃষ্ণের কথাই বলে যেতেন। এতে সন্দেহ জাগে যে আপনাহ'তে কাজকে হতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা। বাইরের কাজ সম্বন্ধে কি কিছুটা সজাগ থাকা উচিত ?

ম—আত্মাই সব। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি আত্মা ছাড়া পৃথক? আত্মা ছাড়া কি কাজ হতে পারে? কিংবা শরীরটা কি আত্মা ছাড়া? কোনটাই আত্মা ছাড়া নয়। আত্মা সর্বব্যাপী। সুতরাং তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত থাকো বা না থাকো সব কাজ হয়েই যাবে। কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে। আত্মা সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়াই কাজ সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া।

ভ—কাজে যদি মনোযোগ না দি হয়ত কাজের ক্ষতি হতে পারে।

ম—যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর সেজন্য ভাবো যে কাজ তোমার দ্বারা হয়। কিন্তু তোমার শরীর ও ক্রিয়া-সমেত তার কর্মতৎপরতা আত্মা ব্যতীত নয়। তুমি কাজে মনোযোগ দাও বা না দাও কি এসে যায়? মনে কর তুমি কোথাও থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছ। তুমি প্রতিটি পদক্ষেপে মনোযোগ দাও না। একটুক্ষণ পরে দেখ যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছ। তুমি দেখ যে কাজটা অর্থাৎ চলাটা তোমার মনোযোগ ছাড়াই কেমন হয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে আর সব রকম কাজের পক্ষেও তাই হয়।

ভ—অতএব এটা স্বপ্নচারিতার মত।

ম—ঠিক তাই। একটি ছোট ছেলে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে তার মা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ায়। ছেলেটিও প্রায় জাগ্রত অবস্থার মত খেয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন সে মাকে বলে "মা! আমি কাল রাত্রে খাবার খাইনি।" মা ও অন্যেরা জানে যে সে খেয়েছে। কিন্তু সে বলে যে, সে খায়নি। সে সচেতন ছিল না তবু কাজটা হয়ে গেছে। স্বপ্নচারিতা এরূপ কাজের একটা ভাল দৃষ্টান্ত।

আর একটা উদাহরণ নাও—একজন আরোহী একটা গরুর গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে। পথে বলদ চলে, থামে কিংবা তাদের গাড়ী থেকে খুলে দেওয়া হয়। সে এসব ঘটনা জানে না; কিন্তু জেগে উঠলে নিজেকে অন্য জায়গায় দেখে। সে এসব ঘটনা সম্বন্ধে পরম নির্বিকার ছিল, কিন্তু তার পথ শেষ হয়ে গেছে।

মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। সে শরীরে নিদ্রিত। তার জাগ্রত অবস্থা বলদের চলা; তার সমাধি বলদদের থেমে থাকা (কারণ সমাধি = জাগ্রত-সুষুপ্তি), অর্থাৎ বলা যায় যে সে জানে কিন্তু কাজে আসক্ত নয়। সুতরাং বলদেরা জোতা আছে কিন্তু চলছে না। তার নিদ্রা বলদদের গাড়ী থেকে খুলে দেওয়া কারণ তখন বলদদের জোয়াল থেকে খুলে দেওয়ার মত সমস্ত ক্রিয়াশীলতা স্থগিত থাকে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত—একটা সিনেমায় দৃশ্যগুলো পর্দার ওপর অভিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এই চলন্ত ছবিগুলো পর্দাকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করে না। দর্শক ছবির ওপর মনোযোগ দেয় কিন্তু পর্দাকে লক্ষ্য করে না। তারা (ছবিগুলো) পর্দা থেকে পৃথক থাকতে পারে না। তবুও পর্দার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করা হয়। অনুরূপভাবে আত্মাও পর্দা যার ওপর ছবি অর্থাৎ কর্মতৎপরতা হয়ে যাচ্ছে। মানুষ প্রথমটাকে (আত্মাকে) অগ্রাহ্য ক'রে পরেরটা (কর্মতৎপরতা) সম্বন্ধে সচেতন হয়। তা সত্ত্বেও সে আত্মা ছাড়া পৃথক নয়। সচেতন হও বা না হও কর্ম হয়ে যাবে।

ভ—সিনেমার একজন পরিচালক থাকে।

ম—সিনেমা জড় বস্তু দিয়ে গঠিত। পর্দা, ছবি, আলো ইত্যাদি জড় বস্তু সুতরাং একজন সচেতন চালকের প্রয়োজন হয়। আত্মার পক্ষে সে নিজেই চেতনা, সেজন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। একজন পৃথক চালকের প্রয়োজন হয় না।

ভ—আগের উত্তরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে (ভক্ত) শরীরকে চালক বলে ভুল করছে, সে এটার প্রতিবাদ করলে।

ম—শরীরের ক্রিয়াগুলো মনে রাখা হয় সুতরাং একজন চালকের প্রয়োজন জড়িত হয়ে যায়। যেহেতু শরীরটা আছে—যেটা একটা জড় পদার্থ—একজন চালক, একজন সচেতন প্রতিনিধির দরকার হয়।

যেহেতু লোকে ভাবে যে তারা জীব, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে ঈশ্বর জীবের চালকরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন। বাস্তবিকপক্ষে কোন জীব নেই আর কোন চালকও নেই। আত্মাই সব কিছু অন্তরে ধারণ করে। এটাই পর্দা, ছবি, দর্শক, অভিনেতা, চালক, আলো আর যা কিছু। তোমার তাকে শরীর-রূপ বিপরীত নির্ধারণ ও নিজেকে কর্তা বলে ভাবা ঠিক যেন দর্শকের নিজেকে সিনেমার অভিনেতা ব'লে মনে করা। কল্পনা কর যে ছবির একজন অভিনেতা জিজ্ঞাসা করছে যে সে কি পর্দা ছাড়া অভিনয় করতে পারবে? যে নিজেকে আত্মা ব্যতীত কাজ করছি ভাবে তার অবস্থাও তাই।

ভ—এটা অনেকটা দর্শককে সিনেমায় অভিনয় করতে বলার মত। স্বপ্নচারিতা মনে হয় অনেক বাঞ্ছনীয়।

ম—একটা ধারণা আছে যে, কাকেরা দেখার জন্য একটা কনীনিকা (আইরিস) দু'টি চোখের মধ্যে আবর্তন করে। এদের একটাই কনীনিকা, কিন্তু দু'টি অক্ষিগোলক। এরা চোখের দৃষ্টি ইচ্ছামত পরিচালনা করে।

আবার হাতীও একই শুঁড় দিয়ে নিঃশ্বাস নেয় আর জলপান ইত্যাদি অন্য কাজও করে।

পুনরায় সাপেরা একই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা ও শোনার কাজ করে।

একইভাবে কাজ ও অবস্থা একজনের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ। ঘুমিয়ে জাগা, জেগে ঘুমানো কিংবা স্বপ্নে ঘুমানো বা স্বপ্নে জাগা সবই প্রায় এক।

ভ—আমাদের একটা বাস্তব জাগ্রত-জগতে একটা স্থুল শরীর নিয়ে চলতে হয়। আমরা যদি কাজের সময়ে ঘুমাই বা ঘুম এসে গেলে কাজ করি, কাজে ভুল হয়ে যাবে।

ম—সুষুপ্তি অজ্ঞান নয়; এটা তোমার বিশুদ্ধ অবস্থা। জাগৃতি জ্ঞান নয়; এটা অজ্ঞান। সুষুপ্তিতে পূর্ণ চেতনা আছে; জাগ্রতে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা রয়েছে। তোমার প্রকৃত স্বরূপ দু'টিকে অন্তর্ভুক্ত করেও তাদের অতীত। আত্মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত।

সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগৃতি কেবলমাত্র বৃত্তি যা আত্মার সামনে পরিবর্তিত হচ্ছে। তুমি জানো বা না জানো, তারা হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানীরও এই অবস্থা, তার সামনে জাগরণ, সমাধি, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন ঠিক যেন আগে বলা নিদ্রিত আরোহীর গাড়ীর বলদদের চলা, থেমে থাকা ও গাড়ী থেকে তাদের খুলে দেওয়ার মত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রশ্নগুলো অজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে; অন্যথা এ প্রশ্নগুলো ওঠে না।

ভ—স্বভাবতঃ এগুলো আত্মা থেকে ওঠে না। সেখানে প্রশ্ন করার জন্য কে আছে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমি এখনও আত্মোপলব্ধি করিনি।

ম—সেটাই তোমার পথের বাধা। তুমি অজ্ঞানী আর তোমাকে এখনও আত্মোপলব্ধি করতে হবে তোমার এই ধারণাগুলো ছাড়তে হবে। তুমিই আত্মা। এমন সময় কি কখনও ছিল যে তুমি আত্মা ছাড়া পৃথক ছিলে?

ভ—সুতরাং এটা একটা স্বপ্নচারিতার ··কিংবা দিবা-স্বপ্নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভগবান হাসলেন।

৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

অমৃতবিন্দু

৩১৪। গতকালের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছিলেন যে সুষুপ্তিতে আত্মা বিশুদ্ধ-চৈতন্য। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন যে ঘুম থেকে জাগ্রত অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষণটি আত্মোপলব্ধির পক্ষে আদর্শ। তাঁকে এগুলো আরও ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করা হল।

শ্রীভগবান অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দিলেন—আত্মা সুষুপ্তিতে বিশুদ্ধ-চৈতন্য, এটা এই পরিবর্তনের ক্ষণটিতে ইদম্ ('ইহা') ছাড়া কেবল অহম্ ('আমি')-রূপে প্রকাশিত হয় ; জাগ্রত অবস্থায় অহম্ ('আমি') ও ইদম্ ('ইহা')-রূপে ব্যক্ত হয়। ব্যক্তিগত অনুভূতি কেবল অহম্ ('আমি')-এর দ্বারা হয়। সুতরাং যেভাবে বলা হল, সেরূপে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে (অর্থাৎ অন্তর্বর্তী 'আমি'কে ধরে)। অন্যথা ঘুমের অনুভূতি কোন কাজে আসে না। যদি এই অন্তর্বর্তী 'আমি' অনুভূত হয় তবে আধিষ্ঠান ভূমিটা পাওয়া যায় আর সেটাই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

আবার, সুষুপ্তিকে অজ্ঞান বলা হয়। সেটা জাগ্রত অবস্থার ভ্রান্তজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়। জাগ্রত অবস্থাই প্রকৃত অজ্ঞান আর সুষুপ্তি অবস্থা প্রজ্ঞান। শ্রুতি বলে 'প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম শাশ্বত। সুষুপ্তি-অনুভবকারীকে প্রাজ্ঞ বলা হয়। সে তিনটি অবস্থাতেই প্রজ্ঞান। সুষুপ্তি অবস্থায় এর (প্রাজ্ঞের) বিশেষ তাৎপর্য এই যে সে তখন 'প্রজ্ঞানঘন'। ঘন কি ? জ্ঞান ও বিজ্ঞান আছে। সব কিছু অনুভবের সময়ে এ দু'টি একসঙ্গে কাজ করে। জাগ্রতের বিজ্ঞান বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান। এটা সর্বদা ব্যক্তির সঙ্গে সহ-অবস্থিত। যখন এটা 'বিস্পষ্ট জ্ঞান' (স্পষ্ট জ্ঞান) হয়, তখন সেটাই ব্রহ্ম। যখন বিপরীত জ্ঞানের একান্ত অভাব, যেমন সুষুপ্তিতে, সে তখন কেবলমাত্র

বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান। সেটাই 'প্রজ্ঞানঘন'। ঐতরেয় উপনিষদ বলে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান, সংজ্ঞান সবই ব্রহ্মের নাম। যে বস্তু কেবলমাত্র জ্ঞানময় তার অনুভূতি হয় কি করে? অনুভূতি সর্বদা বিজ্ঞানের দ্বারাই হয়। অতএব প্রজ্ঞানঘনের অনুভবের জন্য অন্তর্বর্তী অবস্থার বিশুদ্ধ 'আমি'কে ধরতে হবে। জাগ্রত অবস্থার 'আমি' মলিন আর এই অনুভূতির উপযুক্ত নয়। এ কারণে অন্তর্বর্তী 'আমি' বা বিশুদ্ধ 'আমি'র উপযোগ হয়। এই বিশুদ্ধ 'আমি' কি করে অনুভূত হয়? 'বিবেক চূড়ামণি' বলে 'বিজ্ঞান কোশো বিলসত্যজস্রম্' (সে সর্বদাই বিজ্ঞানময়কোষে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে)। 'ত্রিপুরা রহস্য' ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে দু'টি সঙ্কল্পের (কল্পনা বা চিন্তা) অন্তর্বর্তী সন্ধিক্ষণই বিশুদ্ধ অহম্ ('আমি')-কে প্রকাশিত করে। অতএব এই বিশুদ্ধ 'আমি'কে ধরেই একজনকে প্রজ্ঞানঘনকে লক্ষ্য করতে হবে আর এই চেষ্টায় বৃত্তি আছে। এসবের প্রত্যেকের উপযুক্ত ও নির্দিষ্ট স্থান আছে আর এরা কালে উপলব্ধির পথে নিয়ে যায়।

আবার 'বিবেকচূড়ামণি'তে বিশুদ্ধ আত্মাকে অসতের অতীত অর্থাৎ অসৎ থেকে পৃথক ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে অসতের অর্থ জাগ্রত অবস্থার মলিন 'আমি'। 'অসদ্ বিলক্ষণ'-এর অর্থ সৎ অর্থাৎ সুষুপ্তির আত্মা। তাকেই আবার সৎ ও অসৎ হতে পৃথক ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দু'টির তাৎপর্যই এক। সে আবার 'অশেষসাক্ষী'ও (সর্বদ্রষ্টা সাক্ষী) বটে।

যদি বিশুদ্ধ হয় তবে সে মলিন 'আমি'র দ্বারা কিরূপে অনুভূত হবে? লোকে বলে, "আমি আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম।" আনন্দটা তার অভিজ্ঞতা। তা যদি না হয় তবে সে যা অনুভব করেনি তা কি করে বলে? আত্মা যদি বিশুদ্ধই ছিল তবে সে সুষুপ্তিতে আনন্দটা কি করে অনুভব করলে? কে-ই বা এখন সেই অনুভূতির কথা বলছে? বক্তা বিজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞান আত্মা) আর সে

প্রজ্ঞানাত্মার (বিশুদ্ধ আত্মার) কথা বলছে। এটাই বা কি করে হয়? তবে কি এই বিজ্ঞানাত্মা সুষুপ্তিতেও ছিল? তার সুষুপ্তি-কালীন আনন্দ-অনুভূতির বর্তমান বিবৃতি সুষুপ্তিতেও তার উপস্থিতির (অস্তিত্ব থাকার) সিদ্ধান্ত করে। তখন সে কিরূপে ছিল? নিশ্চয় জাগ্রতে যেমন থাকে তেমন নয়। সেখানে সে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল। অতীব সূক্ষ্ম বিজ্ঞানাত্মা আনন্দময় প্রজ্ঞানাত্মাকে 'মায়াকরণ' দ্বারা অনুভব করে। এটা অনেকটা শাখা, প্রশাখা ও পল্লবের মধ্য দিয়ে চন্দ্ররশ্মি দেখার মতন।

এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানাত্মা মনে হয় বর্তমান সময়ের স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বিজ্ঞানাত্মার কাছে অপরিচিত। কেন-ই বা আমরা সুষুপ্তিতে তার অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করব? আমরা আনন্দ অনুভব অস্বীকার ক'রে এই সিদ্ধান্ত করা ত্যাগ করতে পারি? না। আনন্দ অনুভূতির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না, কারণ প্রত্যেকেই ঘুমের কামনা করে আর সুষুপ্তির আনন্দ লাভের জন্য বেশ সুন্দরভাবে শয্যা প্রস্তুত করে।

এই থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিন অবস্থাতেই আছে, যদিও তাদের সূক্ষ্মতার তারতম্য হয়। অন্তর্বর্তী অবস্থায় অহম্ ('আমি') বিশুদ্ধ কারণ, তখন ইদম্ ('ইহা') অবদমিত থাকে। অহমের ('আমি'র) প্রাধান্য হয়।

আমাদের এখন কেন বিশুদ্ধ 'আমি'র অনুভূতি বা স্মরণ হয় না? কারণ তার সঙ্গে 'পরিচয়ের' অভাব রয়েছে। যদি সচেতন-ভাবে একে লাভ হয় তবেই একে চেনা যায়। অতএব চেষ্টা কর আর সচেতনভাবে একে লাভ কর।

৩১৫। একজন সেবক জিজ্ঞাসা করলে—শ্রীভগবান বলেন, "সত্য ও মিথ্যা এক।" তা কি করে হয়?

ম—তান্ত্রিক ও তাদের মত অন্যেরা শ্রীশঙ্করের দর্শনকে ঠিক-

ভাবে না বুঝে মায়াবাদ বলে নিন্দা করে। তিনি কি বলেন? তিনি বলেছেন—(১) ব্রহ্ম সত্য; (২) জগৎ মিথ্যা; (৩) ব্রহ্মই জগৎ। তিনি দ্বিতীয় বাক্যে শেষ করছেন না কিন্তু তৃতীয় বিবৃতি দিয়ে সম্পূরণ করছেন। এর অর্থ কি? জগতকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক দেখা হয়, আর এই দেখাটা ভুল। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্ত দেখায়। এটা 'স্বতন্ত্র অধ্যারোপ'। রজ্জুর সত্যটা জানা হলে সর্পের ভ্রম চিরতরে দূরীভূত হয়।

কিন্তু তাদের 'আপেক্ষিক (প্রতিবন্ধী) অধ্যারোপ'-এর বিষয়ও বিচার করা দরকার, যেমন 'মরুমরীচিকা' বা 'মৃগতৃষ্ণা'।

মরীচিকাকে মরীচিকা ব'লে জানলেও মরীচিকা দূর হয় না। দৃশ্যটা থাকে, কিন্তু মানুষ তাকে জল ভ্রমে তার কাছে যায় না। শ্রীশঙ্করকে এই দু'টি দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। জগৎ মিথ্যা। এটা জানলেও জগৎ দৃশ্যমান থাকে। একে ব্রহ্ম বলেই জানা উচিত, আর পৃথক বলে নয়।

যদি জগৎ দর্শন হয়, তবু কার এটা দর্শন হয়? তাঁর জিজ্ঞাসা। তোমার উত্তর কি? তোমায় বলতে হবে আত্মার। যদি তা না হয় তবে জগৎ কি জ্ঞাতা আত্মার অভাবেও দৃষ্ট হবে? অতএব আত্মাই সত্য। এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত। জগৎ ব্যাপার আত্মার মতই সত্য আর আত্মা থেকে পৃথক হলে মিথ্যা।

এখন তান্ত্রিক ইত্যাদিরা কি বলে? তারা বলে যে জগৎ ব্যাপার সত্য কারণ যার ওপর তাদের দেখা যায় তারা সেই সত্যের অংশ।

দু'টি সিদ্ধান্ত কি এক নয়? আমি এই অর্থে সত্য ও মিথ্যা এক বলেছিলাম।

প্রতিপক্ষরা বলে যে আপেক্ষিক ও স্বতন্ত্র ভ্রম বিবেচনা করলেও মরীচিকার জল একান্ত ভ্রম কারণ সে জল ব্যবহার করা যায় না। অপরপক্ষে জগৎ ব্যাপার অন্যপ্রকার কারণ তার ব্যবহারিক

উপযোগিতা আছে। সুতরাং পরেরটা (জগৎ) পূর্বের (মরীচিকার জলের) সঙ্গে সমান কি করে হয় ?

একটা ব্যাপার কেবল ব্যবহারের উপযোগী হলেই সত্য হয় না। স্বপ্নের দৃষ্টান্ত নাও। স্বপ্নের সৃষ্টির উপযোগিতা আছে ; তারা স্বপ্নের প্রয়োজন মেটায়। স্বাপ্ন জলে স্বপ্নের তৃষ্ণা মেটে। স্বাপ্ন-সৃষ্টি জাগ্রত অবস্থায় অস্বীকার করা হয়। জাগ্রত সৃষ্টিও অন্য দুই অবস্থায় অস্বীকৃত হয়। যা নিরবচ্ছিন্ন নয় তা সত্য হতে পারে না। যদি সত্য হয় তবে সর্বদা সত্য থাকবে—অল্পক্ষণের জন্য সত্য আর অন্য সময়ে মিথ্যা—তা হয় না।

ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টিও এইরূপ। সেগুলো সত্য মনে হলেও একটা ভ্রম।

অনুরূপভাবে জগৎ কখন স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য হতে পারে না—অর্থাৎ একটা সত্য অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে।

৩১৬। একটা সিনেমার ছবিতে পর্দার ওপর আগুন জ্বলছে। এটা কি পর্দাকে পোড়ায় ? জল প্রবাহ বয়ে চলেছে। পর্দাকে ভিজিয়ে দেয় কি ? অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে। তারা কি পর্দা নষ্ট করে ?

সেজন্যই বলা হয়, ‘অচ্ছেদ্যোঽয়ম্, অদাহ্যোঽয়ম্, অক্লেদ্যোঽয়ম্’ ইত্যাদি। আগুন, জল ইত্যাদি ব্রহ্ম (অর্থাৎ আত্মা)-রূপ পর্দার ওপর ব্যাপার আর তারা ‘একে’ (পর্দাকে) প্রভাবিত করে না।

৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩১৭। শ্রীপার্থী—অনেক দর্শনার্থী আমায় বলে যে তাদের অলৌকিক দর্শন হয় বা আপনার চিন্তা-স্রোত তাদের প্রভাবিত করে। আমি এখানে দেড়মাস রয়েছি, আমার কোন প্রকার কিছুমাত্র অনুভূতি

হয়নি। তবে কি আমি আপনার কৃপার অনুপযুক্ত ? তা যদি হয়, তবে যেকালে সুদূরাগত বিদেশীদের এরূপ হয় তখন আমি বশিষ্ঠ কুলোৎপন্ন হয়েও আপনার কৃপা না পাওয়া একটা নিন্দার কথা মনে করি। আপনি দয়া ক'রে এর ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিন।

ম—দর্শন বা চিন্তা-স্রোতের অনুভূতি মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। এটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়; সার্বিক সত্তার ওপর নির্ভর করে না। তা ছাড়া এগুলো নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত বস্তু মনের শান্তি।

ভ—সমাধির ফলে শান্তি হয়। কিভাবে সমাধি লাভ হয় ?

ম—সমাধি কেবলমাত্র চিন্তার অভাব। সে অবস্থা নিদ্রাতেও হয়। তা থেকে কি স্থায়ী শান্তি লাভ হয় ?

ভ—আশ্রমের খাতায় লেখা আছে যে সমাধি হওয়া দরকার।

ম—সমাধি একটা কিছু পৃথক বস্তু নয় যা নূতন করে পেতে হবে। তোমার প্রকৃত স্বরূপই সমাধি অবস্থা।

ভ—কিন্তু আমি অনুভব করি না।

ম—তোমার বিপরীত ধারণাই বাধা।

ভ—যেহেতু আমি আত্মোপলব্ধি করিনি সেজন্যই বলছি যে আমি আমার নিত্য-সমাহিত অবস্থা বুঝি না।

ম—এটা কেবল একটা পুনরোক্তি। এটাই বাধা। অনাত্মাকে তুমি ব'লে মনে করার জন্য এটা ওঠে। সেটাই ভুল। অনাত্মাকে আত্মা ব'লে ভেবো না। তাহলে আত্মা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে।

ভ—আমি তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে পারছি কিন্তু বাস্তবিকভাবে নয়।

ম—দু'টি আত্মা নেই—যে আত্মা বলবে সে আত্মোপলব্ধি করেনি।

ভ—এটা এখনও বৌদ্ধিক। আমার সমাধি কি করে হবে ?

ম—সমাধির উপযোগিতা ক্ষণস্থায়ী। এটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আনন্দ। এ থেকে উত্থিত হলে পুরাতন বাসনাগুলো ফিরে আসে। যতক্ষণ না সহজ সমাধিতে সব বাসনা ক্ষয় হয়ে যায় ততক্ষণ সমাধির কোন লাভ নেই।

ভ—কিন্তু সহজ সমাধি হতে গেলে সমাধি হওয়া চাই ?

ম—সমাধিই স্বরূপ অবস্থা। সেখানে কর্মপরতা ও ব্যাপার থাকলেও তারা সমাধিকে প্রভাবিত করে না। যদি সেগুলোকে আত্মা ছাড়া পৃথক না ভাবা হয় তাহলেই আত্মোপলব্ধি হয়ে যায়। যদি মনে স্থায়ী শান্তি না আনে তবে সমাধি অবস্থার কি উপযোগিতা ? যাই হোক না কেন, তুমি এইক্ষণে সমাধি অবস্থায় আছ ; এটা জানো। ব্যস্।

ভ—কিন্তু কি করে করব ?

একজন পণ্ডিত বললেন, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (মনের সহিত বাক্য যেখানে যেতে পারে না)।

প্রশ্নকারী পাল্টা উত্তর দিলে, "এও বলা হয়েছে, 'মনসৈব আপ্তব্যম্' (মন দিয়ে উপলব্ধি হয়)।

ম—হাঁ। বিশুদ্ধ মন অর্থাৎ চিন্তাশূন্য মনই আত্মা। বিশুদ্ধ মন মলিন মনের অতীত।

ভ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শীরা দর্শন করেন।

ম—মনের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, এ বিষয়েও তাই খাটে।

ভ—যদি সমাধি আমার স্বরূপ হয় তবে কেন বলা হয় যে উপলব্ধির আগে সমাধি হওয়া দরকার।

ম—তার অর্থ তাকে তার নিত্য-সমাধি অবস্থার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তার প্রতি অমনোযোগই অজ্ঞান। 'প্রমাদো বৈ মৃত্যুঃ (বিস্মৃতিই মৃত্যু)।

ভ—আগে সমাধি না হলে আমি তার প্রতি মনোযোগই বা দেবো কি করে?

ম—বেশ তো। যদি তুমি সমাধির জন্য এতই ব্যস্ত হও তবে যে কোন মাদক-দ্রব্য এটা এনে দেবে। তার ফল মাদক-আসক্তি, মুক্তি নয়। সমাধি অবস্থাতে বাসনা সুপ্ত থাকে। বাসনা ক্ষয় হওয়া চাই।

আর একজন ভক্ত—বাসনা সম্পূর্ণ নষ্ট না হলেও কি আত্ম-জ্ঞান হতে পারে?

ম—বাসনাগুলো দু'প্রকারের (১) বন্ধহেতু—অজ্ঞানীর বন্ধনের কারণ, (২) ভোগহেতু—জ্ঞানীর আনন্দের কারণ। শেষেরগুলো জ্ঞানের বাধা নয়।

ভ—জ্ঞানীর কি পুনর্জন্ম আছে, বামদেব, জড়ভরত ইত্যাদির মত?

ম—জ্ঞানীর পুনর্জন্ম হয় না। বন্ধহেতু বাসনাই পুনর্জন্মের কারণ হয়। কিন্তু সেগুলো জ্ঞানে ধ্বংস হয়ে যায়।

ভ—তবে কি মনে করব যে তারা 'কেবল নির্বিকল্প সমাধি' লাভ করেছিল কিন্তু 'সহজ নির্বিকল্প' অবস্থা নয়।

ম—হাঁ।

ভ—যদি ভোগহেতু বাসনা জ্ঞানের বাধা না হয় আর একজন নিজের শান্তি অবিচলিত রেখে জাগতিক ঘটনা দেখে যেতে পারে তার অর্থ হয় আসক্তিই বন্ধন। ঠিক বলেছি?

ম—হাঁ, ঠিক। আসক্তিই বন্ধন। অহংকারের নাশ হলে আসক্তি চলে যায়।

ভ—বলা হয় গুরুকৃপার সাহায্যে আত্মজ্ঞান হয়।

ম—আত্মা ছাড়া আর কেউ গুরু নয়।

ভ—কৃষ্ণের সান্দীপনি ও রামের বশিষ্ট গুরু ছিলেন।

ম—সাধকের পক্ষে গুরু বাইরে। গুরু মনকে অন্তর্মুখীন

করেন। যেহেতু সাধক বহির্মুখী সেজন্য তাকে গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে বলা হয়, সময় হলে সেই গুরুকে সে আত্মা বলে জানবে।

ভ—আমি কি গুরুকৃপা পেতে পারি?

ম—কৃপা সব সময়ে আছে।

ভ—কিন্তু আমি তা অনুভব করছি না।

ম—সমর্পণই কৃপা অনুভব করাবে।

ভ—আমি সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি নিজেকে সব থেকে ভাল বুঝি। তবু কোন কৃপা অনুভব করি না।

ম—যদি সমর্পণ করেই থাকো তবে প্রশ্ন হয় না।

আমি সমর্পণ করেছি। তবু প্রশ্ন উঠছে।

ম—কৃপা নিত্যসিদ্ধ। তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল, এছাড়া আর দোষ কোথায় হতে পারে?

ভ—আমি যেন আত্মসমর্পণ করতে পারি।

ম—তায়ুমানাবর বলেছে, "এতদূর বিচার করতে পারার জন্য আর তোমার কথাটুকু বোঝার জন্য তোমারই জয় হোক।"

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩১৮। (একজন হিন্দীভাষী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন যে কি করে মৃত্যুভয় কাটানো যাবে।

ম—মৃত্যুর কথা ভাবার আগে ভেবে দেখো তুমি জন্মেছ কি না। যে জন্মেছে সেই কেবল মরে। এমন কি ঘুমেও তুমি মরার মত থাকো। তবে মৃত্যুতে আর ভয় কি?

ভ—ঘুমে আমরা কিরূপে থাকি?

ম—ঘুমেই জিজ্ঞাসা কোরো। কেবল জেগে উঠলেই তুমি ঘুমের অভিজ্ঞতা স্মরণ করো। "আমি আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম", ব'লে তুমি সেই অবস্থা স্মরণ করো।)

ভ—কোন্ বৃত্তি দিয়ে সেই অবস্থা অনুভব করি ?

ম—আমরা অন্য অবস্থায় যাতে অভ্যস্ত সেই অন্তঃকরণের তুলনায় একে 'মায়াকরণ' বলি। একই বৃত্তিকে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়, যেমন ঘুমের আনন্দাত্মাকে জাগ্রতে বিজ্ঞানাত্মা বলা হয়।

ভ—যে মায়াকরণ আনন্দ অনুভব করে কৃপা ক'রে তার একটা উদাহরণ দিন।

ম—তুমি কি করে বল যে "আমি আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম ?" তোমার আনন্দের প্রমাণের জন্য একটা অনুভূতি আছে। নিদ্রিত অবস্থায় অনুভূতির অভাব হলে জাগ্রতে স্মরণ হতে পারে না।

ভ—স্বীকৃত। কিন্তু আমায় একটা দৃষ্টান্ত দিন।

ম—এটা কি করে বর্ণনা করা যাবে ? তুমি যদি জলে ডুবে কোন বস্তু উদ্ধার করতে চাও, তুমি জল থেকে উঠে এলেই উদ্ধারের কথা বলতে পারো। জলে ডোবা অবস্থায় তুমি কিছু বলতে পারো না।

ভ—ঘুমে আমার ভয় থাকে না, কিন্তু এখন আছে।

ম—কারণ 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ ভবতি'—ভয় সব সময়ে দ্বিতীয় থেকে হয়। কিসের জন্য তুমি ভীত হও ?

ভ—শরীর, ইন্দ্রিয়, জগৎ, ঈশ্বর, কর্তৃত্ব, সুখ ইত্যাদি বোধের জন্য।

ম—তারা যদি ভীতি উৎপাদন করে তবে তাদের দেখ কেন ?

ভ—কারণ তারা অপরিহার্য।

ম—কিন্তু তুমিই তো দেখো। ভয়টা কার ? এটা কি তাদের ?

ভ—না, আমার।

ম—তুমি দেখো বলেই তাদের ভয় পাও। তাদের দেখো না আর ভয় হবে না।

ভ—তবে জাগ্রত অবস্থায় কি করব ?

ম—আত্মবান হও ; দ্বিতীয় না থাকায় তোমার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

ভ—হাঁ। এখন আমি বুঝেছি। আমি যদি আত্মাকে দেখি তবে দৃষ্টি অনাত্মা থেকে উঠে যাবে আর আনন্দ লাভ হবে। তবু মৃত্যুভয় আছে।

ম—যে জন্মেছে সেই কেবল মরবে। দেখো, তুমি আদৌ জন্মেছ কি না যে তোমার মৃত্যুভয় হবে।

৩১৯। একজন গোয়াবাসী হিন্দু শ্রীশ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" (কর্মে কৌশলই যোগ)-এ কৌশলম্ কি ? কি করে লাভ হয় ?

ম—ফলের কথা না ভেবে কর্ম কর। নিজেকে কর্তা মনে করো না। ঈশ্বরকে কর্ম সমর্পণ কর। এটাই কৌশল ও তা লাভ করার উপায়।

ভ—'সমত্বম্ যোগ উচ্যতে' (সমত্বকে যোগ বলে)। এই 'সমত্বম্' কি ?

ম—এটা নানাত্বের মাঝে একত্ব। জগৎ এখন বৈচিত্র্যপূর্ণ দেখাচ্ছে। সকল বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ বস্তু (সম) আছে, তাকে দেখো। এটা হলে পরস্পর-বিরুদ্ধ যুগলের (দ্বন্দ্বানি) মধ্যে সমত্ব স্বাভাবিকভাবে আসে। সাধারণতঃ শেষেরটাকেই (সমত্বে আসাটাকে) সমত্ব বোঝায়।

ভ—বৈচিত্র্যের মধ্যে সামান্য (সাধারণ) বস্তুটি কি করে অনুভূত হবে ?

ম—দ্রষ্টা কেবলমাত্র একজন। দ্রষ্টা ছাড়া তারা থাকে না। অন্যগুলোর যতই পরিবর্তন হোক, দ্রষ্টার কোন পরিবর্তন হয় না।

(যোগঃ কর্মস্থু কৌশলম্—কর্মে কৌশলই যোগ গী ২।৫০
সমত্বম্ যোগ উচ্যতে—সমত্বই যোগ গী ২।৪৮
মামেকং শরণং ব্রজ—আমাতেই সমর্পণ কর গী ১৮।৬২
একমেবাদ্বিতীয়ম্—একই মাত্র আছে, দ্বিতীয় নেই।

চারটি বাক্য কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রতীক, এদের ভাবার্থ এক। এক সত্যই বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

শ্রীএকনাথ রাও—এর জন্য কি কৃপার প্রয়োজন হয়?

ম—হ্যাঁ।

ভ—কি করে ঈশ্বরের কৃপা হয়?

ম—সমর্পণের দ্বারা।

ভ—তবুও কৃপা অনুভব হয় না।

ম—আন্তরিকতার অভাব। সমর্পণ মৌখিক বা শর্তবদ্ধ হলে হয় না। এই কথার উদাহরণ দেওয়ার জন্য 'সন্ত জাস্টিনিয়ান' থেকে অংশ বিশেষ পড়ে শোনানো হল।

প্রার্থনা মৌখিক নয়। এটা হৃদয় থেকে হওয়া চাই। হৃদয়ে মিশে যাওয়াই প্রার্থনা। সেটাই কৃপা।

আলোয়ার বলে, "এতকাল তোমায় খুঁজেছি। আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে দেখি তুমি আত্মা। আত্মাই আমার সর্বস্ব, সুতরাং তুমিই আমার সর্বস্ব।"

ভ—আণব (সীমিত বোধ), মায়িক (অজ্ঞান) ও কাম্য (বাসনা) এই তিনটি মলিনতাই ধ্যানের বাধা। এগুলো জয় করা যায় কি করে?

ম—তাদের দ্বারা বিচলিত না হয়ে।

ভ—কৃপার প্রয়োজন।

ম—হ্যাঁ, কৃপাই আদি ও অন্ত। অন্তর্মুখীনতা কৃপা; অধ্যবসায় কৃপা; আর উপলব্ধিও কৃপা। এরই জন্য এই বাক্য—'মামেকং শরণং ব্রজ' (আমাতেই শরণ লও)। যদি কেউ

সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তবে কৃপা চাইবার জন্য কি কেউ থাকে? কৃপা তাকে আত্মসাৎ করে।

ভ—বাধাগুলো শক্তিশালী, ধ্যানে বাধা দেয়।

ম—যদি একটা উচ্চশক্তিকে বিশ্বাস ক'রে আত্মসমর্পণ করা যায় তবে তারা আর কি করে বাধা দেবে। তুমি বলছ 'তারা শক্তিশালী', তাদের শক্তির উৎসকে ধরতে হবে তবেই তারা আর তোমায় বাধা দিতে পারবে না।

৩২০। কথায় কথায় শ্রীভগবান বললেন যে কেবল উপযুক্ত অধিকারীর আত্মজ্ঞান হয়। জ্ঞান উদয়ের আগে বাসনা ক্ষয় হওয়া চাই। জ্ঞান হওয়ার জন্য জনকের মত হতে হবে। সত্যের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগই যোগ্যতার নির্দেশক।

৩২১। ভ—জাগ্রতে দুঃখ আসে। আসবেই বা কেন?

ম—তুমি যদি তোমার আত্মাকে দেখ তবে তারা আসবে না।

ভ—আমি কে দেখতে চেষ্টা করলে কিছুই দেখি না।

ম—তুমি ঘুমে কিরূপ ছিলে? সেখানে কোন 'আমি'-চিন্তা ছিল না আর তুমি আনন্দে ছিলে। অন্যপক্ষে জাগ্রত অবস্থায় মূল 'আমি'-চিন্তা হতে অন্যান্য চিন্তা ফুটে উঠে অন্তর্নিহিত আনন্দকে আড়াল করেছে। এই চিন্তাগুলোকে দূর কর, এরাই আনন্দের বাধা। আনন্দ যে তোমার সহজ অবস্থা সেটা তোমার সুষুপ্তিতে সুস্পষ্ট ছিল।

ভ—আমি আমার ঘুমের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

ম—কিন্তু তুমি জানো যে সেটা আনন্দময়। তা না হলে

তুমি বলতে না 'আমি আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম'। যখন কোন চিন্তা থাকে না, কোন 'আমি' থাকে না, বাস্তবিকপক্ষে তুমি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তুমি আনন্দে থাকো। এটাই পূর্ণ সত্য।

মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) এটাই স্পষ্ট জ্ঞাপন করে। তোমার আত্মাকে খোঁজো—তাহলেই 'তাকে' জানা হয়ে যাবে।

ভ—সেটা ব্রহ্ম হয় কি করে?

ম—নিজেকে ছাড়া ব্রহ্মকে জানতে চাও কেন? শাস্ত্র বলে 'তুমিই তাই'। আত্মা তোমার অন্তরঙ্গ আর তুমি আত্মা ছাড়া কখনই পৃথক নও। একে জানো। সেটাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা।

ভ—কিন্তু আমি এটা করতে অক্ষম। আমি আমাকে উপলব্ধি করার পক্ষেও দুর্বল।

ম—সে অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ কর আর সেই উচ্চ শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবে।

ভ—অহেতুক (নিঃশর্ত) আত্মসমর্পণ কি?

ম—যদি কেউ সমর্পণ করে তবে প্রশ্ন ও চিন্তা করার জন্য কেউ থাকে না। হয় মূল 'আমি'-চিন্তাকে ধরে অন্য চিন্তা দূর করতে হয় কিংবা উচ্চ শক্তির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হয়। উপলব্ধির মাত্র এই দু'টি পথ।

৩২২। একজন সুমার্জিতা মহিলা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সলিসিটারের কন্যা, জিজ্ঞাসা করলে—আপনার উপদেশমত চিন্তাশূন্য হয়ে থাকার জন্য কি করতে হবে? সেটা কি কেবল 'আমি কে' অনুসন্ধান?

ম—কেবল শান্ত হয়ে থাকো। ক'রে দেখো।

ভ—অসম্ভব।

ম—ঠিক তাই। সে কারণে 'আমি কে?' অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভ—প্রশ্ন করলে অন্তরে উত্তর পাওয়া যায় না।

ম—তুমি কিরূপ উত্তর আশা কর? তুমি কি সেখানে নেই? আর কি চাও?

ভ—আরও বেশি চিন্তা ওঠে।

ম—তখনই 'আমি কে?' প্রশ্নটা কর।

ভ—প্রত্যেক চিন্তাতেই এটা করব? আচ্ছা। তবে কি জগৎ কেবলমাত্র আমাদের চিন্তা?

ম—এ প্রশ্নটা জগতের জন্যই থাক। তাকেই প্রশ্ন করতে দাও, "আমি কি করে হলাম?"

ভ—আপনি কি বলতে চান যে জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই?

ম—গভীর ঘুমে কোন বোধ ছিল না; জাগ্রত হলেই এসব দেখা যায়; চিন্তা ওঠার পর জগৎ প্রকাশ হয়; চিন্তা ছাড়া আর এটা কি?

আর একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—মন স্থির করার জন্য কি করব?

ম—আগে মনটাকে ধরে এখানে নিয়ে এস, তারপর তার স্থির করার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

ভ—আমি বলতে চেয়েছিলাম, এটা সর্বদাই চঞ্চল—এমন কি যখন জপ করি তখনও।

ম—জপ কেবল মন স্থির করার জন্য।

ভ—এর জন্য কী জপ করা ভাল?

ম—উপযুক্ত কোন কিছু, যেমন গায়ত্রী।

ভ—গায়ত্রী হলে হবে?

ম—এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে? যারা এটা করতে পারে না তারাই অন্য কিছু খোঁজে। এর মধ্যে সমগ্র সত্য নিহিত আছে। জপ করলে ধ্যান হবে আর এটাই উপলব্ধির উপায়।

ভ—দিনে আধঘণ্টা করে করলে হবে ?

ম—সদা-সর্বদা কিংবা যতক্ষণ অবধি তুমি করতে পারো।

৩২৩। 'অরুণাচল অষ্টকের' ষষ্ঠ পদটি ব্যাখ্যা করে শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—

পূর্বপদের শেষ বাক্য "আর কি আছে বল ?" এই পদের প্রথম কথা "তুমি এক···।" ক্রমে বলা হয়েছে, "যদিও কেবল এক তবু তার অচিন্ত্য শক্তিতে এটা একবিন্দু 'আমি' (অহংকার) যার অন্য নাম অজ্ঞান বা সুপ্ত সংস্কার-সমূহ তাতে প্রতিফলিত হয় ; এই প্রতিফলিত আলোই আপেক্ষিক জ্ঞান। এটাই প্রারব্ধানুসারে অন্তঃকরণের সুপ্ত বাসনা-সমূহকে বাইরে স্থূল জগতরূপে প্রকাশ করে আর বাইরের স্থূল জগতকে সংস্কাররূপে অন্তরে গুটিয়ে নেয় ; এই শক্তিকেই সূক্ষ্মে মন ও স্থূলে মস্তিষ্ক বলে। এই মন বা মস্তিষ্ক সেই 'এক শাশ্বত সত্তা'র পক্ষে বিবর্ধক কাঁচের (ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের) মত কাজ করে আর সেই সত্তাকেই এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডরূপে দেখায়। জাগ্রত ও স্বপ্নে মন বহির্মুখী ; সুষুপ্তিতে অন্তর্মুখী ; এই মনেরই মাধ্যমে এক পরমসত্তা জাগ্রতে ও স্বপ্নে নানারূপে প্রতিভাত হয় আর সুষুপ্তি ও মূর্ছা ইত্যাদিতে প্রত্যাহৃত হয়। অতএব তুমি একমাত্র 'সেই' আর অন্য কিছু নও। পরিবর্তন যাই হোক না কেন তুমি এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে থাকো ; তুমি ছাড়া আর কিছু নেই।"

আগের পদে বলা হয়েছে 'আলোক-প্রতিক্রিয়াশীল ফলকে' (ফোটোর প্লেটে) একবার সূর্যরশ্মি পড়লে তাতে আর কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না ; অনুরূপভাবে মন (সুগ্রাহী পট) একবার 'তোমার আলোকে'র প্রভাবাধীন হলে আর জগৎ-প্রতিবিম্ব নিতে পারে না। তাছাড়া তোমারই সূর্য। তার রশ্মি যদি প্রতিবিম্ব নিবারণে এত শক্তিশালী হয় তবে 'তোমার আলোক' না জানি কত শক্তিমান ! এরূপে বলা হয়েছে যে এক সত্তা, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই।

বর্তমান পদে ক্ষুদ্র বিন্দু = অহংকার ; অন্ধকারময় ক্ষুদ্র বিন্দু = সুপ্ত সংস্কার সমন্বিত অহংকার ; দ্রষ্টা বা বিষয়ী বা অহংকার উঠলেই এটা দৃশ্য, বিষয় বা অন্তঃকরণরূপে বিস্তার লাভ করে। অহংকারের উদয়ের জন্য আলোককে নিশ্চয় স্তিমিত হতে হয়। স্পষ্ট দিনের আলোয় রজ্জুকে সর্প বলে ভুল হয় না। গভীর অন্ধকারে রজ্জুও দেখা যায় না। সুতরাং সাপ বলে ভুল হওয়ার উপায় নেই। কেবল অল্প আলোয়, সন্ধ্যাকালে, ছায়াঘন স্তিমিত আলোয় কিংবা স্বল্প আলোকিত অন্ধকারে রজ্জুকে সাপ বলে ভুল হয়। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ ভাস্বর সত্তার অহংকার-রূপে জেগে ওঠার জন্য—অন্ধকারের দ্বারা আলোককে নিষ্প্রভ হতে হয়। এই অন্ধকারকেই পক্ষান্তরে 'মূলা অবিদ্যা' (আদি পাপ বা অরিজিন্যাল সিন) বলা হয়। এই মূল অবিদ্যার মধ্যে দিয়ে যে আলো যায় তাই প্রতিফলিত আলো। এই প্রতিফলিত আলোককে সাধারণতঃ পৃথক ভাবে বিশুদ্ধ মন বা ঈশ্বর বা গড্ বলে। ঈশ্বর মায়া সমন্বিত বলে সুবিদিত—অন্যভাবে প্রতিফলিত আলোকই ঈশ্বর।

অন্য নাম—বিশুদ্ধ মন—আর একটা মলিন মনেরও ইঙ্গিত করে। এটা রাজসিক বা সক্রিয় মন বা অহংকার ; এটাও আবার পূর্বের সাত্ত্বিক মনের আর একটা প্রতিফলনের অভিক্ষিপ্ত আলো ; এরূপে অহংকারও আর একটা দ্বিতীয় অন্ধকারের (অবিদ্যার) পরিণাম। তারপর তামসিক বা জড়মন অন্তঃকরণরূপে আসে ; এটাই জগতরূপে ভাসে।

স্থূল শরীরের পক্ষ থেকে বলা হয় এটা মস্তিষ্কের দ্বারা বাইরে জগতরূপে প্রকাশ হচ্ছে।

কিন্তু স্থূল শরীরটাও কেবলমাত্র মনের। মনকে চারটি করণ সমন্বিত বা চিন্তা দ্বারা গঠিত তত্ত্ব বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি ও অহংকারের সমষ্টি বলা হয়। আবার চিত্ত সমন্বিত মনও (অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি সংযুক্ত চিন্তাশক্তি) দু'ভাগে বিভক্ত (অহংকার ও মন)।

পরবর্তীক্ষেত্রে বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞানময় আত্মা) বা অহংকার বা দ্রষ্টা বিষয়ী (সাবজেক্‌ট) রূপে প্রকাশ পায় আর মনোময় কোষ বা দৃশ্য (অবজেক্‌ট) হয়।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার উৎপত্তির কারণ 'মূলা অবিদ্যা'। মনের বহির্মুখীনতার দ্বারা আর জাগ্রত ও স্বপ্নে বৃত্তি দ্বারা অভিজ্ঞতা আহরণের মাধ্যমে এবং মায়াকরণের দ্বারা নিদ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার মাধ্যমে একটা অদ্বিতীয় শক্তি ব্যক্তি ও বিশ্বের সমস্ত কর্ম পরিচালিত করছে। এগুলো সবই যেন স্বয়ং-প্রকাশ অধিষ্ঠান-চৈতন্যের ওপর প্রতিফলিত আলোকের মধ্যে ছবির মত ঘটনা-পরম্পরার প্রবাহ।

রজ্জু-সর্প যেরূপ স্পষ্ট দিনের আলোয় দেখা যায় না আবার গভীর অন্ধকারেও রজ্জুকে দেখা যায় না সেরূপ স্বভাস্বর বিশুদ্ধ সত্তারূপ সমাধিকালে কিংবা সুষুপ্তি, মূর্ছা ইত্যাদিতে জগৎ দেখা যায় না। কেবল প্রতিফলিত আলোতেই (অন্ধকার মিশ্রিত আলোকে বা অজ্ঞান মিশ্রিত জ্ঞানে) মনে হয় উৎসের অধীনরূপে জগৎ প্রকাশিত, প্রসারিত ও প্রনষ্ট হয়। জগতের বৈচিত্রও মূল উৎস সত্য থেকে স্বতন্ত্র নয়। এখানে একটা অভিনয় হয়ে যাচ্ছে যেখানে একটি একক সত্তা বহু হচ্ছে, বিষয়মুখীনতা লাভ (অবজেকটিফায়েড) করছে আবার প্রত্যাহৃত হচ্ছে। এটা করার জন্য নিশ্চয় একটা শক্তি আছে আর সেটা একটা আশ্চর্য শক্তিও বটে ! সেই শক্তি তার মূল উৎস থেকে স্বতন্ত্রও নয়। সেই স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ সত্তায় এই শক্তিকে দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও এর কার্যাবলী অতি সুস্পষ্ট। কি অপূর্ব !

তার (সেই শক্তির) অনির্বচনীয় মৌলিক ক্রিয়া (অর্থাৎ স্পন্দন) হতে সাত্ত্বিক প্রতিফলন হয় ; তার থেকে রাজসিক অহংকার ; তারপর তামসিক চিন্তাবৃত্তি যাকে সাধারণতঃ জ্ঞান বা বিবর্ধক কাঁচের মধ্যে আলোর অনুরূপ বলা হয়। যেমন কৃত্রিম আলোককে একটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে পর্দায় অভিক্ষেপ করা হয় সেরূপ প্রতিফলিত আলো চিন্তার (বিবর্ধকের) ভিতর দিয়ে গিয়ে বাইরে জগতরূপে প্রপঞ্চিত

হয় ; অধিকন্তু বীজাকার জগতই চিন্তা যা বাইরে বিশাল বিশ্বরূপে অনুভূত হয়। এমনই তার অসাধারণ শক্তি ! এইরূপে ঈশ্বর, ব্যক্তি-সত্তা ও জগৎ কেবলমাত্র প্রতিফলিত আলো যার অধিষ্ঠান একটা স্বয়ংভাস্বর একক সত্তা।

এখন, এই 'আমি'-চিন্তাটা (অহংকার) কি ? এই পরিকল্পে এটা বিষয়ী (সাবজেক্ট) না বিষয় (অবজেক্ট) ?

যেহেতু জাগ্রত ও স্বপ্নে এটা সব কিছুর সাক্ষী, অন্ততঃ আমরা তাই মনে করি, সেজন্য একে বিষয়ী বলা যায়। যা হোক বিশুদ্ধ আত্মা উপলব্ধি হলে এটা কেবলমাত্র একটা বিষয়।

এই 'আমি'-চিন্তা (অহংকার) কার ? এর অনুসন্ধানই বিচার।

'আমি' বোধ ও 'এই' বোধ একই আলোর বিচ্ছুরণ। এরা রজো ও তমোগুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রজঃ ও তমঃ ব্যতীত শুদ্ধ স্বত্ব পেতে হলে 'আমি' 'আমি' বোধকে 'এই' বোধ দ্বারা খণ্ডিত না হয়ে প্রকাশিত হতে হবে। এই শুদ্ধ অবস্থা ক্ষণিকের জন্য নিদ্রা ও জাগরণের অন্তর্বর্তীকালে উদিত হয়। যদি একে দীর্ঘায়িত করা যায় এটাই বিশ্বাতীত চেতনা (কস্‌মিক কন্‌সাশ্‌নিস্‌), এমনকি ঈশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ পরমসত্তার উপলব্ধির এই একমাত্র পথ।

আবার সুষুপ্তিতে দু'টি অভিজ্ঞতা আছে যা জাগ্রত হলে স্মরণ হয়, "আমি 'আনন্দে' ঘুমিয়েছিলাম ; কিছুই 'জানি না'।" আনন্দ ও অজ্ঞতার অভিজ্ঞতা হয়। এরূপে আমরা দেখি যে শক্তির দু'টি বিভাব (১) আবরণ (অন্ধকার) ও (২) বিক্ষেপ (নানাত্ব)। মন এই বিক্ষেপের পরিণাম।

১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

স্মৃতিচারণ

৩২৪। (১) স্কন্দাশ্রমে বাস করার সময়ে শ্রীভগবান তাঁর কাছ থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে একটা ছোট লম্বা ধরণের সাদা ব্যাঙ দেখেছিলেন। শ্রীভগবান তার দিকে চেয়ে রইলেন আর সেও তাঁর দিকে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে এক লাফ দিয়ে ঠিক শ্রীভগবানের একটা চোখের ওপর পড়ল; তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করাতে চোখটি আঘাতের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(২) দু'টি ময়ুর ছিল, তারা পাখার মত পেখম মেলে গর্বের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। একটা কেউটে সাপও তাদের খেলায় যোগ দিত আর ফণা তুলে তাদের মাঝে চলে বেড়াতো।

(৩) শ্রীভগবান বললেন যে ময়ুরটা যেই একটা সবুজ রঙের গিরগিটী দেখলে অমনি সোজা তার কাছে গিয়ে গলাটা নামিয়ে দিলে আর গিরগিটীটা গলা কামড়ে ছিঁড়ে ময়ুরকে মেরে ফেললে।

(৪) একবার রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। কাছেই একটা নেকড়ে বাঘ ছিল। সে একটা পাথর ছোঁড়াতে বাঘও ঘুরে তার দিকে ফিরলে। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিলে। শ্রীভগবানের সঙ্গে পথে দেখা হলে তিনি কি ব্যাপার জানতে চাইলেন। আয়েঙ্গার দৌড়াচ্ছিল সুতরাং কেবল 'নেকড়ে' বলে উঠল। শ্রীভগবান যেখানে জন্তুটি ছিল সেখানে গেলেন আর সেও একটু পরে চলে গেল। এসবই প্লেগের সময়ে হয়েছিল। একজোড়া কিংবা গোটা তিনেক নেকড়ে বাঘ মন্দিরের চারিপাশে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতো।

(৫) শ্রীভগবান বললেন, "ব্যাঙকে অনেক সময়ে যোগীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এরা অনেকদিন শান্ত হয়ে থাকে, গলার তলায় পাতলা চামড়ার তালে তালে নড়া ছাড়া আর কোন প্রাণের চিহ্ন থাকে না।

"আবার ব্যাঙ অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ ক'রে থাকতে পারে। বলা হয় তারা জিভ উল্টে গিলে ফেলে। জিভ উল্টে দেওয়া একটা যৌগিক প্রক্রিয়া। এতে প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। যোগী মারা যায় না কিন্তু অন্য একজনকে জিভ টেনে বার করতে হয় যার ফলে আবার প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়। কি আশ্চর্যের বিষয় যে ব্যাঙেরা গেলা জিভ নিজেরাই আবার বার করে আর সক্রিয় হয়ে ওঠে!"

১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

(৬) মালয়েলাম গদ্যে লেখা রামায়ণ 'রঘুবীরণ' পড়তে গিয়ে—সেখানে একটা অংশ ছিল যাতে বলা হয়েছে যে হনুমান স্থূল শরীরে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছাবার আগেই মনে মনে সেখানে পৌঁছে গিয়েছল। শ্রীভগবান জোর দিয়ে বললেন যে বাস্তবে কাজ হওয়ার আগে মনের প্রয়াসই সেটা সম্পূর্ণ করে।

(৭) শ্রীভগবান একটা মজার গল্প বললেন—ইড়ুথাসন একজন প্রসিদ্ধ মালয়ালী লেখক ও সাধু, সে একবার মন্দিরে যাওয়ার সময়ে কিছু মাছ কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে ঢুকেছিল। তার কোন একজন শত্রু সেটা পুরোহিতদের বলে দেয়। তাকে তল্লাসী করা হল আর রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা বললেন, "আপনি মন্দিরে মাছ নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?" সে বললে, "আমার কোন দোষ নেই। আমি কাপড়ে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্যেরাই সেটা মন্দিরে বার করলে। প্রকাশ করাতেই দোষ হয়। শরীরের অভ্যন্তরে মল থাকলে মন্দির অপবিত্র হয় না। কিন্তু মলত্যাগ করলে অপবিত্র হয়। এটাও সেই রকম।"

১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩২৫। গুন্টুর জেলার শ্রীরামশাস্ত্রী শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আটটি শ্লোক লিখে খুব আবেগের সঙ্গে পাঠ করলেন।

তারপর শাস্ত্রী মহাশয় পথ-নির্দেশের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করলেন, "আমি সংসারী, জ্ঞানমার্গের অনুপযুক্ত। সংসারের ব্যাপার আমায় বিচলিত করে, অনুগ্রহ করে কি করব বলুন?"

ম—ঈশ্বরের কথা চিন্তা কর। সংসারের ব্যাপার তাঁকে কি করে বিচলিত করবে? তুমি ও এসব তাঁতেই রয়েছে।

ভ—আমি কি নাম-স্মরণ করব? কি নাম নেব?

ম—তুমি রামশাস্ত্রী। নামটা সার্থক কর। রামের সঙ্গে এক হয়ে যাও।

১৩ই জানুয়ারী, '৯৩৭

৩২৬। একজন পুরাতন আবাসিক সেবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন—সবাই মনের চঞ্চলতার অভিযোগ করে। মনকে খুঁজে পাওয়া যাক আর তখন তারা বুঝতে পারবে। এটা সত্য যে ধ্যান করতে বসলে অজস্র চিন্তা ওঠে। মন কেবল চিন্তার সমষ্টি। এই চিন্তার ভিড় ঠেলে যাওয়া দুঃসাধ্য। যদি লোকে কোন প্রকারে আত্মায় থাকতে পারে তাহলে ভাল হয়। কিন্তু যারা পারে না তাদের জন্য জপ ও ধ্যান নির্দেশ করা হয়। এটা ঠিক যেন শুঁড়ে বইবার জন্য হাতীকে এক টুকরা শিকল দেওয়া। হাতীর শুঁড় স্বভাবতঃই চঞ্চল। সহরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে নানা দিকে শুঁড় দোলায়। তাকে যদি একটা শিকল বইতে দেওয়া হয় তার চঞ্চলতা সংযত হয়। মনও সেরূপ। যদি জপ ও ধ্যানে লাগিয়ে রাখা যায়, অন্য চিন্তা দূরে

যায়—মন একটা চিন্তায় একাগ্র হয়। এরূপে সে শান্ত হয়। এর অর্থ এই নয় যে দীর্ঘ চেষ্টা ব্যতীত শান্তি পাওয়া যায়। অন্য চিন্তা-গুলোকে দমন করতে হবে।

আর একটা দৃষ্টান্ত। মনে কর একটা গরু দুরন্তপনা করে ও পালিয়ে অন্যের ক্ষেতে চরতে যায়। তার চোরামি অভ্যাস সহজে যায় না। তাকে কি করে গোশালায় রাখা যায়, ভাবো। যদি তাকে জোর করে ধরে গোশালায় রাখা হয় তবে সে কেবল পালাবার সুযোগ খোঁজে। যদি তাকে গোশালায় ভাল ঘাস দিয়ে লোভ দেখানো যায় তবে প্রথম দিন সে এক গ্রাস খেয়ে পালাবার সুযোগ খোঁজে। দ্বিতীয় দিন দু গ্রাস খায়; এমনি ক'রে দিনের পর দিন একটু বেশী খেতে খেতে তার বদ-অভ্যাস ছেড়ে যায়। যখন তার বদ-অভ্যাস একেবারে চলে যায় তখন তাকে বেশ ছেড়ে দেওয়া যায় আর সে অন্যের ক্ষেতে যায় না। তাকে ধরে মারলেও সে আর গোশালার বাইরে যায় না। মনও সেইরূপ। চিন্তারূপ সুপ্ত বাসনার বলে সে বাইরে ঘুরতে অভ্যস্ত। যতক্ষণ ভিতরে বাসনা আছে তারা বাইরে আসবেই আর ক্ষয় হবে। চিন্তা দিয়েই মন গঠিত হয়। মনটা কি খুঁজলে চিন্তাগুলো প্রতিহত হয় আর সাধক বুঝতে পারে যে সেগুলো আত্মা থেকে ওঠে। এই চিন্তা সমষ্টিকেই আমরা 'মন' বলি। যদি লোকে উপলব্ধি করে যে চিন্তা আত্মা থেকে ওঠে আর তার (চিন্তার) উৎসে থাকে তবে মন অদৃশ্য হয়। মনের অস্তিত্ব চলে গেলে আর শান্তির আনন্দ অনুভূত হলে, এখন একজনের সমস্ত চিন্তা দূর করতে যেমন কঠিন মনে হচ্ছে, তখন মনে চিন্তা ওঠানোও তেমনি কঠিন মনে হয়। এখানে মনটা একটি দুষ্টু গরু; চিন্তাগুলো অন্যের ক্ষেত-খামার; একজনের চিন্তারহিত মূল সত্তা গোশালা।

শান্তির আনন্দ এতই মধুর যে তাকে নষ্ট করা যায় না। গভীরভাবে নিদ্রিত লোককে জাগিয়ে কাজ করতে বললে সে বিরক্তি বোধ করে। গভীর ঘুমের শান্তি এতই মনোহর যে তাকে চিন্তা-প্রসূত

কাজে বলি দেওয়া যায় না। চিন্তারহিত অবস্থাই তার মৌলিক আনন্দময় অবস্থা। চিন্তাকুল দুঃখময় অবস্থার জন্য সেরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করা কি শোচনীয় নয়?

যদি কেউ চিন্তারহিত অবস্থায় থাকতে চায় তবে একটা সংঘর্ষ অপরিহার্য। একজনকে তার আদি সহজ অবস্থা লাভ করতে হলে সংগ্রাম করে যেতে হবে। যদি সে যুদ্ধে জয়ী হয় আর লক্ষ্যে পৌঁছায় তবে শত্রু অর্থাৎ সমস্ত চিন্তা আত্মায় লয় পাবে আর একেবারে অদৃশ্য হবে। চিন্তাগুলোই শত্রু, তারাই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ। তাদের অভাবে সৃষ্টি নেই, স্রষ্টাও নেই। কেবলমাত্র আত্মানন্দের একক সত্তাই রয়েছে।)

যখন প্রহ্লাদ সমাধিতে ছিল বিষ্ণু আপনমনে ভাবলেন—

"এই অসুর সমাধিস্থ হওয়ায় সব অসুর শান্তিতে আছে। কোন যুদ্ধ নেই, কোন শক্তি পরীক্ষা নেই, শক্তির জন্য অনুসন্ধান নেই আর শক্তি পাওয়ার উপায়গুলোও নেই। শক্তি লাভের উপায়ের অভাবে যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি অর্থাৎ দেবতারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না, নবীন সৃষ্টিও হচ্ছে না, যা আছে তাদেরও কোন সার্থকতা নেই। সুতরাং আমি একে জাগিয়ে দেবো; তাহলে অসুরেরা জেগে উঠবে; তাদের মূল স্বভাব জেগে উঠবে; দেবতারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে; অসুর ও অন্যেরা শক্তির অনুসন্ধান করবে ও সেটা পাওয়ার জন্য উপায়ের সাধন করবে। যজ্ঞ ইত্যাদির উন্নতি হবে; দেবতারা সমৃদ্ধ হবে; আরও সৃষ্টি আরও সংগ্রাম আর আমারও অনেক কাজ হবে।"

সুতরাং বিষ্ণু প্রহ্লাদকে জাগালেন, তাকে জীবনমুক্তি ও অমরতা দিলেন। দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হল আর পূর্বতন ধারা পুনঃ প্রবর্তিত হল যার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের চিরাচরিত রীতি চলতে লাগল)

ভ—ঈশ্বর কি করে অসুরভাব জাগালেন আর আবহমানকাল ধরে যুদ্ধ আনলেন? ঈশ্বরের স্বভাব কি বিশুদ্ধ শুভ নয়?

ম—(শুভ একটা আপেক্ষিক বস্তু। শুভ থাকলেই অশুভের ইঙ্গিত করে ; তারা সর্বদা সহ-অবস্থিত। একটি অন্যের অপরপিঠ।)

৩২৭। হলঘরে শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তাদের মধ্যে শ্রীভগবানের একজন একান্ত ভক্ত এতই নিবিষ্ট হয়ে যায় যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে পরে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিল—

"আমি অনেকদিন ধরে 'স্রোত'টা শরীরে বা অন্য কোথাও উৎপন্ন হয় কি না খুঁজছি। হঠাৎ শরীরটা হাল্কা হয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'আমি কে?' অনুসন্ধান বেশ স্পষ্ট ও প্রবলবেগে চলছিল। কেবল একটা 'আমি'-'আমি'-'আমি' ধ্বনি ছিল। একটা বিশাল ব্যাপ্তি ছাড়া আর কিছু নেই। হলঘরের ঘটনা আভাসে বোধ হচ্ছিল। বেদপারায়ণের পর লোকেরা প্রণাম করার জন্য উঠে দাঁড়ালো বুঝলাম। ভাবলাম আমিও দাঁড়াই—চিন্তাটা তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আবার একটা ব্যাপ্তিতে হারিয়ে গেলাম। যতক্ষণ না শ্রীভগবানের কণ্ঠস্বর শুনলাম ততক্ষণ এই অনুভূতি চলতে লাগল, তাঁর কথায় ফিরে এলাম। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আধঘণ্টারও ওপর ছিল। আমি ভুলতে পারছি না। এখনও সেটা আমায় আচ্ছন্ন করে রয়েছে।"

শ্রীভগবান তার কথা শুনলেন আর কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁর মুখ থেকে দু'চারটি মন্তব্য নিঃসৃত হল—

মনে হয় একজন যেন শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শরীরটাও আমাদের একটা চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। চিন্তা না থাকলে কোন শরীর থাকে না ; শরীরের অভাবে কোন যাওয়া আসা নেই। যা হোক অভ্যস্ত স্বভাবের জন্য যেন বেরিয়ে যাওয়া মনে হয়।

শিলাবৃষ্টির একটা শিলাখণ্ড সমুদ্রের জলে পড়লে গলে গিয়ে সমুদ্রের জল, তরঙ্গ, ফেনা ইত্যাদি হয়। অনুরূপভাবে সূক্ষ্মবুদ্ধি একটা

বিন্দুর মত (অহংকার) হৃদয়ে উদিত হ'য়ে, প্রসারিত হ'য়ে অবশেষে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে হৃদয়ের সঙ্গে এক হ'য়ে যায়।

যদি দুধ সমুদ্রের মত ব্যাপকভাবে থাকে তুমি কি সমুদ্রের মত বড় হাঁ করে তা পান করতে পারবে ? তোমায় মাতৃস্তন্যের সূক্ষ্ম কৈশিক নাড়ীর মাধ্যমেই তা পান করতে হবে।

বৈষ্ণব মহাত্মা নাম্মালবার বলেছিলেন, "আমার আত্মাই তুমি।" এর তাৎপর্য কি ? "আমার আত্মোপলব্ধির আগে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এখন আত্মজ্ঞান হওয়ার পর দেখছি তুমিই আমার আত্মা।" বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সঙ্গে এটা কি করে খাপ খায় ? সুতরাং ব্যাখ্যা করা হল, "আমায় ব্যাপ্ত ক'রে তুমি অন্তর্যামীরূপে রয়েছ। সেজন্য আমি তোমার শরীরের অংশ আর তুমি এই শরীরের প্রভু (শরীরী)।"

নিজের শরীরকে আমি নই বলে পরিত্যাগ ক'রে আবার কেন আর একজনের (ঈশ্বরের) শরীর হবে ? যদি একটা শরীর আত্মা না হয়, অন্য শরীরও অনাত্মা বিশিষ্টাদ্বৈতের সমর্থকেরা ভাবে যে আনন্দ অনুভবের জন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ আমিত্ব যেন না হারায়। আহা ! আত্মা শরীর নয় কিন্তু তোমার আত্মা ঈশ্বরের শরীর ! কি হাস্যকর যুক্তি ?

কিংবা তুমি যদি নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ কর (প্রপত্তি যোগের আশ্রয় নাও) তবে তুমি নিজেকে তাঁকে দিয়ে দিয়েছ, তুমি তাঁরই আর কোন মতেই তোমার নও। তাঁর যদি আর একটা শরীরের প্রয়োজন হয় তাঁকেই খুঁজে নিতে দাও। তোমায় বলতে হবে না যে তিনি কোন একটা শরীরের প্রভু।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩২৮। একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক মেপে মেপে, ধীরে ও স্পষ্টভাবে বললেন, "কেন-ই বা লোকে সংসারের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে আর ফলে দুঃখ ভোগ করে? তারা কি মুক্ত হতে পারে না? তারা যদি আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস করে তবে অনেক স্বাধীনতা পেতে পারে।"

ম—জগতটা আধ্যাত্মিক। যেহেতু তুমি নিজেকে স্থূল শরীরের সঙ্গে এক মনে কর সেজন্য এই জগতটাকে স্থূল ও অন্যটাকে আধ্যাত্মিক বল। অন্যপক্ষে যা আছে তা কেবল আধ্যাত্মিক।

ভ—বি-দেহ আত্মাদের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহধারী জীবাত্মাদের কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অধিক স্বাধীনতা আছে?

ম—যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর বলে ভুল কর সেজন্য বিদেহ আত্মাদের সূক্ষ্মদেহধারী বলছ। এই সীমিত বোধ থেকে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা বলো আর তাদের সামর্থ্যের কথা জানতে চাও। এমনকি সেই বিদেহ আত্মাদেরও সূক্ষ্মশরীর আছে তা না হলে তুমি 'বিদেহ আত্মা' বলতে না। 'বিদেহে'র অর্থ স্থূলদেহ ব্যতীত। যেহেতু তুমি তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে বলছ সেহেতু তাদেরও একটা সূক্ষ্ম-শরীর আছে। তাদের অসামর্থ্যও তাদের অবস্থানুযায়ী হবে। তুমি যেমন তোমার সীমিত অবস্থার ভার অনুভব করছ, তারাও তাদেরটা করবে। আমি যে সত্তা ও আধ্যাত্মিক জগতের কথা বলছি সেটা আপেক্ষিক নয়, পরমসত্তা। যদি তুমি তোমার সত্তাকে উপলব্ধি কর তবে এ জগতকে স্থূল না দেখে আধ্যাত্মিক দেখবে।

ভ—তাদের শরীর কি আমাদের মত অস্থায়ী? তাদের কি পুনর্জন্ম হয়?

ম—তুমি নিজেকে শরীর মনে কর বলেই এই সব প্রশ্ন ওঠে। এই শরীরের জন্ম ও মৃত্যু আছে আর এই শরীর পড়ে গেলে

আর একটা শরীর হয়, তাকে পুনর্জন্ম বলে। কিন্তু তুমি কি শরীর? তুমি যদি বোঝো যে তুমি শরীর নও আত্মা তবে সব স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হবে আর তখন কোন সীমিতভাব থাকবে না। যেখানে কোন সীমা নেই সেখানে স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ কোথায়? পুনর্জন্মের প্রশ্নই বা কি করে উঠবে?

আবার অন্যদিক থেকে বিবেচনা করো—তুমি স্বপ্নে তোমার জন্য একটা স্বাপ্নশরীর তৈরী কর আর তাই দিয়ে কাজ কর। সেটা জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা হয়ে যায়। এখন তুমি মনে করছ যে তুমি স্বাপ্নশরীর নও, এই শরীর। তোমার স্বপ্নে স্বাপ্নশরীরের দ্বারা এই শরীরটা মিথ্যা হয়ে যায়। তবেই দেখো, দু'টি শরীরই সত্য নয়। কারণ প্রত্যেকটাই কোন একটা সময়ের জন্য সত্য আর অন্য সময়ে মিথ্যা। যা সত্য তা সর্বকালে সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি বল 'আমি'। এই 'আমি' চেতনা তিনটি অবস্থায় আছে। এতে কোন বিকার হয় না। এটাই একমাত্র সত্য। তিনটি অবস্থা মিথ্যা। এগুলো কেবল মনের অবস্থা। মনই তোমার যথার্থ স্বরূপ দর্শনের বাধা। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অনন্ত সত্তা। তোমার সুষুপ্তিতে সেই অবস্থা ছিল। অন্য দু'টি অবস্থায় তুমি নিজেকে সীমিত অনুভব কর। এই পার্থক্য কেন হয়? সুষুপ্তিতে কোন মন ছিল না কিন্তু জাগ্রত ও স্বপ্নে এটা আছে। এই সসীমতার অনুভব মনের ক্রিয়া। মনটা কি? খোঁজো। তুমি যদি একে খোঁজো তবে এ নিজেই অদৃশ্য হবে। কারণ এর কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। এটা চিন্তার সমষ্টি। চিন্তার লয় হলেই এটা অদৃশ্য হয়।

ভ—তখনও কি আমি থাকি?

ম—তোমার সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা কি? সেখানে কোন চিন্তা ছিল না, মন ছিল না, তবুও তুমি ছিলে।

ভ—যখন ধ্যানের চেষ্টা করি তখন আমার মনের চঞ্চলতার জন্য ধ্যান হয় না। কি করব?

ম—তোমার প্রশ্নেই উত্তর রয়েছে। প্রথমতঃ তোমার প্রশ্নের প্রথমার্ধে তুমি বলছ ধ্যান কর কিন্তু হয় না। 'তুমি' অর্থাৎ 'আত্মা'। কিসের ওপর ধ্যান কর? কোথায় হয় না? তবে কি দু'টি আত্মা আছে য একজন অন্যের ওপর ধ্যান করে? কোন্ আত্মাটা এখন তার অসাফল্যের অভিযোগ করছে? দু'টি আত্মা হতে পারে না। একটাই আত্মা আছে। তার ধ্যানের আবশ্যকতা নেই।

তুমি বলবে, "কিন্তু, তাহলে আনন্দ নেই কেন?" সুষুপ্তিতে তুমি যে অবস্থায় থাকো সেভাবে থাকতে কে তোমায় বাধা দিচ্ছে? তুমি নিজেই স্বীকার করছ যে মনের চঞ্চলতা বাধা। মনকে খোঁজো। যদি 'চঞ্চলতা' থেমে যায়, একেই আত্মা বলে জানা যাবে—এই তোমার 'আমি' চেতনা বা শাশ্বত সত্তা। এটা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত।

ভ—আমি কর্মব্যস্ত, ধ্যানের সময় পাই না। অন্য কোন সহায়ক কি আছে? শ্বাস সংযম কি সাহায্য করবে?

ম—প্রাণ ও মন একস্থান থেকে ওঠে। শ্বাসকে ধরে কিংবা মনকে খুঁজে মূল উৎসে পৌঁছানো যায়। যদি তুমি শেষেরটা করতে না পারো তবে প্রথমটা নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। শ্বাসের গতি লক্ষ্য করলে শ্বাস সংযত হয়।

যদি মনকে লক্ষ্য করা যায় তবে চিন্তা থেমে যায়। শান্তি আসে আর সেটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। জনক রাজা বলেছিলেন, "যে আমার 'আমিত্ব' চুরি করছে সেই চোরকে (অর্থাৎ মনকে) পেয়েছি। একে এখুনি বধ করবো।" চিন্তার জন্য অস্থিরতাই আত্মার শান্তিকে নষ্ট করে মনে হয়। অস্থিরতাই মন। এটা থেমে গেলে মন পালিয়ে গেছে বলা হয়। আত্মা নির্বিকার অধিষ্ঠান-স্বরূপ হয়ে থাকে।

আর একজন বাধা দিয়ে বললে—মনই মনকে বধ করবে।

ম—হাঁ, যদি মন বলে কিছু থাকে। অনুসন্ধান এর অস্তিত্ব-হীনতা প্রকাশ করে। যা নেই তাকে কি করে বধ করা যাবে?

ভ—মানস জপ কি বাচিক জপের থেকে ভাল নয়?

ম—বাচিক জপ শব্দ দিয়ে তৈরী। শব্দ চিন্তা থেকে ওঠে। কারণ বাক্যে কিছু প্রকাশ করতে গেলে আগে চিন্তা করতে হয়। চিন্তাই মন। সেজন্য মানস জপ বাচিক জপের থেকে ভাল।

ভ—আমরা কি জপটা ধ্যান ক'রে তাকে মুখেও উচ্চারণ করব না?

ম—জপ যখন মানস তখন শব্দের আর কি প্রয়োজন?

জপ মানস হলেই মনন হয়। ধ্যান, মনন ও মানস জপ একই। যখন চিন্তা আর এলোমেলো হয় না এবং সব চিন্তা চলে গিয়ে একটি মাত্র চিন্তা চলতে থাকে তখন তাকে মনন বলে। জপ বা ধ্যানের উদ্দেশ্য সব চিন্তা দূর ক'রে একটিতে লেগে থাকা। তারপর সেটিও তার উৎসে—পরমচেতনায় অর্থাৎ আত্মায় মিশে যায়। মন জপে লেগে থাকে আর নিজের উৎসে মিশে যায়।

ভ—বলা হয় মন মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।

ম—মস্তিষ্ক কোথায়? শরীরে। আমি বলি যে শরীরটাই মনের একটা অভিক্ষেপ। তুমি শরীরের কথা চিন্তা ক'রে মস্তিষ্কের কথা বলছ। মনটাই শরীর তৈরী করে এবং সেই মনই বলে যে মস্তিষ্কেই তার স্থান।

ভ—শ্রীভগবান তাঁর কোন রচনায় বলেছেন যে জপের উৎস খুঁজতে হবে। সেখানে কি মনকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে না?

ম—এ সবই মনের ক্রিয়া। জপ মনকে একটা চিন্তায় স্থির হতে সাহায্য করে। অন্য সব চিন্তা অদৃশ্য না হওয়া অবধি প্রথমে নিরুদ্ধ হয়। জপ যখন মানস হয় তাকে ধ্যান বলে। ধ্যানই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। যা হোক একে ধ্যান বলে কারণ এটা চেষ্টা ক'রে করতে হয়। যতক্ষণ চিন্তাগুলো বিশৃঙ্খল ততক্ষণ চেষ্টার দরকার হয়। যেহেতু

তুমি অন্য চিন্তা করছ সেজন্য একটা চিন্তাধারাকে ধ্যান বা মনন বলছ। ধ্যান যদি অনায়াস হয় তখন দেখা যাবে যে এটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

৩২৯। সকালে শ্রীভগবান তামিল 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্' পত্রিকার 'সাধ্বী এস্টেলা' প্রবন্ধের কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। তার সারার্থ—"কাম, ক্রোধ ইত্যাদি তোমার শত্রু। যদি দুঃখ পেয়েছ মনে কর তবে অন্তর্মুখীন হও আর দুঃখের কারণ অনুসন্ধান কর। এটা তোমার বাইরে নয়। বাইরের কারণগুলো কেবলমাত্র আরোপ করা হয়েছে। তুমি যদি নিজে নিজেকে দুঃখ দিতে না পারো তবে পরমকারুণিক ঈশ্বর কি তোমায় কোনরূপ দুঃখ দেন?"

শ্রীভগবান আরও বললেন যে সাধ্বী এস্টেলা একজন পরম ভক্ত, তাঁর উপদেশাবলীও যথার্থ।

৩৩০। শ্রীভগবানের হাঁপানীর জন্য গলা ভার, কমলালেবু নিবেদনের জন্য আনা হল। সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হল। শ্রীভগবানের গলা পরিষ্কার করার জন্য কমলালেবু মুখ থেকে ফেলে দিতে হল। তিনি বললেন যে এটা ফেলে দিতে হল। একজন ভদ্রলোক বললে, "এটা বোধহয় শ্রীভগবানের শরীরে সহ্য হয় না।"

ম—এটা (লেবু) অন্যে না এনে যদি তুমি আনতে তবে কি এ কথা বলতে?

১৮ই জুলাই, ১৯৩৭

৩৩১। আন্তর্জাতিক শান্তি সঙ্ঘের সভ্যা আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী রুথা জেনিংস শ্রীভগবানকে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন যে যদি একজন নিজে শান্তি পায় সেটাই তার কোন চেষ্টা ছাড়াই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যখন একজন নিজেই শান্ত নয় তখন সে কি করে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করবে ?

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি সত্য নয় যে প্রাচ্যের আত্মোপলব্ধির পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক।

ম—তুমি আত্মাই আছ। কোন বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই।

ভ—আমি এর সাধারণ তত্ত্বটা বুঝি কিন্তু তার জন্য একটা ব্যবহারিক পদ্ধতি আছে, তাকেই 'বৈজ্ঞানিক' সংজ্ঞা দিচ্ছি।

ম—এরূপ চিন্তাসমূহ থেমে যাওয়াই আত্মজ্ঞান। উদাহরণ —গলার হার যেন মনে হয় হারিয়ে গেছে। আত্মা থেকে দূরে গিয়ে কেউ জগৎ ও তার নিজের শরীর দেখে না। সে সর্বদা আত্মা হয়েই আর সব কিছু দেখে। ঈশ্বর ও জগৎ সবই হৃদয়ে। দর্শককে দেখো তাহলে সবই আত্মা মনে হবে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাও। অন্তর্মুখী হও। আত্মাকে খোঁজো। বিষয়ী ও বিষয়ের অধিষ্ঠান কে ? একে খোঁজো আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তারপর মহিলাটিকে 'আমি কে ?' পুস্তিকার কথা বলা হল। তিনিও শ্রীভগবানকে আর প্রশ্ন করার আগে বইটা পড়তে রাজী হলেন।

৩৩২। ভ—তামিলের তিনটি শূন্য (মুপ্পড়) কি ?

ম—তৎ = ঈশ্বর তুরীয়

ত্বম্ = জীব তুরীয়

অসি = অসি তুরীয়

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠান ভূমি তুরীয়।

ভ—প্রথম দু'টি বুঝেছি ; তৃতীয়টা কি ?

ম—সর্বব্যাপকতাকে জাগ্রত বলে ;
সর্বপ্রকাশকে স্বপ্ন বলে ;
অনন্তকে সুষুপ্তি বলে ;
এ তিনটির অধিষ্ঠানকে 'অসি তুরীয়' বলা হয়।

ভ—কি আশ্চর্য !

ম—এই কি সব ? ন্যায়শাস্ত্রের বিশ্লেষণের শেষ নেই। শোনো, ওরা বলে যে 'তত্ত্বমসি' বাক্য সাধারণের জন্য ; পাঁচটি শব্দের আর একটি বাক্য আছে, 'তৎ ত্বম্ অসি অতি নিজম্', এটা অত্যন্ত গূঢ় যা দক্ষিণামূর্তি মৌনের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিলেন ; ওরা এই পাঁচটি শব্দের অনুরূপ পাঁচটি অবস্থা সূত্রবদ্ধ করে।

আবার 'বিচার সাগর' দেখো ; লেখক আধারকে অধিষ্ঠান থেকে পৃথক করেছেন। তাঁর মতে রজ্জুকে সাপ মনে করা হোক বা না হোক এটা (রজ্জু) সব সময়েই আধার। রজ্জুই অধিষ্ঠান, কারণ এটা প্রকৃত যা তার থেকে পৃথক দেখায়—এটা সামান্য অধিষ্ঠান। আবার একে সাপ মনে হওয়া বিশেষ অধিষ্ঠান। তারপর প্রশ্ন তোলা হয়—জীবের অধিষ্ঠান এক আর ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অন্য ; এই দুই কি করে এক হয় ? তিনি উত্তর দিচ্ছেন, তাদের অধিষ্ঠানের আধার এক !

এর অতিরিক্ত তিনি কয়েক প্রকার খ্যাতির কথাও বলেছেন ;

(১) অসৎ-খ্যাতি—রজ্জু আছে. তাতে যে সাপ দেখা যাচ্ছে, তা নেই।

(২) সৎ-খ্যাতি—রজ্জুকেই সাপের মত মনে হচ্ছে।

(৩) আত্ম-খ্যাতি—রজ্জু দেখা গেল না, যে সাপ আগে দেখা আছে তার স্মৃতি ভ্রম সৃষ্টি করে।

(৪) অখ্যাতি—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৫) অন্যথা-খ্যাতি—সাপের কল্পনা আরোপ ক'রে মনে হয় যেন সেটা সামনে রয়েছে।

(৬) অনির্বচনীয়-খ্যাতি—যা বলা যায় না।

এখানে প্রশ্ন তুলছেন—জগৎ যদি এগুলোর একটাও, ভ্রমাত্মক অথবা অসৎ হয়. তবে এটা নিশ্চয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এটা নিশ্চয় সেই সময়ে সত্য ছিল--একবার সত্য হলে সর্বদাই সত্য হওয়া উচিত।

তিনিই উত্তর দিচ্ছেন—অভিজ্ঞতা যে সর্বদা সত্য হতেই হবে তার কোন স্থিরতা নেই; সত্য সাপ না দেখে একটা সাপের ছবি দেখে তার ধারণা হলেও একজন রজ্জুকে সাপ বলে ভুল করতে পারে। এরূপে, জগৎ সত্য হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই বাদানুবাদে সময় নষ্ট করে কি লাভ? মন অন্তর্মুখী কর, সময়ের সদোপযোগ কর।

ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ব্রহ্মের সাযুজ্য, ব্রহ্ম শোনা কথা কিন্তু ব্যক্তিসত্তা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই কাজে লাগনো যায়; অতএব তুমি কে দেখো।

তবে ঈশ্বরের কথা বলা হয় কেন?

কারণ তুমি জগৎ দেখো আর জানতে চাও যে এটা কি করে সৃষ্টি হল। ওরা বলে ইশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাকে ও আর সব সৃষ্টি করেছেন জানলে তোমার মন কিছুটা সন্তুষ্ট হয় আর আগের থেকে কম অস্থির হয়। কিন্তু এটা উপলব্ধি নয়। তুমি নিজে উপলব্ধি করলে তবেই উপলব্ধি হয়; এটাই পূর্ণতা বা আত্মজ্ঞান ইত্যাদি।

ন্যায়ের কথা বললে—'বৃত্তি প্রভাকরের' গ্রন্থকার দাবী করেন যে তিনি ৩৫০,০০০ বই পড়ে তবে এটা লিখেছেন। কি দরকার? তারা (বই) কি আত্মোপলব্ধি দিতে পারে? 'বিচার সাগর' তর্ক ও পরিভাষায় ভরা। এই বিরাট ভারী বই কি কোন কাজে আসে? তবু অনেকে পড়ে আর তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কিনা দেখার

জন্য জ্ঞানী খুঁজে বেড়ায়। বইগুলো প'ড়ে নূতন সমস্যা খুঁজে তাদের সমাধান করাই ওদের আনন্দের উৎস। এসব নিরর্থক জেনে জ্ঞানী এরূপ লোকেদের উৎসাহ দেন না। একবার প্রশ্রয় দিলে তার আর শেষ হবে না।

কেবল আত্মানুসন্ধানই কাজে লাগে।

যারা 'বৃত্তি প্রভাকর' 'বিচার সাগর' বা 'সূত্রভাষ্য' ইত্যাদি বড় বড় ন্যায়ের বই-এ অভ্যস্ত, তারা ছোট বই যেমন 'সদ্‌বিদ্যা' যাতে সোজাসুজি আত্মা সম্বন্ধে বলা আছে তাতে আনন্দ পায় না, কারণ তারা বাসনা তৈরী করে ফেলেছে। কেবল যাদের মন সরল ও শুদ্ধ, তাদেরই ছোট প্রয়োজনীয় বই-এ রুচি হয়।

৩৩৩। প্রত্যভিজ্ঞা = প্রতি + অভিজ্ঞা (স্বীকৃতি)

'অভিজ্ঞা' প্রত্যক্ষবোধ ; 'প্রতি' যা জানা আছে তাকে স্মরণ করানো।

'এটা একটা হাতী' প্রত্যক্ষ অনুভব।

'এটা সেই হাতী' প্রত্যভিজ্ঞা।

পরিভাষা পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি ও তার স্বীকৃতিকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলা হয়।

শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য সকলেরই অর্থ এক অর্থাৎ প্রকৃত সত্তা।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩৩৪। শ্রীভগবান বললেন যে পা মালিশ করলেও কোন অনুভূতি নেই। তিনি বললেন, "যদি চলার কাজটা হয়ে যায় তবে অনুভূতি না থাকলেই বা কি?" তারপর কথায় কথায় বললেন যে এক রকম আলো আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রক্ষিপ্ত হলে প্রক্ষেপককে দেখা যায় না

কিন্তু তাকে অন্য দৃশ্য-বস্তু দেখার সাহায্য করে। সিদ্ধরাও সেরূপ। তাঁরাও জ্যোতির মত অন্যদের দেখতে পান কিন্তু অন্যেরা তাদের দেখতে পায় না। দৃষ্টান্তসরূপ—প্রভুলিঙ্গের উত্তর-ভারত যাত্রার সময়ে গোরকনাথের সঙ্গে দেখা হয়। গোরকনাথ তাঁর সিদ্ধি দেখালেন যেমন তাঁর হাত তরোয়াল দিয়ে কাটা হলে তরোয়ালটা ভোঁতা হয়ে গেল কিন্তু তাঁর কোন আঘাত লাগল না। এটা 'কায়াসিদ্ধি', শরীরকে সকল আঘাত থেকে রক্ষা করার সিদ্ধি। প্রভুলিঙ্গও পরীক্ষার জন্য এগিয়ে গেলেন। যখন তাঁর শরীরে তরোয়াল বিদ্ধ করা হল তখন সেটা তাঁর শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করল যেন বাতাসের মধ্যে দিয়ে গেল আর তাঁর শরীরের কিছুই হল না। গোরক খুব অবাক হয়ে প্রভুলিঙ্গের শিষ্যত্ব নিলে।

আবার কৈলাসে একবার শিব ও পার্বতীর মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল। শিব বললেন যে আল্লামা এমন একজন যে তাঁর (পার্বতী বা শক্তির) মায়ায় মুগ্ধ হবে না। পার্বতী পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর তমোগুণকে রাজার মেয়ের রূপে আল্লামাকে ভোলাবার জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন। রাজকন্যা খুব গুণবতী হয়ে বড় হল। সে মন্দিরে গান গাইত। আল্লামা সেখানে যেত আর মৃদঙ্গ বাজাত। মেয়েটি তার বাজনায় মুগ্ধ হল। তারা প্রেমে পড়ল। তারা দুজনে মেয়েটির শয়নকক্ষে মিলিত হল। মেয়েটি আল্লামাকে আলিঙ্গন করতে গেলে সে স্পর্শের অতীত হয়ে গেল। মেয়েটি বিরহে কাতর হল। মেয়েটিকে তার কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আর একজন দিব্যকন্যাকে পাঠানো হল। সেও আল্লামাকে ভোলাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। সে শেষে কৈলাসে চলে গেল। তখন পার্বতী তাঁর সত্ত্বগুণকে পাঠালেন। সে একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিনী হয়ে জন্মালো। সে যখন আল্লামার কাছে আত্মসমর্পণ করলে তখন তার প্রকৃত মহত্ব বুঝতে পারলে।

শ্রীভগবান নয়না অর্থাৎ কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির অনেক

প্রশংসা ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বললেন যে সে কিভাবে 'উমা-সহস্রম্' 'হর-সহস্রম্' লিখেছিল, কিরূপে ছাত্রদের শিক্ষা দিত, ভট্টশ্রী নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কেমন তর্ক করেছিল, এত পাণ্ডিত্য ও সামর্থ্য ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও বিনয়ী ও নম্র ছিল।

শ্রীভগবান সঙ্গপুলাবর (কবি) নাক্কিরার শিবের কোন তামিল রচনার নিন্দা করার ফলে কিরূপ শিবের কোপে পড়েছিল, শিবের গণ তাকে কিভাবে বন্দী করেছিল ও পরে সে কি ক'রে মুক্তি পায় তার বর্ণনা করলেন।

নাক্কিরার কোন পবিত্র নদীর তীরে তপস্যা করছিল। একটা পাতা গাছ থেকে পড়ল; পাতাটা অর্ধেক জলে ও অর্ধেক ডাঙ্গায় রইল। হঠাৎ জলের অংশ মাছ হয়ে গেল আর স্থলের অংশ পাখী হয়ে গেল। দু'জনেই মাঝখানে পাতা দিয়ে জোড়া। তারা তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক বাসস্থানের দিকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। নাক্কিরার অবাক হয়ে দেখছিল, হঠাৎ একটা ভূত (শিবের গণ) এসে তাকে ধরে একটা গুহায় নিয়ে গেল, সেখানে আরও ৯৯৯ জন তপোভ্রষ্ট-বন্দী আগে থেকেই ছিল।

ভ—নাক্কিরার কি একজন তপোভ্রষ্ট?

ম—হাঁ, যখন তপস্যা করছিল তখন সে কেন তপস্যা ছেড়ে তার সামনের অদ্ভুত ঘটনা দেখতে গেল?

তিনি বলে চললেন যে সে কিভাবে 'তিরুমুরুহট্রুপ্পদাই' রচনা ক'রে হাজার জন বন্দীকে মুক্ত করেছিল।

২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩৩৫। ভ—কামভাব কি করে যায়?

ম—যখন ভেদজ্ঞান যায়।

ভ—কি করে হয়?

ম—লিঙ্গভেদ ও তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র মনের কল্পনা। উপনিষদ বলে যে আত্মা সব থেকে প্রিয় হওয়ায় তার জন্য সব কিছু প্রিয় বোধ হয়। একজনের আনন্দ অন্তরে; কেবল আত্মার জন্যই ভালবাসা হয়, এটা কেবল অন্তরে একে বাইরে মনে করো না—তা হলে ভেদজ্ঞান থাকবে না।

২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩৩৬। একজন বৈশ্য মনে হয় উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পড়েছে, সে কয়েকটা প্রশ্ন করলে—

ভ—আত্মোপলব্ধি কি করে হয়?

ম—আত্মা সর্বদা প্রত্যক্ষ-অনুভূত। এমন কোন মুহূর্ত নেই যে সে নেই। তবে আর একে কি ক'রে বিশেষভাবে নির্দেশ করা যাবে? আত্মাকে খোঁজো। তুমি তাই।

ভ—কিন্তু বলা হয় যে পরমকে পেলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় আর সব সংশয় দূর হয়। 'দৃষ্টি' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

ম—আত্মবান হওয়াই আত্মাকে দেখা। দু'টি আত্মা নেই যে একটি অন্যকে দেখবে।

পরে সে আবার সেই আত্মানুসন্ধানের প্রশ্ন করে চলল—

ভ—আত্মোপলব্ধি কি করে হয়?

ম—এটা জানাই আছে। এই সরল তথ্যটা জানলেই হল। ব্যস্।

ভ—কিন্তু আমি জানি না। কি করে জানবো?

ম—তুমি কি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর?

ভ—না, তা কি করে করা যায়।

ম—তা হলেই তো সত্যকে স্বীকার করা হল।

ভ—তবু আমি দেখতে পচ্ছি না। কি করে আত্মোপলব্ধি করবো ?

ম—খুঁজে দেখো কে 'আমি' বলে।

ভ—হাঁ। আমিই 'আমি' বলি।

ম—এই 'আমি'টা কে ? এটা কি শরীর কিংবা শরীর ছাড়া আর কেউ ?

ভ—এটা শরীর নয়। এটা শরীর ছাড়া আর কেউ।

ম—তাকে খুঁজে বার কর।

ভ—আমি করতে পারছি না। কি করে খুঁজে পাবো ?

ম—তুমি এখন শরীর সম্বন্ধে সচেতন। সুষুপ্তিতে তুমি শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকো না। তবুও সুষুপ্তিতে তুমি ছিলে। ঘুম থেকে উঠলে তুমি শরীরটা ধরো আর বল, 'আমি আত্মাকে বুঝতে পারছি না। তুমি কি ঘুমের সময়ে এরূপ বল ? তখন তুমি অখণ্ড ছিলে, তাই বলো নি। যেহেতু তুমি এখন নিজেকে শরীরে সীমিত করেছ তাই বলছ 'আমি উপলব্ধি করি না'। নিজেকে সীমিত করছ কেন আর তারপর দুঃখই বা পাচ্ছ কেন ? নিজের প্রকৃত স্বরূপ হও আর আনন্দ লাভ কর। তুমি ঘুমে 'আমি' বলনি। এখন বলছ কেন ? কারণ শরীরটাকে ধরে রয়েছ। খুঁজে দেখো এই 'আমি'টা কোথা থেকে এল। তা হলেই আত্মা উপলব্ধ হবে।

শরীরটা জড় হওয়ায় সে 'আমি' বলে না। আত্মা অনন্ত হওয়ায় সেও 'আমি' বলতে পারে না। তবে কে আমি বলে ?

ভ—তবু আমি বুঝতে পারছি না। কি করে 'আমি'কে খোঁজা যায় ?

ম—খুঁজে দেখো এই 'আমি'টা কোথা থেকে উঠছে। তাহলে এই 'আমি'টা অদৃশ্য হয়ে যাবে আর অসীম আত্মাই কেবল থাকবে। এই 'আমি'টা চেতনা ও জড়ের মধ্যে একটা গ্রন্থি। শরীরটা আমি নয়, আত্মাও 'আমি' নয়। তবে 'আমি'টা কে ?. কোথা থেকে এটা ওঠে ?

ভ—কোথা থেকে ওঠে?

ম—খোঁজো।

ভ—আমি জানি না। কৃপা করে বুঝিয়ে দিন।

ম—এটা বাইরে থেকে আসে না। এটা ভিতর থেকে আসে। কোথা হতে আসে? অন্য কোথাও হলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যেত। তোমার অন্তরে হওয়ায় তোমাকেই খুঁজতে হবে।

ভ – মাথা থেকে?

ম—'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর মাথার ধারণা হয় কিংবা আগে মাথার চিন্তা হওয়ার পর 'আমি'-চিন্তা হয়? যদি 'আমি' মাথায় থাকবে তবে ঘুম এসে গেলে সেটা ঝুলে পড়ে কেন? 'আমি' সর্বদা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং তার স্থানও সেরূপ হওয়া উচিত। মাথা যদি এক সময়ে সোজা থাকে আর অন্য সময়ে ঝুঁকে যায় তা হলে সেটা কি করে 'আমি'র স্থান হতে পারে? ঘুমের সময়ে তোমার মাথা শিথিল হয়ে যায়। জাগলে সেটা সোজা হয়ে ওঠে। এটা কি 'আমি' হতে পারে?

ভ—তবে এটা কোনটা?

ম—'আমি' অন্তর থেকে আসে। ঘুমে কোন 'আমি' নেই। ঠিক ঘুম ভাঙ্গার আগেই 'আমি'-চিন্তা হয়।

ভ—হৃদয়-গ্রন্থির স্থান বলা হয় ভ্রূমধ্যে।

ম—কেউ বলে ভ্রূমধ্যে; অন্যেরা বলে মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগে ত্রিকোণ অস্থিতে ইত্যাদি। এ সবই শরীরের পরিপ্রেক্ষিতে।

'আমি'-চিন্তার পর শরীর আসে।

ভ—কিন্তু আমি শরীরকে আমার থেকে পৃথক করতে পারি না।

ম—সুতরাং তুমি স্বীকার করছ যে তুমি শরীর নও।

ভ—এই শরীরের যন্ত্রণা হলে আমি অনুভব করি; কিন্তু অন্য শরীরের করি না। আমি শরীরের অতীত হতে পারি না।

ম—এই একাত্মবোধই এরূপ অনুভূতির কারণ। সেটাই হৃদয়-গ্রন্থি।

ভ—এই গ্রন্থি কি করে যাবে ?

ম—গ্রন্থিটা কার ? তার যাওয়াটা-ই বা চাও কেন ? সে কি চায় কিংবা তুমি চাও ?

ভ—সে বলতে পারে না ; আমিই জিজ্ঞাসা করছি।

ম—সেই 'আমি'টা কে ? যদি এটা খুঁজে পাওয়া যায়, গ্রন্থি থাকবে না।

ভ—গ্রন্থিটা শরীরের সহগামী বস্তু। জন্মানোর জন্য এই শরীর হয়। পুনর্জন্ম কি করে শেষ হবে ?

ম—কে জন্মেছে ? আত্মা কি জন্মেছে ? কিংবা শরীরটা ?

ভ—শরীরটা।

ম—তবে শরীরই জিজ্ঞাসা করুক কি করে পুনর্জন্ম রোধ হয়।

ভ—ওটা জিজ্ঞাসা করবে না, সেজন্য আমি করছি।

ম—শরীরটা কার ? সুষুপ্তিতে তুমি এটা ছাড়াই ছিলে। 'আমি'-চিন্তা ওঠার পর শরীর চিন্তা উঠেছে। প্রথম জন্ম 'আমি'-চিন্তার। 'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর শরীরের জন্ম হয়। সুতরাং এর জন্ম গৌণ। মুখ্য কারণটা ত্যাগ কর তাহলে গৌণটা আপনা হতে চলে যাবে।

ভ—'আমি'-চিন্তা ওঠা কিরূপে রোধ করা যাবে ?

ম—আত্মানুসন্ধানে।

ভ—আমি বুঝবার চেষ্টা করছি তবু পারছি না ; জপ করলে কি আত্মাকে পাবো ? তা যদি হয়, কি করে করব বলুন ?

ম—কি জপ ? কেনই বা যান্ত্রিকভাবে জপ করবে ? তোমার অন্তরে শাশ্বত স্বাভাবিক জপ হয়ে যাচ্ছে তাকে খুঁজতে পারো।

ভ—কিছু উপদেশ বোধহয় সাহায্য করবে।

ম—যদি বলি 'রাম রাম কর', যে তোমার মত এত বই নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে করবে আর লেগে থাকবে। যে এত পড়েছে, এত জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সেই তোমাকে যদি আমি করতে বলি, তুমি বেশীদিন এটা করবে না কারণ তুমি ভাববে, 'কেন এটা করব? তাছাড়া আমি কে যে মন্ত্র জপ করে যাবো? আরও কিছু করার আগে আমি কে খুঁজে দেখি', আর জপ ছেড়ে অনুসন্ধানে লাগবে।

ভ—বলা হয়—ইন্দ্রিয় বহির্মুখ (পরাঞ্চিখানি); অন্তরাবৃত্তিই দৃষ্টি (আবৃত্তচক্ষুঃ)। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' কি?

ম—এর অর্থ এই নয় যে অক্ষিগোলক উল্টে দেওয়া। চক্ষুঃ কি?

ভ—চোখ।

ম—চোখ কি দেখে কিংবা তার পিছনে কেউ দেখে? যদি চোখ দেখে তবে মৃতদেহের চোখ কি দেখে? চোখের পিছনে যে আছে সেই চোখের মধ্যে দিয়ে দেখে। 'চক্ষু' শব্দে তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ভ—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখার জন্য 'দিব্যচক্ষু' দরকার। স্থূল চোখ সাধারণ 'চক্ষু'।

ম—ও! তাই নাকি। তুমি তো দেখছি কোটি-সূর্য-প্রভা ও আর সব কিছুই দেখতে চাও!

ভ—আমরা কি কোটি-সূর্য-প্রভা ঐশ্বর্য দেখতে পারি না?

ম—একটি সূর্য কি দেখতে পারো? তবে কোটি সূর্য দেখতে চাও কেন?

ভ—দিব্যদৃষ্টি হলে সম্ভব হয়। 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো' ইত্যাদি 'তদ্ধাম পরমং মম'। অতএব একটা অবস্থা আছে যেখানে সূর্য শক্তিহীন। সেই অবস্থাই ঈশ্বরের অবস্থা।

ম—বেশ তো। কৃষ্ণকে খোঁজো সব সমাধান হয়ে যাবে।

ভ—কৃষ্ণ জীবিত নেই।

ম—গীতা থেকে বুঝি এই শিখেছ? তিনি কি বলেন নি যে তিনি শাশ্বত? তুমি কি ভাবছ, তার শরীর?

ভ—তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যারা তাঁর নিকটে ছিল তারা জ্ঞান লাভ করেছিল। আমি তাঁর মত একজন জীবিত গুরু খুঁজছি।

ম—তবে কি তাঁর তিরোভাবের পর গীতার আর কোন সার্থকতা নেই। তিনি কি তাঁর শরীরটাকে কৃষ্ণ বলেছিলেন?

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং···(আমি কখন ছিলাম না, তা নয়)।

ভ—কিন্তু আমি একজন জীবিত গুরু খুঁজছি, যিনি প্রত্যক্ষ সত্যের কথা বলতে পারেন।

ম—সে গুরুর অবস্থাও কৃষ্ণের মত হবে।

প্রশ্নকর্তা বিদায় নিলে। পরে শ্রীভগবান বললেন, দিব্যদৃষ্টির অভিপ্রায় স্বয়ংপ্রকাশ। 'দিব্য' শব্দে তাই বোঝায়। সম্পূর্ণ শব্দটা আত্মাকে বোঝায়। কে দিব্যদৃষ্টি দেবে? আর কেই বা দেখবে? আবার লোকে বই-এ পড়ে 'শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন'। তারা মনে করে আত্মজ্ঞানের পূর্বে 'সবিকল্প ও নির্বিকল্প' সমাধি হতে হবে। সেইজন্য এত প্রশ্ন। এত গোলকধাঁধায় ঘুরবে কেন? শেষে কি লাভ করে? খোঁজার কষ্টের শেষ হওয়া, এই তো। তারা দেখে আত্মা শাশ্বত আর স্বয়ংসিদ্ধ। কেনই বা তারা এই মুহূর্তে শান্তি পাবে না?

একজন সাদাসিধা লোক যে পণ্ডিত নয় সে জপ ও পূজায় সন্তুষ্ট থাকে। একজন জ্ঞানী স্বভাবতঃই সন্তুষ্ট। এই বই-এর পোকাগুলোকে নিয়ে যত বিপদ! হাঁ, হাঁ ওদেরও হবে।

৩৩৭। শ্রীকে· আর· ভি· আইয়ার—মন কি করে শুদ্ধ হয়?

ম—শাস্ত্র বলে 'কর্ম, ভক্তি ইত্যাদির দ্বারা'। আমার সেবক অনেকদিন আগে একবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। তাকে বলা

হয়েছিল, 'ঈশ্বরার্পিত কর্মের দ্বারা'। কেবলমাত্র কাজের সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে অবিরত তাঁর চিন্তা করতে হবে। তবেই মন শুদ্ধ হবে।

সেবক এটা কাজে লাগায় আর বলে, "শ্রীভগবানকে কেবল সেবা করাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে অনবরত স্মরণও করতে হবে।"

অন্য আর একজন একই প্রশ্ন করলে ভগবান তাকে বলেছিলেন, আত্মানুসন্ধানের অর্থ 'আমি-দেহ' বোধ চলে যাওয়া। (আত্মবিচার=দেহাত্মবুদ্ধি নাশ)।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৭

৩৩৮। আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী জেনিংস কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—

ভ—'আমি কে?' বিচার করা অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর-ভাবনা কি বেশী কার্যকরী নয়? ভাবনা সদর্থক অপরপক্ষে অন্যটি নঞর্থক। তাছাড়া বিচার পার্থক্য নির্দেশ করে।

ম—যতক্ষণ তুমি কি করে আত্মজ্ঞান হয় জানতে চাও, আত্মলাভের জন্য এই উপদেশ দেওয়া হয়। তোমার উপায় খোঁজাই পার্থক্য সূচিত করে।

ভ—'আমি কে?' বলার থেকে 'আমি ব্রহ্ম' বলা কি ভাল নয়?

ম—কে সমর্থন করে? এটা করার জন্য একজন কেউ আছে? তাকে খোঁজো।

ভ—বিচারের থেকে ধ্যান কি ভাল নয়?

ম—ধ্যানে মনের কল্পনা সূচিত করে, অপরপক্ষে সত্যের জন্যই বিচার করা হয়। প্রথমটি বস্তুনিষ্ঠ আর দ্বিতীয়টি আত্মনিষ্ঠ।

ভ—এই বিষয়ের একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকা উচিত।

ম—অসৎ পরিহার ও সত্য অন্বেষণই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

ভ—আমি বলতে চাই পরিহারের একটা ক্রম, প্রথমে মন তারপর বুদ্ধি আরও পরে অহংকার এরূপ কিছু থাকা উচিত।

ম—আত্মাই একমাত্র সত্য। আর সব কিছু অসৎ। মন ও বুদ্ধি তোমার থেকে পৃথক নয়।

বাইবেল বলে, "শান্ত হও আর আমি আছিকে ঈশ্বর বলে জানো।" আত্মাকে ঈশ্বর বলে উপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র শান্ত হওয়াই আবশ্যক।

ভ—পাশ্চাত্যদেশ কি কখনো এই উপদেশ বুঝবে ?

ম—স্থান ও কালের কোন প্রশ্ন নেই। বোধ মনের পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে। একজন পূর্ব বা পশ্চিমে থাকলে কি এসে যায় ?

শ্রীভগবান 'সদ্‌বিদ্যা' ও তায়ুমানাবরের কয়েকটি পদের প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। মহিলা বিদায় নিলেন।

পরে শ্রীভগবান বললেন যে সমগ্র বেদান্ত বাইবেলের দু'টি বাক্যে নিহিত আছে।

'আমি আছি যা আমি আছি' (আই অ্যাম্ দ্যাট আই অ্যাম্) আর 'শান্ত হও ও আমি আছিকে ঈশ্বর বলে জানো' (বী স্টিল এণ্ড নো দ্যাট আই অ্যাম্ গড্)।

রেলবিভাগের একজন কর্মকর্তা শ্রীকে. এস. এন. আইয়ার শ্রীভগবানকে বললেন যে 'কস্‌মিক কনশাস্‌নিসে'র সংগ্রাহক মনে করেন যে উপলব্ধি মানুষের জীবনের মাত্র বিশেষ কোন বয়সের মধ্যেই হওয়া সম্ভব।

ম—কেউ কি একথা বলে যে 'আমি একটা বয়সের আগে বা পরে অস্তিত্ববান হব'? সে নিত্য-বর্তমান। এরূপ বলা বিভ্রান্তিকর, কারণ লোকে বিশ্বাস করবে যে এ জীবনে আর উপলব্ধি

হবে না আর তাদের অন্য জীবনে চেষ্টা করতে হবে। এ সবই যুক্তিহীন।

৩৩৯। (শিব বিশিষ্টাদ্বৈত (শৈবসিদ্ধান্ত) সম্বন্ধে শ্রীভগবান বললেন—'গরুড়োঽহম্ ভাবনা'। 'আমি গরুড়'—ভাবনা করলে একজন গরুড় হয়ে যায় না। তা সত্ত্বেও সাপের বিষ কেটে যায়। সেরূপ 'শিবোঽহম্' ভাবনা। সে শিব হয়ে যায় না কিন্তু অহংকারের ধ্বংসকারী দোষ ঘুচে যায়। কিংবা লোকে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শুদ্ধ হতে পারে অর্থাৎ শিবের শরীরের একটা অংশ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। সেরূপ হলে সে পরমানন্দ লাভ করে। শৈবসিদ্ধান্ত বলে—এই মুক্তি। এতে কেবল তাদের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা বজায় রাখার ইচ্ছাই প্রকাশ পায় আর এটা কোন মতেই প্রকৃত মুক্তির অভিজ্ঞতা নয়।)

৩৪০। শ্রীবোস শুরু করলেন, "দেহ-চেতনা ফিরে এলে পরে···।"

ম—দেহ-চেতনা কি? আগে সেটা আমাদের বল। চেতনা ছাড়া তুমি আর কে? দেহ-চেতনার ফলে দেহ দেখা যায়, দেহ-চেতনা 'আমি'-চেতনা থেকে আর 'আমি'-চেতনা চেতনা থেকে ওঠে।

(চেতনা→'আমি'-চেতনা→দেহ-চেতনা→দেহ)

চেতনা সর্বদাই রয়েছে আর সেটা ছাড়া কিছুই নেই। যেটাকে তুমি এখন দেহ-চেতনা বলছ সেটা আরোপিত। যদি কেবল চেতনাই থাকে আর চেতনা ছাড়া কিছুই না থাকে তবে "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"—(আত্মার জন্য সব প্রিয় বোধ হয়)—বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয়।

একটা প্রশ্ন হয় তবে আত্মহত্যা কি করে হয়। কেন একজন এটা করে! কারণ সে দুঃখী আর দুঃখ দূর করতে চায়। শরীরটা দুঃখের কারণ হওয়ায় তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যই

এটা করে। শরীরটা হত্যা করতে একজন হত্যাকারী থাকবে তো। আত্মহত্যার পর সেই থাকে। সেটাই আত্মা।

৩৪১। শ্রীমতী জেনিংস—শ্রীভগবান বলছেন যে আত্মোপলব্ধির অবস্থা চিন্তার অত্যাচার থেকে মুক্তি। সৃষ্টির পরিকল্পে চিন্তা নিম্ন-স্তরের হলেও তার কি কোন স্থান নেই ?

ম—চিন্তা 'আমি'-চিন্তা থেকে ওঠে, সেটা আবার আত্মা থেকে ওঠে। অতএব আত্মাই 'আমি' রূপে ও অন্যান্য চিন্তারূপে প্রকাশ পায়। চিন্তা থাক বা না থাক কি এসে যায় ?

ভ—শুভ চিন্তা কি আত্মোপলব্ধির সহায়ক ? তারা কি আত্মোপলব্ধির পথের নিম্নস্তরের নির্ভরযোগ্য সহায়ক নয় ?

ম—হাঁ—এইরূপে। তারা কুচিন্তা দূরে রাখে। উপলব্ধির অবস্থায় তাদেরও চলে যেতে হবে।

ভ—সৃজনী-চিন্তাগুলো কি আত্মোপলব্ধির একটা অঙ্গ নয় আর সে কারণে তারা কি সহায়ক হয় না ?

ম—সহায়ক কেবলমাত্র আগে যা বলা হয়েছে সেইরূপে। তাদের সবই আত্মাতে লয় হতে হবে। চিন্তা, ভাল বা মন্দ, তোমায় আত্মার নিকটে না এনে দূরে নিয়ে যায়, কারণ চিন্তা থেকে আত্মা আরও অন্তরঙ্গ। তুমি আত্মা অন্যপক্ষে চিন্তাগুলো আত্মার বিষমধর্মী।

ভ—সুতরাং অবশেষে আত্মা যা তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল সেই নিজের সৃষ্টিকে গ্রাস করে নেয়। অন্যদিকে সভ্যতা যেগুলো তার উন্নতির সহায়ক সেই নিজের সৃষ্টি-সমূহকে ভুল ক'রে প্রাধান্য দেয় আর সেজন্য তাদের পৃথক করে এবং লঘু পরিধি (সর্ট্ সার্কিট) ক'রে সরল ক'রে নেয়। (অর্থাৎ এটাই তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে ধরে নেয়)।

ম—তুমি কি চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র নও ? চিন্তা ছাড়া কি তোমার অস্তিত্ব থাকে না ? কিন্তু তোমাকে ছাড়া কি চিন্তার অস্তিত্ব থাকে ?

ভ—সভ্যতা কি সাধারণভাবে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে এই আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট পথে এগিয়ে যাচ্ছে না ?

ম—সভ্যতাও পরিকল্পের নিয়মের মধ্যে। এও শেষে লয় হয়ে যাবে—যেমন অন্য সব কিছু—আত্মার উপলব্ধিতে।

ভ—একজন উচ্চ কোটির আদিম মানব কি বুদ্ধি ও চিন্তা সমন্বিত সভ্য মানুষের অপেক্ষা উপলব্ধির নিকটতর ?

ম—একজন জ্ঞানী হয়ত আদিম মানবের মত দেখতে হতে পারে, কিন্তু একজন আদিম মানব জ্ঞানী নয়।

ভ—যা কিছু হয় সবই ঈশ্বরের বিধান আর সে কারণে নিশ্চয় ভাল মনে করা কি ঠিক ?

ম—নিশ্চয় তাই। তবুও অন্য সব কিছু ও ঈশ্বর তোমার আত্মা ছাড়া পৃথক নয়। তুমি যদি আত্মা হ'য়ে থাকো তবে তাদের সম্বন্ধে চিন্তা কি করে হয় ?

ভ—শারীরিক কষ্ট যেমন পিপীলিকা, মশা, সাপ ইত্যাদির উৎপাত মেনে নেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে স্বীকার করা বা তাদের দ্বারা কষ্ট না পাওয়া কি সমর্পণ ?

ম—এরা যাই হোক, তারা কি যে দেখছে বা ভাবছে সেই তুমি থেকে পৃথক ?

শ্রোতাদের মধ্যে একজন পার্শী মহিলা বাধা দিয়ে বললে—যদি তারা পৃথক না হয় তবে তাদের দংশন কি করে অনুভব করি ?

ম—তারা কাকে কামড়ায় ? শরীরকে। তুমি শরীর নও। যতক্ষণ তুমি নিজেকে শরীর বলে নির্ধারণ কর ততক্ষণ পিঁপড়া, গাছ-পালা ইত্যাদি দেখো। যদি তুমি আত্মাতে থাকো তবে তারা আত্মার অতিরিক্ত অন্য কিছু নয়।

ভ—শরীর দংশনের জ্বালা অনুভব করে।

ম—যদি শরীর অনুভব করে তবে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে দাও। শরীর নিজের ব্যবস্থা করুক। তোমার কি এসে যায়।

আমেরিকান মহিলা আবার বললেন—সম্পূর্ণ সমর্পণের অর্থ কি পারিপার্শ্বিক সকল প্রকার কোলাহল ও অশান্তি এমন কি ধ্যানের সময়ে হলেও মেনে নেওয়া? কিংবা একান্ত বাসের জন্য আমরা কোন পাহাড়ের গুহা খুঁজব? ভগবান নিজে কি তাই করেন নি?

ম—কোন যাওয়া বা আসা নেই। বলা হয় আত্মা পঞ্চ-ভূতের দ্বারা অবিক্ষুব্ধ, অসীম ও শাশ্বত। এ স্থানান্তরে যায় না। আত্মার যাওয়ার কোন স্থানও নেই।

ভ—কিন্তু আত্মানুসন্ধানের অবস্থায় বাইরের সাহায্য নেওয়া কি আধ্যাত্মিকভাবে ন্যায্য নয়?

ম—ভুলটা হচ্ছে আত্মাকে শরীর বলে নির্ধারণ। শরীরটা যদি ভগবান হয় তুমি সেই শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু যাকে ভগবান বলে সম্বোধন করছ, তাকে জানো। সে শরীর নয়। সে আত্মা।

তিনি (মহিলা) তখন 'হরিজনে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করলেন—সেখানে বলা হয়েছে যে সবই ঈশ্বর আর মানুষের ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই ইত্যাদি।

ম—প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি, ঈশ্বর আরও যা কিছু সবই আত্মা।

ভ—তারপর তিনি শেলীর রচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে শেলী জ্ঞানী কিনা।

(মানবের পথহীন অন্তরগুহায়,
অপরূপ আছে এক সে মহিমাময়।
পাখা মেলে কল্পনা যদি সেথা যায়
ভয়ে ভীত নতজানু, প্রণমে তাহায়।
সত্তার গাম্ভীর্যে আর তাহার আলোয়
স্বপ্নকায়া ভেদি তারে করে জ্যোতির্ময়,
যবে শক্তিতেজে তার বহ্নি-সত্তা হয়॥)

ম—হাঁ। কবিতাটি সুন্দর। সে যা লিখেছে নিশ্চয় অনুভব করেছে।

মহিলাটি শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন ও বিদায় নিলেন।

৩৪২। রাত্রি ১১টার সময়ে একদল আন্ধ্র গুণ্টুর থেকে এল। তার মধ্যে একজন বিষণ্ণ অথচ দৃঢ়চেতা মধ্যবয়স্কা মহিলা, তার মা ও দু'জন লোক ছিল। তারা শ্রীভগবানের দর্শন প্রার্থনা করলে।

মহিলাটি শ্রীভগবানকে বললে—

"ছেলেটি গর্ভে থাকতে স্বামীর দেহান্ত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। পাঁচ বছর অবধি বেশ স্বাস্থ্যবান ছিল। তারপর পক্ষাঘাত হয়। ন'বছর বয়সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সে কান্তিমান ও প্রফুল্ল ছিল। এরকম প্রায় দু'বছর ছিল, এখন লোকে বলছে যে সে মারা গেছে। আমি জানি সে ঘুমাচ্ছে আর এখুনি জেগে উঠবে। ওরা যখন বললে যে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে আমার প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আমি দেখলাম যে একজন সাধু তার শরীর স্পর্শ করলেন আর ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল। আমার বিশ্বাস যে আপনিই সেই সাধু। কৃপা করে এসে একবার স্পর্শ করুন, ছেলেটি জেগে উঠুক", সে প্রার্থনা করলে।

শ্রীভগবান ডাক্তারের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন।

মহিলা উত্তর দিলে, "তারা বলে মারা গেছে। কিন্তু তারা কি জানে? আমি ছেলেটিকে গুণ্টুর থেকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলে, "কি করে? মৃতদেহ কি এখানে আনা হয়েছে?"

মহিলা—ওরা বললে যে প্রতি মাইল দেড় টাকা বিশেষ মাশুল দিয়ে দেহটি নিয়ে যাওয়া যাবে। আমি এর জন্য ১৫০ টাকা দিয়েছি আর মাল হিসাবে নিয়ে এসেছি।

ম—যদি তোমার দর্শন ঠিক হয় ছেলেটি আগামীকাল জেগে উঠবে।

মহিলা—একবার কৃপা ক'রে স্পর্শ করুন। আশ্রমের ভিতরে তাকে নিয়ে আসব?

অন্যেরা আপত্তি করলে আর তাদের ফিরে যেতে প্ররোচিত করলে।

তারা চলে গেল আর পরেরদিন খবর পাওয়া গেল যে দেহটি দাহ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীভগবান বললেন—কোন কোন মহাত্মা মৃতের জীবন দিতে পারেন বলা হয়। তাঁরাও আবার সবার জীবন দিতে পারেন না। তা যদি হত তবে আর জগৎ থাকত না, মৃত্যু ও শ্মশান ইত্যাদিও থাকত না।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—মায়ের বিশ্বাস দেখার মত। সে কি করে এরূপ আশ্চর্যজনক দর্শন করলে আর তা সত্ত্বেও নিরাশ হল? এটা কি তার পুত্রস্নেহের আনুষঙ্গিক অধ্যারোপ?

ম—সে ও তার ছেলে যদি সত্য না হয় কেবল দর্শনটি অধ্যারোপ কি করে হয়?

ভ—তবে এর ব্যাখ্যা কি?

কোন উত্তর হল না।

৩৪৩। ভ—শ্রীমদ্‌গীতা বলে যে আত্মা শরীর থেকে পৃথক তবে হাত কেটে ফেললেও একজন সে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকতে পারে।

ম—আঘাতের ব্যথা অনুভব না করা কি জ্ঞান?

ভ—সেকি যন্ত্রণা সম্বন্ধে অনবহিত থাকবে না?

ম—অজ্ঞান ক'রে বড় বড় অস্ত্রোপচার করা হয়, রোগী তখন যন্ত্রণা অনুভব করে না, তবে কি সেই সময়ে সে 'জ্ঞান'ও লাভ করে? ব্যথা অনুভব না করা 'জ্ঞান' নয়।

ভ—একজন জ্ঞানী কি যন্ত্রণা সম্বন্ধে অনুভূতিহীন নন?

ম—শরীরের যন্ত্রণা দেহ-চেতনা থেকে হয়; দেহ-চেতনার অভাবে এটা নেই। মন শরীর সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ায় এর সুখ ও দুঃখ বিষয়ে সচেতন নয়। 'যোগবাশিষ্ঠে' ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যান পড়, সেখানে মৃত্যুকেও মনের একটা ক্রিয়া বলা হয়েছে।

যন্ত্রণাবোধ অহংকারের ওপর নির্ভর করে; সেটা (যন্ত্রণাবোধ) 'আমি' ছাড়া নয়, কিন্তু 'আমি' সেটা (যন্ত্রণাবোধ) ছাড়া থাকতে পারে।

৩৪৪। ভ—'বিচার সাগর' বলে আত্মোপলব্ধির চারটি বাধা আছে।

ম—কেবল চারটি কেন? কেউ বলে ন'টি। সুষুপ্তি তার মধ্যে একটা। সুষুপ্তি কি? এটা জাগৃতির অপরপিঠ। এটা জাগৃতি থেকে স্বতন্ত্র নয়। সুষুপ্তি অবিমিশ্র আত্মা। নিজেকে জাগ্রত মনে কোরো না—সুষুপ্তি থাকবে না কিংবা তিনটি অবস্থাও থাকবে না। আত্মাকে ভুলেই তুমি বল যে তুমি স্বপ্ন দেখেছ। আত্মার অভাবে কি অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকে? তাকে ছেড়ে দাও কেন আর অনাত্ম-বস্তু ধরেই বা থাকো কেন?

(যখনই মন বহির্মুখী হতে চায় তাকে তৎক্ষণাৎ অন্তর্মুখী কর। বাইরে সুখ খোঁজার অভ্যাসের জন্য এটা বহির্মুখী হয়; কিন্তু বাইরের বস্তুগুলো যে সুখের কারণ নয় এই জ্ঞান তাকে সংযত করবে। এটাই বৈরাগ্য বা অনাসক্তি। কেবল প্রকৃত বৈরাগ্য হলেই মন স্থির হয়।

মন জ্ঞান ও অজ্ঞানের বা জাগৃতি ও সুষুপ্তির একটা সংমিশ্রণ। এটা পাঁচভাবে কাজ করে—

ক্ষিপ্ত—ক্রিয়াশীল

মূঢ়—জড়

বিক্ষিপ্ত—চঞ্চল

কাষায়—সুপ্ত

একাগ্র—একমুখী

এর মধ্যে কাষায় সুপ্ত সংস্কার আর এটা (কাষায়) স্বয়ং আসক্তি, বিরক্তি ইত্যাদি সংস্কার নয়।

তুমি নিজেই আনন্দময়, তবে কেন, 'আঃ! কি আনন্দময়!' বলে এটা উপভোগ করবে? এটা রসাস্বাদ।

বিবাহ উৎসবে একজন কুমারী কন্যা পুরুষের আলিঙ্গনের অনুভূতি ছাড়াই কনে হয়ে আনন্দ পায়; এটা রসাস্বাদ।

ভ—জীবনমুক্তিই আনন্দ···

শ্রীভগবান বাধা দিয়ে বললেন—শাস্ত্রের কথা বোলো না। জীবনমুক্তি কি? আনন্দ কি? মুক্তির সম্বন্ধেই সংশয় আছে। এসব বাক্য কি? এরা কি আত্মা ছাড়া স্বতন্ত্র?

ভ—আমাদের এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

ম—যা নেই তা আদৌ নেই; যা আছে তা সর্বদা আছে, নিত্য-বর্তমান। এটাই সনাতন বিধি। উদাহরণ—গলার হার।

৩৪৫। শ্রীভগবান একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—মনকে খুঁজে এর শক্তি ক্ষয় কর। মনকে পরীক্ষা করলে এর ক্রিয়া আপনা হতে থেমে যায়।

মনের উৎস খোঁজা আর একটা পদ্ধতি। উৎসকে ঈশ্বর, আত্মা বা চেতনা বলা যায়।

একটা চিন্তায় একাগ্র হলে অন্য চিন্তা অদৃশ্য হয়ে যায়; অবশেষে সেই চিন্তাও চলে যায়। চিন্তাকে সংযত করার সময়ে সচেতন থাকতে হবে, তা না হলে ঘুম এসে যাবে।

ভ—কি করে মনকে খোঁজা যায়?

ম—শ্বাস-সংযম একটা সহায়ক হতে পারে তবে এটা লক্ষ্যে নিয়ে যায় না। যান্ত্রিকভাবে এটা করার সময়ে সজাগ থাকতে হবে

ও 'আমি'-চিন্তাকে স্মরণ ক'রে তার উৎস খুঁজতে হবে। তাহলে দেখবে যে শ্বাস যেখানে মিলিয়ে যায় সেখান থেকেই 'আমি'-চিন্তা ওঠে। এরা একই সঙ্গে মিলিয়ে যায় আর ওঠে। 'আমি'-চিন্তাটা শ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। এর সাথে সাথে একটা জ্যোতির্ময় অসীম 'আমি'-'আমি' বোধ প্রকাশ হবে আর এটা নিরবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হবে। সেটাই লক্ষ্য। এর অনেক নাম ঈশ্বর, আত্মা, কুণ্ডলিনী, চেতনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

চেষ্টা করলেই এটা স্বয়ং তোমাকে লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।

৩৪৬। যতদিন শরীর আছে ততদিন পুরুষকার ও দৈব আছে কিন্তু জ্ঞান দুই-এর অতীত, কারণ আত্মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত।

৩৪৭। মন চিন্তার সমষ্টি। একজন চিন্তক থাকার জন্য চিন্তা ওঠে। চিন্তক অহংকার। অহংকারকে খুঁজলে সে আপনাহতে অদৃশ্য হয়। অহংকার ও মন এক। অহংকারই মূল চিন্তা যা হতে আর সব চিন্তা ওঠে।

৩৪৮। ভ—এমন সময় আসে যখন জাগতিক পরিবেশ, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি একটা অস্পষ্ট, প্রায়-স্বচ্ছ, অনেকটা স্বপ্নের মত দেখায়। মনে হয় যেন তাদের আর বাইরে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আভাসে তাদের অস্তিত্বের বোধ আছে, যদিও সে সময়ে সক্রিয়ভাবে কোন আমিত্বের বোধ থাকে না। মনে একটা গভীর শান্তির অনুভূতি হয়। এটাই কি অন্তরে ডুবে যাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়? কিংবা এটা একটা আত্ম-সম্মোহন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা? ক্ষণিক শান্তি লাভের জন্য একে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত?

ম—মনের শান্ত অবস্থায় একটা চেতনা আছে; এটাই সেই যথার্থ অবস্থা যাকে লক্ষ্য করতে হবে। এ অবস্থায় একে আত্মা বলে না বুঝে প্রশ্ন করা থেকেই বোঝা যায় যে এই অবস্থা দৃঢ় নয়, ক্ষণিক মাত্র।

মনকে বহির্মুখীনতা থেকে ফিরিয়ে অন্তর্মুখীন ক'রে বাহ্যিক ওপরের স্তর থেকে নীচে ডুবিয়ে দেওয়াতে 'ডুবে যাওয়া' শব্দটি যথার্থ হয়। কিন্তু যখন চেতনাকে বাধা না দিয়ে পরম প্রশান্তি থাকে তখন আর ডোবার প্রয়োজন কোথায়? যদি সেই অবস্থাকে আত্মা বলে উপলব্ধি না হয়, সেটা করার চেষ্টাকে 'ডুবে যাওয়া' বলা যায়। সেকারণে ঐ অবস্থাকে উপলব্ধি বা ডুবে যাওয়ার পক্ষে উপযোগী বলা যায়। এরূপে শেষের দু'টি প্রশ্ন অবান্তর।

ভ—হয়ত কোন এক সময়ে শিশুরূপকে আদর্শের মূর্তরূপ বলে উপযোগ করার জন্য মন এখনও শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই দুর্বলতা কি করে যাবে?

ম—আত্মাকে ধরো। শিশুদের চিন্তা করা ও তার প্রতিক্রিয়া ভাবার কি প্রয়োজন?

ভ—তিরুভন্নমালাই-এ এই তৃতীয় বার আসাতে মনে হয় অহংকার ভাবটা আরও প্রবল হয়েছে আর ধ্যানের বাধা হচ্ছে। এটা কি একটা তুচ্ছ সাময়িক অবস্থা যা চলে যাবে কিংবা আমার এরূপ স্থান পরিহার করা উচিত, তার সঙ্কেত?

ম—এটা কল্পিত। এই স্থান বা অন্য স্থান তোমার ভিতরে। যাতে মনের ক্রিয়ার সঙ্গে স্থানের কোন সম্বন্ধ না থাকে সেজন্য এই কল্পনাগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। তোমার পরিবেশ তোমার ইচ্ছাধীন নয়, এটা যা হওয়ার তাই হচ্ছে। তুমি এর উপরে ওঠো আর এতে জড়িয়ে পড়ো না।

৩৪৯। শ্রীশঙ্করাচার্যের বিচারমার্গে

মুক্তিপথ

শ্রীমহর্ষির সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

('দি ভিসন' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় শ্রীরমণ মহর্ষির শ্রীশঙ্করের 'বিবেক চূড়ামণি'র অনুবাদের প্রাক্‌কথনটি শ্রীএস. কৃষ্ণ এম. এ. দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়)।

এ জগতে প্রত্যেকেই দুঃখলেশহীন আনন্দে থাকতে চায় ; যা তার প্রকৃত স্বরূপ নয় সেই সকল ব্যাধি মুক্ত হয়ে নীরোগ শরীর ধারণ করতে চায়। অধিকন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক ভালবাসে—আর আনন্দের অভাবে এই প্রীতিও সম্ভব নয়। সুষুপ্তিতে সব কিছুর অভাব থাকা সত্ত্বেও আনন্দের অনুভূতি আছে। তথাপি নিজের প্রকৃত আনন্দময় স্বরূপের অজ্ঞতার জন্য লোকে আনন্দ পাওয়ার সঠিক পথটি পরিত্যাগ ক'রে বস্তুতান্ত্রিক জীবনের বিশাল সমুদ্রে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে আর ইহলোক ও পরলোকের সুখভোগই আনন্দের পথ এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

একটি নিরাপদ পথ-নির্দেশক :—দুঃখের বিষয় যে দুঃখ-লেশহীন আনন্দের উপলব্ধি নেই। ঠিক এই কারণে সরল পথ নিদর্শনের জন্য পরমেশ্বর শিব শঙ্করাচার্যরূপে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লেখেন যাতে এই পরমানন্দের প্রশস্তি করেছেন এবং নিজের জীবনেও এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যাই হোক, মুক্তির আনন্দ লাভে ইচ্ছুক অথচ এগুলো পড়ার মত পাণ্ডিত্যশূন্য মুমুক্ষুদের এই ভাষ্যগুলো কোন কাজে লাগে না।

এরূপ লোকেদের জন্য শ্রীশঙ্কর ভাষ্যগুলোর নির্যাস ছোট গ্রন্থ 'বিবেক চূড়ামণি'তে প্রকাশ করেছেন, মুমুক্ষুদের যে সকল বিষয় বুঝতে হবে সেগুলোর বিশদ ব্যাখা করেছেন আর তাদের জন্য ঋজু ও প্রকৃত পথ নির্দেশ করেছেন।

পাণ্ডিত্যে হবে না :—শ্রীশঙ্কর তাঁর গ্রন্থটি এই বলে আরম্ভ

করেছেন যে মনুষ্যজন্ম দুর্লভ আর এটি লাভ করলে মুক্তির আনন্দ, যা একজনের নিজের স্বরূপ, সেটা লাভের চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা এই আনন্দ লাভ হয় আবার জ্ঞান কেবলমাত্র বিচার বা দৃঢ়-অনুসন্ধানের দ্বারা লাভ হয়। এই অনুসন্ধানের প্রণালী জানার জন্য শ্রীশঙ্কর বলেছেন যে গুরুকৃপা লাভ হওয়া চাই এবং তারপর সদ্‌গুরু ও প্রকৃত শিষ্যের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন ও শিষ্য কি মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে আচার্যসমীপে উপস্থিত হবে ও তাঁকে সেবা করবে তাও বলেছেন। তিনি মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তার ওপর জোর দিয়েছেন। কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠে মুক্তিলাভ হয় না, সেটা শ্রবণ বা শ্রদ্ধাসহকারে গুরু-উপদেশ শোনা, মনন বা গভীরভাবে চিন্তা করা আর নিদিধ্যাসন বা দৃঢ়তার সহিত আত্মায় অবস্থানের সাধনার দ্বারা লাভ হয়।

তিনটি পথ :—তিনটি শরীর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এরা অনাত্মা ও অসত্য। আত্মা বা 'আমি' এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অজ্ঞানের জন্য আত্মার অনুভূতি বা 'আমিত্ব'বোধ যা আত্মা নয় তার ওপর আরোপিত হয়, আর এটাই বন্ধন। যেহেতু অজ্ঞান থেকে বন্ধন হয় সেজন্য জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। গুরুর নিকট এটা জানাই শ্রবণ।

সূক্ষ্ম অনুসন্ধান বা গভীরভাবে চিন্তা যাকে মনন বলা হয় সেটা পঞ্চকোষাত্মক (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) তিনটি শরীরকে 'আমি' নয় বিবেচনা ক'রে ত্যাগ করা, আর 'আমি কে?'-রূপ সূক্ষ্ম বিচারে এই তিনটি হতে পৃথক যা সার্বিক অস্তিত্বরূপে হৃদয়ে অহম্ বা 'আমি' রূপে আছে, তাকে দূর্বাঘাসের শিষের মত পৃথক ক'রে সঠিকভাবে আবিষ্কার করা। এই 'আমি'কেই (শাস্ত্রের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের) 'ত্বম্' বলা হয়। এই সূক্ষ্ম বিচার প্রণালীই মনন বা গভীরভাবে চিন্তা করা।

পরমানন্দ :—নামরূপাত্মক জগৎ 'সৎ' বা ব্রহ্মের উপাধি ;

ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় এর পৃথক সত্তা অস্বীকার ক'রে কেবল ব্রহ্ম ব'লে স্বীকার করা হয়। গুরু শিষ্যকে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য উপদেশ দেন, তাতে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপদিষ্ট হয়। (তদুপরন্তু শিষ্যকে অহং ব্রহ্ম—'আমি'র পরমানন্দে স্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও পুরাতন সংস্কারসমূহ অবিরত অত্যুগ্রভাবে অঙ্কুরিত হয় ও (পরমানন্দ অবস্থার) বাধা সৃষ্টি করে। এই সংস্কারসমূহ তিন প্রকার (লোকবাসনা বা যশকামনা, শাস্ত্রবাসনা বা পাণ্ডিত্যের ইচ্ছা ও দেহবাসনা বা নীরোগ হয়ে থাকার ইচ্ছা) আর এদের মূল অহংকার। অহংকার রজোগুণের বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা বহির্মুখী হয়ে ও তমোগুণের আবরক শক্তির দ্বারা ভেদ সৃষ্টি ক'রে বৃদ্ধি পায়।

মনের মন্থন :—যতক্ষণ না এই শক্তিগুলো ক্ষয় হয় ততক্ষণ দৃঢ়তার সঙ্গে মনকে হৃদয়ে স্থির করা আর অবিচল ও অবিরাম প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রকৃত চেতনা যা আত্মার স্বরূপ তার সম্বন্ধে সচেতন থাকাই 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' ও 'ব্রহ্মৈবাহম্' বাক্য দু'টির তাৎপর্য, একেই নিদিধ্যাসন বা আত্মানুসন্ধান অর্থাৎ আত্মস্থিতি বলে। একেই অন্যভাবে ভক্তি, যোগ বা ধ্যান বলে।)

আত্মানুসন্ধানকে নবনী প্রাপ্তির জন্য দধিমন্থনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, মনই মন্থনদণ্ড, হৃদয় দধি আর আত্মাতে একাগ্রতার সাধনাকে মন্থনক্রিয়া বলে। যেমন দধিমন্থনে নবনী লাভ হয়, অগ্নি মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয় তেমনি অবিরল তৈলধারার মত প্রমাদশূন্য আত্মনিষ্ঠায় নির্বিকল্প সমাধির অটল স্বরূপ প্রকাশ হয়। এর ফলে সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যা স্থান ও কালের অতীত এবং একাধারে জ্ঞান ও আনন্দ, সেই অপরোক্ষ, অব্যাহত, সর্বব্যাপী ব্রহ্মানুভূতি হয়।

অসীম আনন্দ :—এই অনুভূতিই আত্মজ্ঞান। এটি লাভ হলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, অজ্ঞানের অসৎ কল্পনা, অনাদি কুবাসনা যাকে হৃদয়গ্রন্থি বলা হয় তা নষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় আর কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়।

এরূপে 'বিবেক চূড়ামণি'তে শ্রীশঙ্কর যা মোক্ষের অসীম আনন্দ, যা সংশয় ও দ্বৈতবোধের অতীত সেই সমাধির বর্ণনা করেছেন আর তৎসঙ্গে তার উপলব্ধির জন্য পথের নির্দেশও দিয়েছেন। দ্বৈতবোধহীন এই অবস্থা প্রাপ্তিই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য, আর যিনি এটি লাভ করেছেন তিনিই জীবনমুক্ত। যারা কেবলমাত্র পুরুষার্থের সিদ্ধান্তগত তাৎপর্য অথবা মানবের প্রয়াসের লক্ষ্য ও কাম্য জানে তারা জীবনমুক্ত নয়।

অন্তিম মুক্তি :—এরূপে জীবনমুক্তের বর্ণনা ক'রে শ্রীশঙ্কর তাকে কর্মত্রয় (সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ) হতে মুক্ত বলেছেন। তারপর শিষ্য এই অবস্থা লাভ ক'রে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছে। মুক্তপুরুষ স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারে আর দেহত্যাগ হলে বিদেহমুক্তি লাভ করে, তাকে আর "এই জন্ম গ্রহণ করতে হয় না যা মৃত্যুরই নামান্তর"।

শ্রীশঙ্কর মুক্তিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ মুক্তি দু'প্রকার পূর্বকথিত জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। তদতিরিক্ত এই গুরু-শিষ্য সংবাদের মাধ্যমে তিনি আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৫০। একজন শ্রদ্ধাবান উকিল ভক্ত শ্রীজি. সম্মুগমকে বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বললেন—

(শাস্ত্র বলে, আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য একজনকে বারো বছর গুরুসেবা করতে হবে। গুরু কি করেন? তিনি কি হাতে তুলে জ্ঞান দেন? আত্মা কি সর্বদা অনুভূত নয়? তবে প্রচলিত বিশ্বাসের অর্থ কি?) মানুষ সর্বদাই আত্মা তথাপি সে তা জানে না। সে অনাত্মবস্তু যথা শরীর ইত্যাদির সঙ্গে একে ভুল নির্ধারণ করে। এই

ভ্রম অজ্ঞানের জন্য হয়। অজ্ঞান দূর হলে ভ্রমেরও নিবৃত্তি হবে আর প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশ পাবে। (জ্ঞানীর সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে তার অজ্ঞান ক্রমশঃ দূর হয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এরূপে শাশ্বত আত্মা প্রকাশ পায়।)

অষ্টাবক্র ও জনকের কাহিনীর তাৎপর্যও তাই। কাহিনীটি বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে। আমাদের নাম ও বিবরণে কোন প্রয়োজন নেই। তত্ত্ব বা মূলটা না ভুললেই হল। (শিষ্য গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার অর্থ শিষ্যের ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র থাকে না। সমর্পণ সম্পূর্ণ হলে ব্যক্তিত্বের বোধ সম্পূর্ণরূপে চলে যায় আর এরূপে কোন দুঃখ থাকে না। শাশ্বত সত্তা কেবল আনন্দময়। সেটা প্রকাশ পায়।)

এটা ঠিকমত না বুঝে লোকে ভাবে যে গুরু শিষ্যকে 'তত্ত্বমসি' উপদেশ করেন আর শিষ্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব করে। তারা তাদের অজ্ঞতাবশতঃ ব্রহ্মকে একটা বিরাট শক্তিমান কিছু ভাবে। (একটা সীমিত 'আমি'তেই মানুষ এত বন্ধনগ্রস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। যদি সেই 'আমি'টা বিরাট হয় তাহলে না জানি কি হবে? তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা বিরাট পরিমাণে বাড়বে! এই মিথ্যা 'আমি'টা নষ্ট হতে হবে। গুরু সেবার ফলে এর নাশ হয়। জ্ঞান শাশ্বত, এটা গুরু কিছু নূতন ক'রে এনে দেন না। তিনি কেবল অজ্ঞান দূর করেন। ব্যস্।)

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৫১। সালেমের অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রমণীয় আইয়ার একটা লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনালেন, যাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে একজনকে (জগৎ অনিত্য জানতে হবে, জাগতিক সুখকে অকিঞ্চিৎকর বুঝতে হবে, এজন্য সে এ সকল হতে অনীহাবশতঃ বিমুখ হবে, ইন্দ্রিয় দমন করবে আর আত্মার ওপর ধ্যান ক'রে তাকে লাভ করবে।)

শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—জগৎ যে অনিত্য তা জানবে কি করে? একটা নিত্য বস্তু লাভ না হলে জগতের অনিত্যতা অনুভূত হয় না। যেহেতু মানুষ নিজেই আত্মা আর আত্মাই শাশ্বত সত্য সেজন্য তার মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করা হয় ও তাকে নিত্য সত্য আত্মার দিকে মনোযোগ দিতে বলা হয়।

বিভিন্ন মতবাদ

৩৫২। চিন্তাই বিষয়ী ও বিষয়রূপে উদয় হয়। একমাত্র 'আমি'কে ধরে থাকলে এরা সব অদৃশ্য হয়। এটাই যথেষ্ট, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক অধিকারীই তা পারে।

অন্যেরা তর্ক করে, "তা তো হল। কিন্তু জগতটা আমার ঘুমের সময়ে থাকে, আমার জন্মের আগেও ছিল আর মৃত্যুর পরও থাকবে। অন্যেরা কি এটা দেখে না? যদি আমার অহংকার না থাকে তবে জগতের লয় হয় কি করে?" এরূপ লোকেদের সন্তুষ্ট করার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিভিন্ন মতবাদের প্রয়োজন হয়।

ভ—তা সত্ত্বেও এগুলো কেবল বৌদ্ধিক হওয়ায় এরা মনকে অন্তর্মুখী করতে পারে না।

ম—ঠিক এজন্যই শাস্ত্রে 'আবৃত্তচক্ষু' 'লক্ষ্যদৃষ্টি' ইত্যাদি বলা হয়েছে।

আত্মা সর্বদা আত্মাই আছে, তবে কেবল 'ধীরই' বা কেন জ্ঞান লাভ করবে? এর অর্থ কি একজন সাহসী ব্যক্তি? না; ধীঃ= বুদ্ধি; রঃ=রক্ষা; পালন। সুতরাং 'ধীর' সেই ব্যক্তি যে একবারও ছেড়ে না দিয়ে সর্বদা মনকে অন্তর্মুখী করে রাখে।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৫৩। ভ—তুরীয় কি?

ম—মাত্র তিনটি জাগ্রতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা আছে। তুরীয় চতুর্থ অবস্থা নয়—এটা এই তিনটির অধিষ্ঠান। কিন্তু লোকে এটা সহজে বোঝে না। সেজন্য বলা হয় যে এটা চতুর্থ অবস্থা আর একমাত্র সত্য। বস্তুতঃ এটা (তুরীয়) অন্যগুলো হতে পৃথক নয় কারণ এটা সকল ব্যাপারের আধার, এটাই একমাত্র সত্য, তোমার নিজস্ব সত্তা। তিনটি অবস্থা এর ওপর ক্ষণস্থায়ী ব্যাপাররূপে উদিত হয় আর এতেই ডুবে যায়। সুতরাং তারা অসৎ।

সিনেমার ছবিগুলো পর্দার ওপর কেবল কতগুলো ছায়া মাত্র। তারা আবির্ভূত হয়; সামনে পিছনে যায় আসে; একটা থেকে পরিবর্তিত হয়ে অন্য হয়; সুতরাং অসৎ, অন্যপক্ষে পর্দা সর্বদাই অপরিবর্তনীয় থাকে। অনুরূপভাবে অঙ্কিত ছবিগুলোতে—ছবিগুলো অসৎ আর পটটা সত্য। আমাদের পক্ষেও তাই—অন্তরে বা বাইরে জগৎ-ব্যাপার কেবল ক্ষণস্থায়ী, আমাদের আত্মা ছাড়া সতন্ত্র নয়। কেবল সেগুলোকে সত্য ও আমাদের বাইরে বলে দেখার অভ্যাসের জন্যই তারা আমাদের প্রকৃত সত্তা আবরিত করে আর অন্যদের দেখায়। নিত্যসিদ্ধ একমাত্র সত্যস্বরূপ আত্মা লাভ হলে, তারা যে আত্মা ছাড়া অতিরিক্ত নয় এই উপলব্ধির ফলে সব অসৎ বস্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তুরীয় আত্মারই আর এক নাম। জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেও আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নই। তথাপি আত্মা নিত্য-বর্তমান, এটাই একমাত্র সত্য। এর অতিরিক্ত আর কিছু নেই। যতক্ষণ শরীরকে 'আমি' বলে নির্ধারণ আছে ততক্ষণ জগৎ আমাদের বাইরে মনে হয়। আত্মাকে জানলেই তারা আর রয়েছে বলে মনে হবে না।

৩৫৪। একজন আমেরিকান থিওসফিষ্ট মহিলা জিজ্ঞাসা করলে— কি উপায়ে আমি আমার গুরুর আরও নিকটে যেতে পারি?

ম—এখন তাঁর কাছ থেকে কত দূরে আছ?

ভ—আমি দূরে রয়েছি। কিন্তু কাছে যেতে চাই।

ম—যদি প্রথমে নিজেকে জানো তবে অন্যজন কত দূরে আছেন বুঝতে পারবে। এখন তুমি কে? তুমি কি ব্যক্তিত্ব?

ভ—হাঁ, আমি ব্যক্তিত্ব।

ম—এই ব্যক্তিতা কি আত্মার অতিরিক্ত?

ভ—অনেক সময়ে।

ম—কোন্ সময়ে?

ভ—আমি বলতে চাই, কখন কখন ঝলকের মত সত্য দর্শন হয়, অন্য সময়ে থাকে না।

ম—কে এই ঝলক দেখে?

ভ—আমি, অর্থাৎ আমার ব্যক্তিত্ব।

ম—এই ব্যক্তিতা কি নিজেকে আত্মা ছাড়া পৃথক বলে সচেতন?

ভ—কোন্ আত্মা?

ম—কাকে তুমি তোমার ব্যক্তিতা বলে মনে কর?

ভ—নিম্ন চেতনাকে।

ম—তবে জিজ্ঞাসা করি, এই নিম্ন চেতনা কি উচ্চ চেতনা ছাড়াই নিজের সম্বন্ধে সচেতন?

ভ—হাঁ, কোন কোন সময়ে।

ম—উপস্থিত কে নিজেকে গুরুর কাছ থেকে দূরে অনুভব করছে?

ভ—উচ্চ চেতনা।

ম—উচ্চ চেতনার কি একটা শরীর আছে আর সেকি বলে গুরু তার থেকে দূরে রয়েছে? সেকি তোমার মুখ দিয়ে বলে? তুমি কি তার থেকে পৃথক?

ভ—আপনি কি আমাকে কৃপা করে এরূপ উপদেশ দিতে পারেন যাতে আমি শরীর ব্যতীত যেমন নিদ্রায় যা করি সে বিষয়ে সচেতন থাকতে পারি ?

ম—চেতনা তোমার স্বরূপ। সুষুপ্তি কিংবা জাগৃতিতে এটা এক। এটা নূতন ক'রে আর কি পাওয়া যাবে ?

ভ—আমি কিন্তু নিদ্রায় কিভাবে কি করেছি জানি না।

ম—কে বলে 'আমি জানি না ?'

ভ—আমি এখন বলছি।

ম—তুমি একই ছিলে ; তবে ঘুমে সে কথা বলোনি কেন ?

ভ—আমি ঘুমে কি বলেছি জানি না।

ম—তুমি জাগ্রত অবস্থায় বলছ, 'আমি জানি, আমি মনে করি'। সেই ব্যক্তিত্বই বলছে, 'আমি জানি না—আমি ঘুমে মনে করতে পারি না'। এ প্রশ্নটা ঘুমের সময়ে ওঠে না কেন ?

ভ—ঘুমে কি হয় আমি জানি না। সেজন্যই জিজ্ঞাসা করছি।

ম—ঘুমের অবস্থার প্রশ্ন ঘুমেই তোলা উচিত। সেটা জাগ্রত অবস্থাকে প্রভাবিত করে না, আর সেজন্য এখন এই প্রশ্ন করার কোন স্পষ্ট কারণ নেই।

বস্তুতঃ ঘুমে কোন উপাধি নেই সুতরাং কোন প্রশ্ন ওঠে না। অন্যপক্ষে এখন তুমি উপাধি নিয়েছ, নিজেকে শরীরের সঙ্গে এক বলে মনে কর আর এরূপ প্রশ্ন ওঠে।

ভ—আমি বুঝতে পারছি কিন্তু অনুভব করতে পারছি না (অর্থাৎ নানাত্বে একত্ববোধ হচ্ছে না)।

ম—তুমি বৈচিত্র্যে আছ, তাই বলছ একত্ব বুঝি—তোমার ঝলকের মত দর্শন হয় ইত্যাদি, কিছু জানি ইত্যাদি ; তুমি নানাত্বকে সত্য মনে কর। অপরপক্ষে একত্বই সত্য আর নানাত্ব মিথ্যা। এই নানাত্ব না গেলে একত্বের সত্যতা প্রকাশ হয় না। এটি সদা সত্য।

এই মিথ্যা বৈচিত্র্যের মধ্যে এটা ঝলকরূপে অস্তিত্ব প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে নানাত্ব সত্যকে আবৃত করে।

তারপর অন্য একজন সেই আলোচনা চালাতে লাগল।

ম—অজ্ঞান দূর করাই সাধনার লক্ষ্য, জ্ঞান লাভ নয়। জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ, নিত্যবর্তমান। যদি নূতন করে পেতে হত, তবে বলতে হয় এটা এক সময়ে ছিল না আবার আর এক সময়ে এল। সেক্ষেত্রে এটা স্থায়ী নয় অতএব প্রয়াসযোগ্যও নয়। কিন্তু জ্ঞান নিত্য, শাশ্বত ও নিত্যবর্তমান।

ভ—অজ্ঞান দূর হওয়ার জন্য কৃপার প্রয়োজন।

ম—নিশ্চয়। কিন্তু কৃপা সব সময়ে আছে। কৃপাই আত্মা। এটা কিছু পেতে হয় না। এটা যে আছে সেটা জানাই আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য কেবল জ্যোতির্ময়, তার কাছে অন্ধকার বলে কিছু নেই। অপরপক্ষে অন্যরাই বলে যে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়। অনুরূপভাবে অজ্ঞান একটা অলীক বস্তু, সত্য নয়। অসৎ হওয়ার কারণে তার অসৎ স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়, সেজন্য বলা হয় যে দূর করতে হবে।

আবার সূর্য রয়েছে আর সে সর্বদাই উজ্জ্বল। সূর্যের আলো তোমাকে ঘিরে রয়েছে। তবু সূর্য দেখতে হলে তার দিকে তোমার চোখ ফিরাতে হবে আর তাকে দেখতে হবে। সেইরূপ কৃপা যদিও নিত্যবর্তমান তবু সাধনা করেই লাভ হয়।

ভ—আশা করি অনবরত সমর্পণের ইচ্ছায় উত্তরোত্তর কৃপা অনুভূত হয়।

ম—একই বারে সর্বথা সমর্পণ ক'রে সকল ইচ্ছার ইতি করে দাও। যতক্ষণ কর্তৃত্ববোধ থাকে ততক্ষণ ইচ্ছাও আছে; আর সেটাই ব্যক্তিতা। এটি গেলেই আত্মা বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পাচ্ছে দেখা যায়।

কর্তৃত্ববোধই বন্ধন, কাজগুলো নয়।

'শান্ত হও, আর আমি আছিকে ঈশ্বর বলে জানো,' এই

শান্ত হওয়ার অর্থ ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র না রেখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শান্তি বিরাজ করবে আর মনের চাঞ্চল্য থাকবে না। মনের চঞ্চলতাই ইচ্ছার মূল উৎস, কর্তৃত্ববোধ ও ব্যক্তিতা। সেটা থেমে গেলেই শান্তি) এখানে 'জানা'র অর্থ 'হওয়া'। এটা যেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটি আছে সেরূপ আপেক্ষিক জ্ঞান নয়।

ভ—'আমি ঈশ্বর' বা 'আমি ব্রহ্ম' চিন্তায় কি উপকার হয়?

ম—'আমি আছি যা আমি আছি', 'আমি আছি'ই ঈশ্বর—'আমি ঈশ্বর' চিন্তা করা নয়। 'আমি আছি' উপলব্ধি কর, 'আমি আছি' চিন্তা করো না। 'আমি আছিকে ঈশ্বর বলে জানো'—এই কথাই বলা হয়েছে, 'আমি ঈশ্বর চিন্তা কর,' বলা হয়নি।

পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—বলা হয়েছে 'আমি আছি যা আমি আছি' (আই অ্যাম্ দ্যাট্ আই অ্যাম্)। তার অর্থ একজন 'আমি'তে থাকবে। সে সর্বদাই কেবলমাত্র 'আমি'। সে এছাড়া আর কিছু নয়। তবুও সে জিজ্ঞাসা করে 'আমি কে?' একজন ভ্রমে পতিত ব্যক্তিই 'আমি কে?' জিজ্ঞাসা করবে আর একজন যে নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন সে করবে না। অনাত্ম-বস্তুর সঙ্গে ভুল নির্ধারণ করার ফলেই তোমার 'আমি কে?' জিজ্ঞাসা হয়।

আরও পরে—তিরুভন্নমালাই আসার অনেক পথ আছে কিন্তু যে পথই নেওয়া হোক তিরুভন্নমালাই একই থাকে। অনুরূপ-ভাবে ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা অনুসারে উপলব্ধির পথ ভিন্ন হয়। তথাপি আত্মা একই। কিন্তু কেউ যদি তিরুভন্নমালই-এ পৌঁছে পথ জিজ্ঞাসা করে তবে সেটা যুক্তিহীন। সেইরূপ আত্মা হ'য়ে কেউ যদি কি করে আত্মোপলব্ধি করবো জিজ্ঞাসা করে তবে সেটাও অর্থহীন। তুমিই আত্মা। আত্মা হয়ে থাকো। ব্যস্। বর্তমানে শরীরকে আত্মা বলে ভুল নির্ধারণ করার জন্যই প্রশ্ন ওঠে। এটা অজ্ঞান। এটা যেতে হবে। এটা চলে গেলে আত্মাই একমাত্র 'আছে'।

৩৫৫। ভ—একজন জ্ঞানী নিরক্ষর হওয়া অপেক্ষা শিক্ষিত হলে কি জগতের আরও বেশী উপকার হয় না?

ম—একজন পণ্ডিতও একজন নিরক্ষর জ্ঞানীর কাছে অবনত হয়।

নিরক্ষরতা অজ্ঞান—শিক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অজ্ঞান। তারা দু'জনেই তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ; অপরপক্ষে জ্ঞানীর কোন কাম্য না থাকায় সে অজ্ঞান নয়।

৩৫৬। ভ—জগতে নিদ্রা আছে কেন?

ম—কেবল পাপের জন্য।

ভ—এটা কি নষ্ট করা যায়?

ম—হাঁ।

ভ—লোকে বলে, এটা নিজেকে অনুভব করিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ম—তবে আর ঈশ্বরকে ভক্তি করে কেন?

ভ—নিদ্রা কি করে যায়?

ম—তার ক্রিয়া ও প্রভাবকে গ্রাহ্য করো না।

ভ—কি করে পারা যাবে?

ম—আত্মানুসন্ধানের দ্বারা।

স্মৃতিচারণ

৩৫৭। শ্রীভগবান তাঁর তিরুভন্নমালাই-এ থাকাকালীন কিছু ঘটনার কথা বলছিলেন—

(১) একদিন তাঁকে পাতায় ক'রে কিছু একটা চেটে খেতে দেওয়া হয়েছিল। বলা হল এটা হজমের পক্ষে ভাল। তিনি চেটে খেলেন। তারপর তিনি ভোজন করলেন। কিছুক্ষণ পরে, যারা তাঁর

সামনে বসেছিল তাদের সবাইকে তেজোময় মনে হয়েছিল। এই অনুভূতি কিছুক্ষণ পরে চলে গিয়েছিল।

(২) তিনি যখন পবলকুনরুতে ছিলেন, একবার তিনি একটা পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান করবেন মনস্থ করলেন। পালানীস্বামীকে সে কথা জানানো হল। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, জটাপদ্মনাভস্বামীও পাহাড়ে বাস করত, সে পালানীস্বামীর সঙ্গে কথা ব'লে শ্রীভগবানকে তার কুটিরের নিকট পাহাড়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলে। পালানীস্বামী শ্রীভগবানকে না বলে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেল। তাঁর জন্য সেখানে বিরাট আয়োজন অপেক্ষা করছিল। তাঁর বসার জন্য একটা বেদী করা হয়েছিল, দুধ, ফল নিবেদন করা হল আর জে. পি. (জটাপদ্মনাভ) তাঁকে খুব আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে।

(৩) 'আত্মজ্ঞান' বই-এ যদিও দেখানো হয়েছে যে জে. পি. শ্রীভগবানের ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তার ছেলেমানুষিগুলো অনেক সময়ে নষ্টামি বলে ভুল করা হয়েছে। তার একমাত্র দুর্বলতা ছিল যে সে শ্রীভগবানকে মূলধন ক'রে কিছু অর্থোপার্জনের চেষ্টা করত, যা মহর্ষি মোটেই পছন্দ করতেন না। এছাড়া জে. পির আর কোন দোষ ছিল না।

(৪) সেবক মাধবস্বামী জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীভগবান কি মন্দিরের পাতাললিঙ্গে অনেক দিন না খেয়ে কাটিয়েছেন ?

ম—হুঁ ! হুঁ !—খাবার আসত—দুধ, ফল—কিন্তু খাওয়ার কথা কে ভাবত !

(৫) যখন আম্রকানন গুহায় ছিলেন তখন শ্রীভগবান মন্দিরের দেবমূর্তির জন্য পদ্ম, কলকে ফুল ও পাতা দিয়ে মালা গাঁথতেন।

(৬) কল্যাণমণ্ডপম্ তৈরী হওয়ার পর শ্রীভগবান একদিন সেখানে চুপিচুপি রাত কাটিয়েছিলেন।

(৭) যখন মন্দিরের বাগানে গাছের তলায় ছিলেন তাঁর শরীর ধূলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ তখন তিনি মোটেই স্নান করতেন না। ডিসেম্বর মাসের শীতের রাত্রে পা মুড়ে তার ভিতর মাথা গুঁজে রাত কাটাতেন। সকালে তাঁর শরীর হিম ও ধূলায় সাদা দেখাতো। কিছুক্ষণ পরে সেটা রৌদ্রে শুকিয়ে কালো দেখাতো।

(৮) পাহাড়ে থাকতে শ্রীভগবান জে. পিকে তার পূজায় সাহায্য করতেন, ঘণ্টা বাজাতেন, পূজার বাসন মাজা ইত্যাদি করতেন, কিন্তু মৌন ছিলেন। লোকেরা ওষুধের জন্য এলে তিনি মালেয়ালাম 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম্' আয়ুর্বেদের বই পড়ে অপর সাধুকে ওষুধ দেখিয়ে দিতেন। সেই সাধু নিজে সে বই পড়তে পারত না।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৫৮। হলঘরের একটি দৃশ্য—তখন রাত্রি ৮টা ২০ মিনিট। শ্রীভগবান রাত্রের ভোজন সেরে সোফায় শুলেন। ঘরে আবছা আলো, তিনজন লোক মেঝেতে বসে আছে, একজন একটা পত্রিকা থেকে কিছু নকল করছে ; অন্যজন গভীর ধ্যানে মগ্ন ; তৃতীয় জনের কিছু করার নেই, এদিক-ওদিক দেখছে। মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের গলা পরিষ্কারের শব্দ ছাড়া ঘরটি নিস্তব্ধ।

সেবক মাধবস্বামী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, হাতে পানের পাতা। সে টেবিলের কাছে এল। শ্রীভগবান হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন তাকে দেখে মৃদুস্বরে ডাকলেন, "ইস্-স্ ; কি করছ ?"

সেবক ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "কিছু না", পানটা টেবিলে রেখে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

ম—"আমার চাই না।" (সেবক ধীরে ধীরে মাটিতে বসল।) শ্রী.ভগবান—"কস্তুরী বড়ি, রোজ দিনের পর দিন। শিশি খালি হয়ে যাবে—আরও আনাও। আমার চাই না।"

ভ—বেশ কৌশলে সকালের 'ওল্লপত্রিদা' তরকারিটার ওপর দোষারোপ ক'রে—এর জন্যই শ্রীভগবানের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

ম—"না—না—সেটা ঠিক ছিল। বেশ ভালই হয়েছিল।" আবার নীরবতা, কেবল উদ্গার ও গলা ঝাড়ার শব্দ। আরও কয়েক মিনিট পরে সেবক বেরিয়ে গেল আর একটা শিশি নিয়ে ফিরে এল, শ্রীভগবানের কাছে গিয়ে একটা বড়ি বার করে বললে, "জীরা বড়ি।" ভগবান মৃদুস্বরে বললেন, "এতে লেবুর রস আছে, লেবুর রস এর পক্ষে ভাল নয়।" ইতিমধ্যে ধ্যানরত ভক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেছে, সে দেখছে। সেবক তখনও বড়িটা ধরে আছে। শ্রীভগবান বলে চললেন, "কে এটা চিবোবে?"

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার—"চিবোতে হবে না। মুখে রেখে চুষলেই হবে।" সেবকও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলে, "হাঁ-হাঁ—এটা চুষলেই হবে।"

ম—"ওকে দাও", রঙ্গস্বামীকে দেখিয়ে, "ওই চিবিয়ে কিংবা চুষে খেয়ে ফেলুক। আমার চাই না।"

সেবক নিরাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ল; আবার উঠে পড়ল।

ম—"এ!—এ! কি করছ? আমার চাই না।" সেবক ওষুধের আলমারির কাছে গিয়ে স্বগতভাবে বললে, "কস্তুরী বড়ি—এটাতে কাজ হবে।" শ্রীভগবান—"ওটা ছাড়াই আমি একটু পরে ভাল হয়ে যাবো। বার করো না। এ!—এ!—রেখে দাও—তুমি যাই করো না—আমি খাবো না।" সেবক আবার বসে পড়ল আর শুয়ে পড়ার আগে অবধি সবাই নীরবে রইলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৫৯। সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা শ্রীভগবান জলখাবারের পর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পদানন্দ গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা বেশ, দর্শন হল···এবার যাই।" শ্রীভগবান হেসে বললেন, "কার দর্শন? তুমি আমাকে দর্শন দিলে বলো না কেন?"

প্রায় ৯টার সময়ে পুনার ভক্ত (শ্রীপারখী) নমস্কার ক'রে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা ক'রে তার রচিত অষ্টকটি পড়লে। পদটির শেষে শীঘ্র মুক্তির (ঝটিতি মুক্তি) প্রার্থনা ছিল; ভক্ত সেটার ওপর জোর দিলে।

ম—মুক্তি কিছু ভবিষ্যতে লাভ হয় না। সেটা সব সময়েই আছে, নিত্য-বর্তমান।

ভ—স্বীকার করছি, কিন্তু আমার উপলব্ধি হয় না।

ম—উপলব্ধিও নিত্যবর্তমান। কেউ নিজের আত্মাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভ—তার অর্থ অস্তিত্ব, আনন্দ নয়।

ম—অস্তিত্ব = আনন্দ = সত্তা। মুক্তি শব্দটা বড়ই বিরক্তিকর। কেন লোকে এটা চাইবে? সে বিশ্বাস করে যে বন্ধন আছে, তাই মুক্তি চায়। কিন্তু বস্তুতঃ কোন বন্ধন নেই, কেবল মুক্তিই আছে। তবে আর একটা নাম-ই বা দেওয়া কেন আর চাওয়া-ই বা কেন?

ভ—সত্য—কিন্তু আমরা অজ্ঞান।

ম—কেবল অজ্ঞানটা দূর কর। কেবল এটাই যা করতে হবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৬০। লক্ষ্ণৌ-এর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি শ্রীপল ব্রান্টনকে লিখেছেন যে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর স্ত্রী যে শান্তি পেয়েছিলেন তা নষ্ট হয়ে গেছে ; সুতরাং শ্রীভগবান যেন কৃপা ক'রে তাঁকে আবার শান্তি দেন।

শ্রীভগবানকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, "যে শান্তি পাওয়া গিয়েছিল মনের দুর্বলতার জন্য পরে তা নষ্ট হয়ে যায়।"

৩৬১। যে মহিলা শ্রীভগবানকে প্রতিদিন ভিক্ষা দেয় তার ছেলে মুদালিয়ারস্বামী একটি চমকপ্রদ গল্প বললে—

যখন শ্রীভগবান বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলেন, একদিন শ্রীভগবান ও সে স্কন্দাশ্রমের পিছনে বেড়াচ্ছিলেন। সেখানে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু একটা বিরাট পাথর ছিল ; মাঝখানে ফাটা—একটি ছোট মেয়ে (মেষপালিকা) সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। শ্রীভগবান তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, "আমার একটা ভেড়া এখানে পিছিলে পড়ে গেছে ; তাই কাঁদছি।" শ্রীভগবান ফাটলের মধ্যে নেমে গিয়ে ভেড়াটাকে কাঁধে নিয়ে উঠে এসে মেয়েটিকে দিয়েছিলেন। মুদলিয়ারস্বামী বলে যে কোন মানুষের পক্ষে সেখানে নেমে উঠে আসা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

৩৬২। নেলোর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুব্বারামিয়া মুক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

ম—মুক্তি সম্বন্ধে সব প্রশ্নই অস্বীকার্য ; কারণ মুক্তির অর্থ বন্ধন থেকে উদ্ধার, আর তাহলে বর্তমান অবস্থাটা বন্ধন বলে মেনে নিতে হয়। কোন বন্ধন নেই, অতএব মুক্তিও নেই।

ভ—শাস্ত্র মুক্তি ও তার ক্রম সম্বন্ধে বলে।

ম—শাস্ত্র জ্ঞানীর জন্য নয় কারণ তাদের প্রয়োজন নেই ; অজ্ঞানীরাও শাস্ত্র চায় না। কেবল মুমুক্ষুদেরই শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তার অর্থ, শাস্ত্র জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর জন্য নয়।

ভ—বশিষ্ঠকে জীবনমুক্ত অপরপক্ষে জনককে বিদেহমুক্ত বলা হয়।

ম—বশিষ্ঠ জনকের কথা বলে কি হবে? একজনের নিজের কথা কি?

আজ এখানে কয়েকজন নবাগত ছিল। তার মধ্যে দু'জন শ্রীভগবানের কাছে গণপতি মুনির কথা বলছিল। শ্রীভগবান তাদের কথার মধ্যে দু'চারটি কথা বললেন—

(১) অনেকে বলে জ্ঞান ও উপাসনারূপ দু'টি পাখার দ্বারা মুক্তির কাছে উড়ে যাওয়া যায়। জ্ঞান কি? উপাসনা কি? জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ। সেটাই লক্ষ্য। যখন কোন চেষ্টা করা হয়, সেই প্রয়াসকে উপাসনা বলে ; যখন সেটা অনায়াস হয় সেটাই জ্ঞান, তাই মুক্তি।

(২) নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনার পর একজন দর্শনার্থী বললেন—আমাদের বাইরের অবস্থাকে অনুকূল করার জন্য কোন একটি উচ্চশক্তির সাহায্য প্রয়োজন।

শ্রীভগবান বললেন—বাহ্যবস্তু দেখে কে? কিংবা তারা কি বলে যে তারা আছে? তবে জগৎ এসে বলুক যে সে আছে।

আবার জগৎ যদি অন্তরের প্রতিফলন হয় তবে বলতে হবে যে এটা 'আমি'-চিন্তার সঙ্গে যুগপৎ ভাবে প্রতিফলিত হয়।

দু'ভাবেই 'আমি'টা মূল আধার, একে জানলেই সব জানা হয়ে যায়।

(৩) আর একজন বললে গণপতি মুনি বলতেন যে তিনি বরং ইন্দ্রলোকে গিয়ে ইন্দ্র কি করছেন দেখে আসতে পারেন কিন্তু অন্তরে গিয়ে 'আমি'কে খুঁজতে পারেন না।

শ্রীভগবান যোগ করলেন যে গণপতি মুনি বলত যে সামনের দিকে যাওয়া সোজা কিন্তু পিছনের দিকে ফেরা কঠিন।

তারপর শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—যতদূরেই একজন যাক না কেন সেখানেও সে আছে। পিছনে ফেরা কোথায়? এই সত্যটাই ঈশোপনিষদের মন্ত্রে বলা হয়েছে।

(৪) গণপতি মুনির আশুকবি হওয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, বলা হয় যে, সে যখন তপস্যা করছিল তখন শিব আবির্ভূত হয়ে তাকে দুধ কিংবা মধুপান করতে দেন, তার ফলে সে আশুকবি হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৬৩। মাদ্রাজ সরকারের রাজস্ব উপসচিব ইউরোপীয় সিভিলিয়ান শ্রীডড্‌ওয়েল সস্ত্রীক দুপুর ১টার সময়ে এসে ৩টা অবধি হলঘরে ছিলেন।

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—পাশ্চাত্য দেশের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকেরা বলেন যে ভারতই আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। ভারতের মহাত্মাদের পরস্পরের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে? কিংবা দুই দেশের মহাত্মাদের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে?

ম—তুমি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বলতে কি বোঝো?

ভ—কেন্দ্র বলতে যেখানে আধ্যাত্মিক পরিচালক-বৃন্দ থাকেন।

ম—'আধ্যাত্মিক পরিচালক-বৃন্দ' বলতে কি বোঝো?

ভ—পাশ্চাত্য দেশে একটা সন্ধিক্ষণ এসেছে। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এটা এখন ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানো হচ্ছে। একে গঠনমূলক কাজে লাগাবার জন্য একটা চেষ্টা চলছে। যখন এটা করা হবে তখন জগতের কল্যাণ হবে। এই আন্দোলনের নেতারাই ত্রাণকর্তা।

ম—'আধ্যাত্মিক নেতা' বলতে আমরা বুঝি যারা 'বাস্তববাদী' নয়, 'অধ্যাত্মবাদী'। আত্মা অসীম ও নিরাকার। সুতরাং কেন্দ্রও সেরূপ। এরূপ কেন্দ্র একটাই আছে। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যাই হোক কেন্দ্রের কোন পার্থক্য হয় না; কিংবা এর কোন বিশিষ্ট স্থিতি নেই। অসীম হওয়ায় নেতারা, মানুষ, জগৎ, ধ্বংসকারী বা সংগঠনকারী শক্তি সবই এর অন্তর্গত। কোন বিভেদ নেই। তুমি যোগাযোগের কথা বলছ কারণ তুমি আধ্যাত্মিক নায়কদের শরীরী ভাবছ। আধ্যাত্মিক মানব শরীর নয়; তারা তাদের শরীর সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা কেবল আত্মা, অসীম ও নিরাকার। তাদের ও সকলের মধ্যে একত্ব আছে কেবল তাই নয়, তাদের মধ্যেই সব সম্মিলিত রয়েছে।

সত্তাই আত্মা। যদি আত্মাকে জানা যায় তবে এ সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

আডেয়ারের শ্রীমতী জিনরাজাদাস—আত্মজ্ঞান শুনতে সহজ মনে হয়; কিন্তু সাধন করা বড় শক্ত।

ম—এর থেকে সহজ আর কি হতে পারে? আত্মা সব থেকে অন্তরঙ্গ। যদি এটাই জানা না যায়; তবে যা পৃথক ও দূরে তাকে কি করে জানা যায়?

ভ—আত্মজ্ঞান বড়ই বিভ্রান্তিকর। একে কি করে স্থায়ী করা যায়?

ম—আত্মা কখনও বিভ্রান্তিকর হতে পারে না। এটাই এক মাত্র সত্য। যার আবির্ভাব আছে তার তিরোভাব হয় সুতরাং সেটা অনিত্য। আত্মার কখনো উদয় বা বিলয় হয় না সুতরাং সেটা নিত্য।

ভ—হাঁ—সত্য। আপনি জানেন বোধহয়, থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে তারা পথনির্দেশনার জন্য গুরুবর্গের ধ্যান করে।

ম—গুরু অন্তরে। তিনি যে বাইরে এই ভুল ধারণারূপ অজ্ঞান দূর করার জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। তিনি যদি কোন অপরিচিত

কেউ হন যাঁর আবির্ভাবের জন্য তুমি অপেক্ষা করছ, তবে তিনি অন্তর্ধান করতে বাধ্য। এরূপ ক্ষণস্থায়ী সত্তায় কি লাভ?

যা হোক যতক্ষণ নিজেকে একজন ব্যক্তি বলে মনে করছ বা নিজেকে শরীরী মনে করছ ততক্ষণ গুরুর প্রয়োজন আছে, আর তিনিও শরীরীরূপেই আসবেন। যখন এই ভুল নির্ধারণ থেমে যাবে তখন আত্মাই গুরু বলে বোঝা যাবে।

'কৈবল্য'তে একটা পদ আছে—

"জন্মজন্মান্তরে আত্মারূপে অন্তরে থাকি'
    রক্ষা করেছ স্বামী,
আজ তব কৃপাগুণে গুরুরূপে দেখা দিলে
    হে অন্তরযামী!"

সুষুপ্তিতে কি হয়, দেখ। সেখানে অহংকার নেই, ভারত নেই, কোন মুমুক্ষু সাধক নেই, কোন গুরু ইত্যাদিও নেই, তা সত্ত্বেও তুমি থাকো—এবং আনন্দেই থাকো।

অহংকার, ভারত, সাধক ইত্যাদি এখন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো তোমার অতিরিক্তও নয় আর তোমার নিরপেক্ষও নয়।

ভোটের ছুটির জন্য দর্শনার্থীদের একটি বড় দল ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন আলোচনায় যোগ দিলে।

একজন পুনর্জন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে।

ম—যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই পুনর্জন্ম। এখনও জন্ম হয়নি, আগেও ছিল না বা পরেও হবে না, এটাই সত্য।

ভ—অহংকার-সত্তা কি?

ম—অহংকার-সত্তা উদয় হয় আর অস্ত যায়, এটা ক্ষণস্থায়ী, অপরপক্ষে প্রকৃত আত্মা নিত্যস্থির। যদিও তুমি প্রকৃতপক্ষে আত্মা তথাপি অহংকার-সত্তাকে প্রকৃত আত্মারূপে ভুল নির্ধারণ করছ।

ভ—এই ভুল কি করে এল?

ম—দেখ, এটা এসেছে কিনা।

ভ—একজনকে অহংকার থেকে শুদ্ধ আত্মায় যেতে হবে।

ম—অহংকারটা আদৌ নেই।

ভ—তবে এটা আমাদের দুর্ভোগ ভোগায় কেন?

ম—দুর্ভোগটা কার? এটাও একটা কল্পনা। সুখ দুঃখ কেবল অহংকারের।

ভ—জগৎ এত অজ্ঞানাচ্ছন্ন কেন?

ম—নিজের ব্যবস্থা করো। জগৎ নিজেরটা করবে। নিজের আত্মাকে দেখো। তুমি যদি শরীর হও তবে স্থূল জগতও আছে। তুমি যদি আত্মা হও সবই কেবল আত্মা।

ভ—এটা না হয় একজনের পক্ষে হল; কিন্তু বাকী সবার কি হবে?

ম—আগে এটা করো তারপর প্রশ্ন থাকে কিনা দেখা যাবে।

ভ—অবিদ্যা কি আছে?

ম—অবিদ্যাটা কার?

ভ—অহংকারের।

ম—হাঁ, অহংকারের, অহংকার দূর করো, অবিদ্যাও চলে যাবে। খুঁজলে অহংকার অদৃশ্য হয়। কেবল প্রকৃত আত্মাই থাকে। যে অহংকার অবিদ্যার বড়াই করে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যতে কোন অবিদ্যা নেই। অবিদ্যার অস্তিত্ব না থাকার কথা প্রমাণ করার জন্যই যাবতীয় শাস্ত্র লেখা হয়েছে।

ভ—অহংকার কোথা থেকে ওঠে?

ম—অহংকার নেই। অন্যথা তুমি কি দু'টি আত্মা আছে বলে স্বীকার করো? অহংকারের অভাবে অবিদ্যা কোথায়? তুমি যদি অনুসন্ধান শুরু করো যে অবিদ্যা মোটেই নেই, হয় দেখা যাবে যে সে নেই কিংবা তুমি বলবে যে সে পালিয়ে গেছে।

অজ্ঞানটা অহংকারের। তুমি অহংকারের কথা কেন ভাবো আর কেন-ই বা কষ্ট পাও? আবার অজ্ঞানটা কি? এটা এমন একটা কিছু যার কোন অস্তিত্ব নেই। যাই হোক বাস্তব জীবনে

অবিদ্যা প্রকল্পের প্রয়োজন আছে। অবিদ্যা আগাদের অজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। এটা আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা বিস্মৃতি। সূর্যের সামনে কি অন্ধকার থাকে ? অনুরূপভাবে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার কাছে কি অজ্ঞান থাকে ? তুমি যদি আত্মাকে জানো তবে কোন অন্ধকার নেই, কোন অজ্ঞান নেই, কোন দুঃখ নেই।

মনই যত দুঃখকষ্ট ইত্যাদি ভোগ করে। অন্ধকার আসেও না আর যায়ও না। সূর্য দেখো আর কোন অন্ধকার থাকবে না। সেরূপ আত্মাকে দেখো তবেই দেখবে যে অবিদ্যাও নেই।

ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যেরা ধ্যান অভ্যাস করেছিলেন।

ম—ধ্যান ও অন্যান্য সাধনা কেবল এর (অজ্ঞানের) অভাবটা অর্থাৎ অজ্ঞানের অস্তিত্বহীনতা বোঝার জন্য। কেউ নিজের সত্তাকে অস্বীকার করতে পারে না। সত্তাই জ্ঞান অর্থাৎ চেতনা। সেই চেতনার তাৎপর্য অজ্ঞানের অভাব। অতএব সবাই স্বভাবতঃই অজ্ঞানের না থাকার কথাই স্বীকার করছে। তবুও সে দুঃখ পায় কেন ? কারণ সে মনে করে যে সে এটা বা সে ওটা। এটাই ভ্রম। কেবল 'আমি আছি'ই আছে ; 'আমি এটা, আমি ওটা কিংবা আমি এরূপ, আমি সেরূপ' নেই। যখন কেবল সত্তামাত্র থাকে তখনই ঠিক ; যখন এটাকে উপাধিযুক্ত করা হয় তখন ভুল। এটা-ই পূর্ণ সত্য।

দেখ কিরূপে একজন তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সেকি নিজের সত্তা জানার জন্য একটা আর্শিতে দেখে ? তার চেতনাই তাকে তার অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করায়। কিন্তু সে সেটা শরীর ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। এটা করবে কেন ? সেকি সুষুপ্তিতে তার শরীর সম্বন্ধে জানত ? না, তা সত্ত্বেও সে সুষুপ্তিতে ছিল না, তা নয়। সে সেসময়ে শরীর ছাড়াই ছিল। সে যে সুষুপ্তিতে আছে সেটা সে কি করে জানে ? এখন কি তার সত্তা জানার জন্য একটা আর্শির প্রয়োজন হয় ? কেবল সচেতন হও আর তোমার সত্তা তোমার চেতনায় পরিস্ফুট হবে।

ভ—কি করে একজন আত্মাকে জানবে ?

ম—'আত্মাকে জানার' অর্থ 'আত্মা হওয়া'। তুমি কি বলতে পারো যে তুমি আত্মাকে জানো না ? তুমি তোমার চোখ দেখতে পাও না আর তোমায় যদি কোন আর্শি না দেওয়া হয়, তুমি কি তোমার চোখের অস্তিত্ব অস্বীকার করো ? অনুরূপভাবে আত্মা যদিও বস্তুগতভাবে দেখা যায় না তবু তুমি তোমার আত্মা সম্বন্ধে সচেতন। কিংবা সেটা বিষয়মুখ (অবজেকটিফায়েড) নয় বলে কি নিজের আত্মাকে অস্বীকার করো ? যখন তুমি বল "আমি আত্মাকে জানি না"—এর অর্থ তুমি একে আপেক্ষিকভাবে জানো না ; তুমি আপেক্ষিক জ্ঞানে এত অভ্যস্ত যে এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেল। এরূপ ভুল ধারণাই স্বতঃস্ফূর্ত আত্মা যার বাস্তবায়িত জ্ঞান হয় না তাকে জানার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে ; আর তুমি জিজ্ঞাসা করো "কি করে একজন আত্মাকে জানবে ?" তোমার অসুবিধাটার মূল "কি করে ?" কে আত্মাকে জানবে ? শরীর কি একে জানতে পারে ?

তবে শরীরই উত্তর দিক। কে বলে যে এখন শরীর দেখা যাচ্ছে ?

এইরূপ অজ্ঞানের নিষ্পত্তির জন্যই শাস্ত্র ঈশ্বরের লীলা ও ক্রীড়া প্রকল্পের উদ্ভাবন করেছে। ঈশ্বরই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীররূপে প্রকট হয়ে লীলা করছেন। এ লীলা তোমার পক্ষে কষ্টকর বলার তুমি কে ? ঈশ্বরের কার্যপ্রণালীর আপত্তি করারই বা তুমি কে ?

(তোমার কর্তব্য কেবল 'হওয়া'—আর 'এটা বা ওটা হওয়া' নয়। 'আমি আছি যা আমি আছি' (আই অ্যাম্ ছ্যাট্ আই অ্যাম্) -তেই সব সত্যটা ধরা আছে। সংক্ষেপে তার পদ্ধতি 'শান্ত হও' (বী স্টিল)। 'শান্ত' হওয়ার অর্থ কি ? এর অর্থ ক্ষুদ্র সত্তাকে (সীমিত-ভাবকে) লয় করো। কারণ যে কোন রূপ বা আকারই দুঃখের মূল। 'আমি এই বা ওই' ভাবটা ত্যাগ করো। আমাদের শাস্ত্র বলে 'অহমিতি স্ফুরতি ('আমি' রূপে এ প্রকাশ পায়)

ভ—স্ফুরণ কি ?

ম—(অহম্ অহম্) 'আমি'—'আমি'ই আত্মা ; (অহম্ ইদম্) 'আমি এই' বা 'আমি এবং এই' অহংকার। স্ফুরণ সর্বদাই আছে। অহংকার ক্ষণস্থায়ী ; যখন 'আমি'কে কেবল 'আমি' রূপে ধরে রাখা যায় সেটা আত্মা ; যখন সেটা স্পর্শকের মত কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়ে নিজেকে 'এই' বলে তখনই অহংকার।

ভ—ঈশ্বর কি আত্মা থেকে পৃথক ?

ম—আত্মাই ঈশ্বর। 'আমি আছি'ই ঈশ্বর। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ' (হে গুড়াকেশ ! আমিই আত্মা)।

এই প্রশ্ন উঠছে কারণ তুমি তোমার অহংকার সত্তাকে ধরে রয়েছ। যদি তুমি তোমার প্রকৃত সত্তাকে ধরো তবে এটা উঠবে না। কারণ প্রকৃত আত্মা কিছু চাইতে পারে না, আর চায়ও না। যদি ঈশ্বর আত্মা থেকে পৃথক হয় তাহলে তাকে আত্মাব্যতীত ঈশ্বর হতে হয় ; যা অসম্ভব।

ভ—নমস্কার কি ?

ম—নমস্কারের অর্থ 'অহংকারের শমন'। 'শমন' কি ? তার মূল উৎসে মিশিয়ে দেওয়া। হাঁটুমুড়ে মাথা হেঁট ক'রে আর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে ঈশ্বরকে ভোলানো যায় না। তিনি ব্যক্তিত্ব আছে কিনা দেখেন।

শ্রীসামান্না—'আমি আছি' অনুভবের জন্য কি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে ?

ম—তোমার সুষুপ্তিতে কি এটা থাকে ? এক সত্তাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করছে। অথবা তুমি কি বলতে চাও যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আত্মা নিরপেক্ষ আর পাঁচটা আত্মা আছে যারা ষষ্ঠ আত্মার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ? একটা শক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়-পথে কাজ করছে। সেই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করবে কি করে ? তুমি কি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর ? যখন সুষুপ্তিতে তোমার শরীরবোধ থাকে না

তখনও কি তুমি থাকো না? সেই এক 'আমি' এখনও রয়েছে যার জন্য আমরা শরীর থাকুক বা না থাকুক আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়গুলো পর্যায়ক্রমে কাজ করে। তাদের কাজ আরম্ভ হয় আর সমাপ্ত হয়। একটা আধার নিশ্চয়ই আছে যার ওপর তাদের কাজ হয়। তারা কোথা থেকে ওঠে আর কোথায় মিলিয়ে যায়? কেবলমাত্র একটাই আধার থাকতে হবে। এটা জানা যায় না বলাতে একে একক বলেই স্বীকার করা হচ্ছে—কারণ তুমি বলছ যে একে জানার জন্য দ্বিতীয় কেউ নেই।

এ সব আলোচনা কেবল অজ্ঞান দূর করার জন্য। সেটা হলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা যোগ্যতা বা পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে।

ভ—কৃপা কি সাধকের যোগ্যতা বাড়ায় না?

ম—(তাঁর ওপর ছেড়ে দাও! সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো। দু'টির মধ্যে একটি করতে হবে। অক্ষমতা ও উচ্চশক্তির সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে সমর্পণ; কিংবা দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ক'রে মূল উৎস আত্মায় মিশে যাওয়া। দু'ভাবেই তোমার দুঃখ দূর হবে। যে আত্মসমর্পণ করে ঈশ্বর কখনই তাকে পরিত্যাগ করেন না। মামেকং শরণং ব্রজ, গী ১৮।৬৬।)

ভ—সমর্পণ করলে মনের অবস্থা কিরূপ হবে?

ম—সমর্পিত মন কি এই প্রশ্ন করছে? (হেসে উঠলেন)।

৩৬৪। নেলোরের অধ্যাপক বিশ্বরূপ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ম—বিশ্বাত্মা দর্শন, বিশ্বরূপ দর্শন অর্থাৎ সার্বজনীন আত্মা বা বিশ্বাতীত চেতনাই বিশ্ব। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আমার কোন আকার নেই' বলে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন, 'আমার বিশ্বরূপ দেখো।' এটা কি সঙ্গতিপূর্ণ? আবার

তিনি বলেছেন, 'আমি ত্রিলোকের অতীত', কিন্তু অর্জুন তাঁর মধ্যে ত্রিলোক দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'দেবতা, মানুষ ইত্যাদি আমাকে দেখতে পায় না' ; তা সত্ত্বেও অর্জুন নিজেকে ও দেবতাদের তাঁর মধ্যে দেখছেন। কেউ দেখতে পায় না অথচ এটা দেখার জন্য অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দেওয়া হল। এগুলো কি পরস্পর-বিরোধী বাক্যজাল নয় ?

এর উত্তর এই যে এটা বোঝার ভুল। সূক্ষ্মস্তরে স্থূলদৃষ্টি অসম্ভব। জ্ঞানদৃষ্টির প্রয়োজন। সেজন্য অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দেওয়া হয়েছিল। এই দৃষ্টি কি স্থূল হতে পারে ? এরূপ ব্যাখ্যা কি প্রকৃত তাৎপর্য বোঝাতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কালোঽস্মি', 'আমি কাল'। কালের কি কোন রূপ আছে ?

আবার বিশ্বই যদি তাঁর রূপ হয় তবে সেটা কি এক ও অপরিবর্তনীয় হবে না ? তিনি অর্জুনকে কেন বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই আমাতে দেখো ?' তার অর্থ তাঁর রূপ দর্শকের ইচ্ছানুরূপ। তারা বলে 'দিব্যদৃষ্টি' কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দৃশ্যের বর্ণনা করে। সেই দৃশ্যে দ্রষ্টাও রয়েছে। এ সব কি ? এমনকি একজন সম্মোহকও তোমায় বিচিত্র দৃশ্য দেখাতে পারে। সেটাকে একটা ইন্দ্রজাল বল, অপরপক্ষে একে দিব্য বলছ। এ পার্থক্য কেন ? যা কিছু দেখা যায় তা সত্য হতে পারে না। এটাই সত্য।

৩৬৫। শ্রীভগবান যখন এইভাবে বলে যাচ্ছিলেন, একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে শরীরকে আত্মা বলে নির্ধারণ কি করে রোধ করা যায়।

ম—সুষুপ্তিতে কি হয় ?

ভ—তখন অজ্ঞান থাকে।

ম—সুষুপ্তি যে অজ্ঞান এটা জানলে কি করে ? সুষুপ্তিতে তুমি ছিলে কি না ?

ভ—আমি জানি না।

ম—তুমি কি স্মুষুপ্তিতে তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর?

ভ—যুক্তি অনুসারে তা স্বীকার করতে হয়।

ম—তোমার অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত কি করে কর?

ভ—যুক্তি ও অনুভূতির দ্বারা।

ম—অনুভূতির জন্য কি যুক্তির প্রয়োজন হয় (হেসে উঠলেন)।

ভ—ধ্যান বিশ্লেষণাত্মক কিংবা সমন্বয়াত্মক?

ম—বিশ্লেষণ ও সমন্বয় বুদ্ধির স্তরে। আত্মা বুদ্ধির অতীত।

৩৬৬। সাড়ে তিনটার সময়ে চলে যাওয়ার আগে শ্রীমতী ডড্‌ওয়েল দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, তিনি 'নেতি নেতি'র অর্থ জানতে চাইলেন।

ম—এখন শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে আত্মা বলে ভুল নির্ধারণ রয়েছে। তুমি এগুলো ত্যাগ করতে চেষ্টা করো, তাকেই 'নেতি' বলে। যাকে ত্যাগ করা যায় না সেই একমাত্রকে ধরে থেকেই এটা করা যায়। সেটাই একমাত্র 'ইতি'।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৬৭। একজন আকস্মিক দর্শনার্থিনী মহারাষ্ট্রীয় মহিলা বিদায় নিতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানি যে এক জীবনে মুক্তি হবে না। তবু এ জীবনে কি মনে শান্তি পাব না?

মহর্ষি তাঁর দিকে অত্যন্ত করুণাপূর্ণ নয়নে চেয়ে, হেসে মৃদুস্বরে বললেন—জীবন ও সব কিছু ব্রহ্মতেই রয়েছে। ব্রহ্ম নিত্য-বর্তমান। অনুসন্ধান করো।

ভ—আমি কয়েক বছর ধরে ধ্যান অভ্যাস করছি। তবু আমার মনস্থির হয় না আর ধ্যানে মন বসে না।

মহর্ষি তাঁর দিকে সুস্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'এখন কোরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

৩৬৮। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত রিসার্চ স্কলার এক মহিলার নয় কি দশ বছরের ছোট মেয়ে শ্রীমরিস ফ্রেডম্যানের সঙ্গী হয়ে এসেছে। ১২টার সময়ে তাদের সঙ্গে শ্রীভগবানের পালাকট্টতে দেখা হল। শ্রীভগবান যথারীতি মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসলেন। সে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—"পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন ?

ম—কর্মের জন্য।

ভ—কে কর্মফল দেয় ?

ম—ঈশ্বর।

ভ—ঈশ্বর আমাদের কর্ম করান আর মন্দ কর্ম করলে মন্দ ফল দেন। এটা কি ঠিক ?

শ্রীভগবান প্রায় হেসে উঠেছিলেন, তার প্রতি খুব প্রসন্ন হলেন। পরে হলে এসে তাকে কিছু পড়ার জন্য বললেন। সেই থেকে মেয়েটির ওপর লক্ষ্য রাখছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৬৯। প্রায় প্রৌঢ় এক মহারাষ্ট্রীয় দম্পতি এখানে দর্শনার্থে এসেছেন। তাঁরা সরল ও শান্ত। দু'জনেই অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিতে গিয়ে ভদ্রলোকটি কাঁদতে কাঁদতে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীভগবান স্থির দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক হয়ে শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি দেখা যেতে লাগল। তাঁর নয়ন-কমলে ভক্তের জন্য এক বিন্দু জল।

৩৭০। শ্রীভগবান গোশালায় ছিলেন। লোকেরা কাজ করছিল, তিনি তাদের কাজ কিছুক্ষণ দেখলেন। তখন একজন এসে খবর দিলে যে হলঘরে একদল দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে। শ্রীভগবান তাঁর অভ্যস্ত শান্তভঙ্গীতে বললেন, "বেশ—বেশ, তোমরা তোমাদের কাজ করো। আমিও আমার কাজে যাই। লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাই কেমন!" তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৭১। তিনজন মধ্যবয়স্ক আন্ধ্র ভদ্রলোক শ্রীভগবানের দর্শনার্থী হয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন নতজানু হয়ে বসে বললে আমি বস্তি, ধৌতি, নেতি ইত্যাদি হঠযোগ সাধনা করি। দেখছি যে পায়ের গোড়ালিতে একটা শিরা শক্ত হয়ে উঠেছে। এটা কি যোগ অভ্যাসের ফল?

ম—যে কোন কারণে শিরা শক্ত হতে পারে। এটা এমন কিছু কষ্ট দেয় না, এর থেকে বেশীও হতে পারত। হঠযোগ শুদ্ধি করে। ক্রমশঃ প্রাণায়ামে গেলে এটা মনের শান্তির সাহায্য করে।

ভ—আমি কি প্রাণায়াম করবো? এটা কি উপযোগী?

ম—প্রাণায়াম মন সংযমের একটা উপায়। কেবল প্রাণায়ামে থেমে গেলে চলবে না। তোমায় প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবধি এগিয়ে যেতে হবে। অবশেষে পূর্ণ ফল পাবে।

তাদের মধ্যে আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য কি করে দমন করা যায়?

ম—ধ্যানে।

ভ—ধ্যান কি?

ম—সব চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে একটিমাত্র চিন্তাকে ধরে রাখা ধ্যান।

ভ—কি ধ্যান করবো?

ম—তোমার যা অভিরুচি।

ভ—শিব, বিষ্ণু ও গায়ত্রী সমান কল্যাণকারী বলা হয়। কার ওপর ধ্যান করবো?

ম—যাকে তোমার বেশী পছন্দ। তারা সবাই ফলদায়ক। কিন্তু তোমায় একটিতে লেগে থাকতে হবে।

ভ—কি করে ধ্যান করবো?

ম—যাকে বেশী পছন্দ তার প্রতি মন একাগ্র করো। একটিমাত্র চিন্তা চলতে থাকলে অন্য চিন্তা দূর হয়ে যায় আর অবশেষে চিন্তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ বৈচিত্র্য আছে, মন্দ চিন্তাও আছে। যখন একমাত্র প্রিয় চিন্তাটা চলতে থাকে তখন শুভ চিন্তায় মন ভরে যায়। অতএব একটা চিন্তা ধরে থাকো। ধ্যানই প্রধান সাধনা।

একটু পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—

ধ্যান একটা সংঘর্ষ। ধ্যান করতে বসলেই যত রাজ্যের চিন্তা আসে আর যে চিন্তাকে ধরে থাকতে চাও তাকে প্রবল বেগে ডুবিয়ে দিতে চায়। বার বার অভ্যাসে শুভ চিন্তার ক্রমশঃ শক্তি বাড়ে। এর শক্তি বাড়লে অন্য চিন্তা দূর হয়ে যাবে। ধ্যানে অনবরত এরূপ মহাসংঘর্ষ চলতে থাকে।

লোকে দুঃখ দূর করতে চায়। তারজন্য মনে শান্তি চাই, তার অর্থ নানা চিন্তার অত্যাচারের অভাব। একমাত্র ধ্যানেই মনের শান্তি আসে।

ভ—তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?

ম—যারা সরাসরি মন সংযম করতে পারে না তাদের জন্য প্রাণায়াম প্রয়োজন। এটা যেন গাড়ী থামাবার ব্রেকের মত। কিন্তু এতেই থামলে চলবে না, আগে যা বলেছি এটার পর প্রত্যাহার, ধারণা

ও ধ্যান চালিয়ে যেতে হবে। ধ্যান সফল হলে, প্রাণায়াম ছাড়াই মন সংযত হয়। আসন করলে প্রাণায়ামের সাহায্য হয়, প্রাণায়ামে ধ্যান আর তার ফলেই মনের শান্তি। হঠযোগের এই উদ্দেশ্য।

পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—

একবার ধ্যানে দৃঢ় অভ্যাস হলে ছাড়া যায় না। কাজ, খেলা কি আমোদ-প্রমোদ যাই কর না কেন এটা আপনা হতে চলতে থাকে। ঘুমেও এটা চলতে থাকে। ধ্যান এমনই সুদৃঢ় হবে যে এটা একজনের স্বভাব হয়ে যাবে।

ভ—ধ্যান অভ্যাসের জন্য কি ক্রিয়াকর্ম করা দরকার?

ম—ধ্যানই ক্রিয়া, কর্ম ও পদ্ধতি। এটি সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও কার্যকর। আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই।

ভ—জপ করতে হবে না?

ম—ধ্যান কি বাক্ (বাক্য) নয়? এর জন্য জপের কি দরকার? যদি ধ্যান হয় তবে আর কিছুরই দরকার নেই।

ভ—মৌনব্রত কি সহায়ক নয়?

ম—ব্রত কেবল ব্রতই। এটা ধ্যানের কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু মুখ বন্ধ করে মনকে এলোমেলো ঘুরতে দিয়ে কি লাভ? মন যদি ধ্যানে লেগে থাকে তবে কথার আর কি প্রয়োজন?

ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। মৌনব্রত নিয়ে যদি কাজই (চিন্তাই) করা হল তবে ব্রত নিয়ে কি লাভ?

ভ—জ্ঞানমার্গ কি?

ম—এতক্ষণ ধরে সেই কথাই বলছি। জ্ঞান কি? জ্ঞানের অর্থ সত্যকে জানা। এটা ধ্যানের দ্বারা হয়। ধ্যান তোমায় অন্য চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে সত্যকে ধরে থাকতে সাহায্য করে।

ভ—এত দেবদেবীর কথা বলা হয় কেন?

ম—শরীর একটা। তবু সে কত কাজ করে। সব কিছু কাজের মূল একটা। দেবতাদের সম্বন্ধেও তাই।

ভ—(মানুষ দুঃখ ভোগ করে কেন ?

ম—অসংখ্য চিন্তার জন্যই দুঃখ। যদি চিন্তাকে একমুখী করা যায় আর একটিতে লাগানো যায় তবে দুঃখ থাকে না, উপরন্তু আনন্দ লাভ হয়। তখন এমনকি 'আমি কিছু করছি' চিন্তাও থাকে না আর তার ফলের কথাও চিন্তা হয় না।)

৩৭২। ভ—'আত্মবিদ্যা বিলাস' ও অন্যান্য বই-এ রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, অশ্রুপাত ইত্যাদি বলা হয়েছে। এগুলো কি সমাধি অবস্থায় কিংবা এর আগে বা পরে হয় ?

ম—এগুলো মনের সূক্ষ্মবৃত্তির লক্ষণ। দ্বৈত বোধ ছাড়া এসব থাকতে পারে না। সমাধি পূর্ণ শান্তি, সেখানে এগুলো নেই। সমাধি থেকে উত্থিত হলে সেই অবস্থার স্মৃতির জন্যই এসব হয়। ভক্তিমার্গে সমাধির পূর্বাভাসরূপে এরা দেখা দেয়।

ভ—জ্ঞানমার্গে কি এসব হয় না ?

ম—হতে পারে। এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটা ব্যক্তিগত স্বভাবের ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্ব একেবারে চলে গেলে এসব থাকে না। যদি ব্যক্তিতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়।

মাণিক্কবাচকর ও অন্যান্য মহাত্মারা এসব লক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন অহেতুক অনর্গল অশ্রুপাত হয়। এ বিষয় সচেতন হলেও একে রোধ করা যায় না। বিরূপাক্ষ গুহায় থাকা কালে আমার এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ভ—সুষুপ্তি অবস্থায় আনন্দের অনুভূতি হয় বলা হয় তথাপি তার স্মৃতিতে রোমাঞ্চ হয় না। সমাধির স্মৃতিতেই বা এসব হবে কেন ?

ম—সমাধি জাগ্রত সুষুপ্তি। আনন্দের আতিশয্য হওয়ায় অনুভূতি স্পষ্ট, অন্যপক্ষে ঘুমের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।

ভ—তবে কি বলা যায় যে সুষুপ্তিতে দুঃখ নেই, সুখও নেই অর্থাৎ অনুভূতিটা নঞর্থক, সদর্থক নয়।

ম—কিন্তু লোকে বলে 'আমি আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম', স্মৃতিটা ইতিবাচক। সুতরাং সুষুপ্তিতে সুখানুভূতি আছে।

ভ—আনন্দে কি কেবল দুঃখ নিবৃত্তি কিংবা আরও কিছু সদর্থক অনুভূতি আছে?

ম—এটা সদর্থক। দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখানুভূতি যুগপৎ হয়।

ভ—এটা কি এমন হতে পারে যে সুষুপ্তিতে আনন্দের অনুভূতি স্পষ্ট নয় যার ফলে রোমাঞ্চ ইত্যাদি হয় না?

ম—সমাধির আনন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট ও তার স্মৃতিও তদ্রূপ, সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

৩৭৩। নবনির্মিত ছোট স্নানাগারে সকাল ৯টা ১৫ মিনিট থেকে ৯টা ৩০ মিনিট অবধি শ্রীভগবানের সঙ্গে মহীশূরের মহামান্য মহারাজার একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হয়েছিল। মহামান্য মহারাজা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রে বলেছিলেন—

আমি শ্রীভগবানের জীবনী পড়েছি আর তাঁকে দর্শন করতে বহুদিন হতে অভিলাষী কিন্তু পরিবেশ এমন যে এরূপ ইচ্ছা সহজে পূর্ণ হওয়ার নয়। আমার অক্ষমতার জন্য অন্যান্য ভক্তদের মত এখানে থাকারও উপায় নেই। যে পনের মিনিট সময় এখানে আছি কেবল আপনার কৃপা প্রার্থনা করি। (বিদায়কালে তিনি আবার শ্রীভগবানকে পূর্বের মত প্রণাম করেছিলেন আর দু'টি উত্তম গাত্রাচ্ছাদন শাল ও কিছু অর্থ অফিসে দান করে ফিরে গিয়েছিলেন।)

১৩ই মার্চ, ১৯৩৭

৩৭৪। ত্রিবাঙ্কুরের মহামান্য মহারাজার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে ৫টা ১৫ মিনিট অবধি একটি সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

ত্রিবাঙ্কুরের মহামান্য মহারাজা ও মহারাণী সকাল ৮টার ট্রেনে তিরুভন্নমালাই পৌঁছে বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে আশ্রম দর্শনে এসেছিলেন। হলঘরে ভগবানের সান্নিধ্যে সে সময়ে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এমন কি যে ভক্তেরা প্রতিদিন সেখানে বসত, একটা ভুলের জন্য তাদেরও সাক্ষাৎকারের সময়ে থাকা হয় নি। একজন অবসর প্রাপ্ত জেলাশাসক রাজদম্পতিকে শ্রীভগবানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দু'জন পার্শ্বচর, মহারাজার নিজস্ব সচিব, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ময়লাপুরের একজন এডভোকেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক মহাশয় আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন আর সেটা মন, একাগ্রতা, আত্মজ্ঞান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে হয়েছিল। মহামান্যা মহারাণী তাঁর কয়েকটি সংশয় সম্বন্ধে বলেছিলেন আর শ্রীভগবান সেগুলো বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মহামান্য মহারাজাও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। সব কথাবার্তা তামিল ও মালয়ালামে হয়েছিল।

রাজদম্পতির দর্শনকালে মহারাণীকে অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্না ও প্রাণবতী এবং মালয়ালাম, তামিল ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি-সম্পন্না মনে হয়েছিল। বেশীরভাগ প্রশ্নই মহারাণী করেন, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—

ভ—সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

ম—এই প্রশ্নটি করার জন্য; এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করো আর সেই পরম বা আত্মাসহ সব কিছুর মূল উৎসে থাকো। এই অনুসন্ধানই অবশেষে আত্মানুসন্ধানে পর্যবসিত হবে, আর অনাত্ম বস্তু পরিত্যক্ত হয়ে বিশুদ্ধ দিব্য আত্মার অনুভূতিতে সমাপ্ত হবে।

ভ—অনুসন্ধান কিভাবে শুরু হয় ?

ম—আত্মা সকলের কাছেই স্পষ্ট আর তার অনুসন্ধান আরম্ভ করাও সহজ।

ভ—আমার মানসিক অবস্থায় কিভাবে আরম্ভ হবে ?

ম—প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ উপাসনা বা জপ-পদ্ধতি আছে। সেটা যদি আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসরণ করা যায় তবে সেটা আপনা হতে আত্মানুসন্ধানের পথে নিয়ে যাবে।

(এই বার্তালাপের লেখক সেখানে ছিলেন না। কথিকাটি মহর্ষির সেবকের নিকট হতে পাওয়া গিয়েছিল।)

২১শে মার্চ, ১৯৩৭

৩৭৫। একজন মধ্যবয়স্ক কর্ণাটীয় দর্শনার্থী 'অকর্ম' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে।

ম—অহংকার নষ্ট হয়ে গেলে যা কিছু করা হয় সবই 'অকর্ম'।

৩৭৬। একজন বিদ্বান তেলেগুভাষী দর্শনার্থী শ্রীভগবানের স্তুতি-মূলক একটি স্বরচিত গীত পড়ে সেটি তাঁর পায়ে রেখে প্রণাম করলে। একটু পরে উপদেশ প্রার্থনা করলে।

ম—'উপদেশ সারে' সব উপদেশ দেওয়া আছে।

ভ—কিন্তু মৌখিক ও ব্যক্তিগত উপদেশ মূল্যবান।

ম—যদি নূতন ও অজানা কিছু থাকে তবেই উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়। এখানে এটা কেবল মনকে শান্ত ও চিন্তাশূন্য রাখা।

ভ—এ অসম্ভব মনে হয়।

ম—কিন্তু এটাই যথার্থ আদি ও শাশ্বত অবস্থা।

ভ—দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় একে বোঝা যায় না।

ম—দৈনন্দিন জীবন সেই শাশ্বত অবস্থার অতিরিক্ত নয়। যতদিন গতানুগতিক জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পৃথক কল্পনা করা হয় ততদিন এরূপ অসুবিধা হয়। আধ্যাত্মিক জীবনকে যদি ঠিক ভাবে বোঝা যায় তবে কর্মময় জীবন তার থেকে অতিরিক্ত নয় জানা যাবে।

মন কি মনকে একটা বিষয়রূপে খুঁজে পেতে পারে? মনের ক্রিয়ার মূল উৎস খুঁজে পেতে হবে। সেটাই সত্য।

চিন্তার প্রতিবন্ধকের জন্যই আত্মাকে জানা যায় না। চিন্তা থেমে গেলে আত্মা অনুভূত হয়।

ভ—'সহস্রের মধ্যে একজন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে' (গী ৭।৩)।

ম—'যখনই চঞ্চল মন দূরে যায় তখনই তাকে সংযত কর' (গী ৬।২৬)। 'মন দিয়ে মনকে দেখে' (মনসা মন আলোক্য) উপনিষদের ঘোষণা।

ভ—মন কি একটা উপাধি?

ম—হাঁ।

ভ—দৃশ্য-জগৎ কি সত্য?

ম—দ্রষ্টা যেরূপ সত্য এটাও সেরূপ। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় নিয়ে ত্রিপুটি হয়। এই তিনের অতীতে একটা সত্য আছে। এরা আসে ও যায়, অন্যপক্ষে সত্য শাশ্বত।

ভ—এই 'ত্রিপুটি সম্ভব' অস্থায়ীমাত্র।

ম—হাঁ, আত্মাকে জানলে এমনকি সাংসারিক বস্তুতেও এই ত্রিপুটি অস্তিত্বহীন বলে দেখা যাবে অর্থাৎ তাদের আত্মা থেকে পৃথক করা যাবে না আর তারা একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকবে।

২২শে মার্চ, ১৯৩৭

৩৭৭। একজন মধ্য বয়স্ক আন্ধ্র দর্শনার্থী—বলা হয় মানুষে দেবত্ব আছে। তবে তার এত ক্ষোভ কেন?

ম—দেবত্ব তার একান্ত স্বরূপ। ক্ষোভটা প্রকৃতির।

ভ—ক্ষোভ কি করে দূর হয়?

ম—তার নিজস্ব দেবত্বের উপলব্ধিতে।

ভ—কিরূপে?

ম—সাধনায়।

ভ—কি সাধনায়?

ম—ধ্যানে।

ভ—ধ্যানে মন স্থির হয় না।

ম—অভ্যাসের দ্বারা ঠিক হয়ে যাবে।

ভ—মনকে কি করে স্থির করা যায়?

ম—এর শক্তি বাড়লে।

ভ—এর শক্তি কি করে বাড়ে?

ম—সৎসঙ্গে শক্তি বাড়ে।

ভ—এর সঙ্গে কি প্রার্থনা ইত্যাদিও যোগ করবো?

ম—হাঁ।

ভ—যার কোন ক্ষোভ নেই তার কি করণীয়?

ম—সে একজন সিদ্ধ যোগী। তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হয় না।

ভ—লোকে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা যেমন ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তাদের কি উত্তর দেবো?

ম—তারা কোথা থেকে এল—যারা তর্ক করে?

ভ—তারা বলে 'প্রকৃতি' থেকে।

ম—কেউ 'প্রকৃতি' বলে—কেউ বলে 'ঈশ্বর'।

ভ—আমরা কি অসময়ের জন্য সঞ্চয় করবো কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দৈবাধীন জীবন-যাপন করবো?

ম—ঈশ্বর সব কিছুর ভার নেন।

২৭শে মার্চ, ১৯৩৭

৩৭৮। একজন আন্ধ্র দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা উপলক্ষ্যে শ্রীভগবান উদ্ধৃত করলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গী ৬।৩৫

হে মহাবাহো! মন নিগ্রহ করা কঠিন, বড়ই চঞ্চল তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশীভূত করা যায়।

বৈরাগ্য ব্যাখ্যা ক'রে আবার বললেন—

সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ গী ৬।২৪

সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ ক'রে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে চতুর্দিক হতে আকর্ষণ ক'রে,

অভ্যাসের জন্য—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ গী ৬।২৫

ধারণা ও বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে মনকে স্থির ক'রে আত্মাতে সমাহিত ক'রে কিছুই চিন্তা করবে না।

আবার জ্ঞানের কথায় বললেন—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গী ৬।২৬

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হবে, তাকে সে সে বিষয় থেকে তুলে আত্মাতে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৭৯। নিলাম্বুরের একজন মালয়ালী ভদ্রলোক শ্রীতিরুমলপাদ শ্রীভগবানকে 'আত্মবিদ্যার' ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীভগবান এই ছোট পাঁচটি পদের কবিতার এরূপ ব্যাখ্যা করলেন—চিদাম্বরম্ একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এটি নান্‌দানারের স্মৃতি বিজড়িত, সে একটা গানে গেয়েছিল যে 'আত্মবিদ্যা অতি দুর্লভ'। কিন্তু মুরুগনার (শ্রীভগবানের বহুদিনের ভক্ত) 'আত্মবিদ্যা অতি সুলভ' পদ দিয়ে শুরু করে। 'আয়ে অতিসুলভ' গীতটির ধুয়া। এই অসাধারণ কথাটির ব্যাখ্যায় সে উত্থাপন করে যে আত্মা আপন সত্তা হওয়ায় অতি সাধারণ লোকের কাছে তা নিত্য প্রকাশিত। মূল বাক্য ও পরবর্তী যুক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ কারণ আত্মা যদি সবার আধার ও সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় তবে তা লাভের প্রশ্নই নেই। সুতরাং সে আর রচনা না করতে পেরে তার রচিত প্রথম চারটি পদ শ্রীভগবানকে সমাপ্ত করার জন্য দেয়।

শ্রীভগবান ভক্তের বিবৃতির সত্যতা স্বীকার করলেন আর কেন যে আত্মা স্পষ্ট হয়েও গুপ্ত তাও দেখালেন। এটা শরীর ইত্যাদিকে আত্মা বলে ভুল নির্ধারণ করার জন্য হয়।

ভ—এই ভুল নির্ধারণ কি করে উঠল ?

ম—চিন্তার জন্য। যদি চিন্তাগুলোকে থামানো যায় তবে প্রকৃত আত্মা স্বতঃই প্রকাশিত হবে।

ভ—চিন্তা কি করে থামে ?

ম—এদের আধার খোঁজো। সবগুলোই এক 'আমি'-চিন্তাতে গাঁথা আছে। এটাকে দমন করো ; অন্য সবগুলো থেমে

যাবে। অধিকন্তু আত্মা ছাড়া অন্য কিছু জেনে লাভ নেই। যদি আত্মাকে জানা যায় তবে সবই জানা হয়ে যায়। সে কারণে আত্ম-জ্ঞান লাভই মানুষের মুখ্য ও একমাত্র কর্তব্য।

ভ—'আমি'-চিন্তাকে কি করে দমন করা যায়?

ম—যদি এর উৎস খোঁজা যায় তবে এটা আর ওঠে না; এরূপে এটা অবদমিত হয়।

ভ—কোথায় ও কিভাবে একে পাওয়া যাবে?

ম—বাস্তবিকপক্ষে যে চেতনার দ্বারা লোকে সব কাজ করে, এটা তাই। শুদ্ধ চেতনাই আত্মা। আত্মজ্ঞান লাভ করতে একমাত্র "শান্ত হওয়াই" যা করণীয়।

ভ—এর থেকে সহজ আর কি হতে পারে?

ম—সুতরাং আত্মবিদ্যা লাভ অতি সুলভ।

৩৮০। একজন ইউরোপীয় জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি কে?' এই প্রশ্নের আপনি কি উত্তর দেন?

ম—নিজেকে জিজ্ঞাসা করো 'আমি কে?'

ভ—আপনি কিভাবে পেয়েছেন কৃপা ক'রে বলুন। আমি নিজে খুঁজে পাব না। ('আমি'টা জৈবশক্তির পরিণাম। শেষে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আমি জানতে চাই মহর্ষি কিরূপ অনুভব করেন।)

ম—এটা কি কেবল যুক্তি দিয়ে পাওয়া যায়? বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কেবল বুদ্ধিগত।

ভ—জে. সি. বোসের মতে প্রকৃতি একটি মানুষ ও কীটে কোন পার্থক্য করে না।

ম—প্রকৃতি কি?

ভ—এটা যা আছে তাই।

ম—অস্তিত্ব জানো কি ক'রে?

ভ—আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে।

ম—'আমার' শব্দের অর্থ তোমার অস্তিত্ব। তুমি কিন্তু অন্য কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলছ। 'আমার ইন্দ্রিয়' বলার জন্য তোমার অস্তিত্ব থাকা দরকার। 'আমি' না থাকলে 'আমার' হয় না।

ভ—আমি একজন সাধারণ জীব। আপনি একজন মহাপুরুষ, আমি আপনাকে এই অস্তিত্ব কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। অস্তিত্ব শব্দের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। ওর অস্তিত্ব আছে, আমার অস্তিত্ব আছে, সবারই অস্তিত্ব আছে। তাতেই বা কি?

ম—কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেই নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। "অস্তিত্বই তোমার স্বরূপ।"

ভ—কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

ম—ওদের অস্তিত্ব কি ক'রে জানো—নিজের অস্তিত্ব ছাড়া?

ভ—কোন কিছুর অস্তিত্বে আর কি নূতনত্ব? আমি আপনার বই নিয়ে পড়ে দেখলাম যে একজন নিজেকে 'আমি কে?' জিজ্ঞাসা করবে। আমি জানতে চাই 'আপনি কে?' আমি আমার উত্তর জানি। যদি আর একজনও তাই বলে, এরূপে আরও লক্ষ লক্ষ লোকও তাই বলে তবে বোধহয় সেটা আত্মা হতে পারে। আমি কথার জটিলতা নয়, একটা নিশ্চিত উত্তর চাই।

ম—এরূপে বড় জোর একটা সম্ভাব্য অবস্থায় আসা যায়।

ভ—হ্যাঁ। মিশ্চিত বলে কিছু নেই। এমনকি ঈশ্বর সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

ম—এখনকার মত ঈশ্বরের কথা থাক। তোমার নিজের সম্বন্ধে কি?

ভ—আমি আত্মা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাই।

ম—তুমি অন্যের কাছ থেকে নিশ্চিত হতে চাও। যদিও সবাইকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হয় কিন্তু সবাই নিজেকে 'আমি' বলে। 'আমি' থেকেই নিশ্চিত প্রমাণ হয়। বাস্তবিকপক্ষে কোন

'তুমি' নেই। সবই 'আমি'র অন্তর্গত। নিজেকে স্বীকার করে নিলেই অন্যদের জানা যায়। জ্ঞাতা ছাড়া অন্যদের অস্তিত্ব নেই।

ভ—আবার এটাও কিছু নূতন নয়। যখন স্যার সি. ভি. রমণের কাছে ছিলাম, তিনি বলেছিলেন গন্ধের প্রকল্প তাঁর আলোক প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। গন্ধকে কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলার প্রয়োজন নেই। এখন, এটা একটা নূতনত্ব, এটা প্রগতি (প্রোগ্রেস)। আমি এখন যা শুনছি তাতে নূতন কিছু নেই বলাতে আমি এটাই বোঝাতে চাই।

ম—'আমি' কখনই নূতন নয়। এটা শাশ্বতকালে এক।

ভ—আপনি বলতে চান কোন প্রগতি নেই?

ম—বহির্মুখী মন প্রগতি দেখে। মনকে যখন অন্তর্মুখীন ক'রে আত্মাকে খোঁজা যায় তখন সব শান্ত।

ভ—বিজ্ঞান—তাদের কি হবে?

ম—তারাও আত্মাতে লয় হবে। আত্মাই তাদের পূর্ণতা।

(তখন বিকাল ৫টা; শ্রীভগবান হলঘর থেকে উঠে গেলেন আর ভদ্রলোকটিও স্টেশানের দিকে রওনা দিলে।)

৩৮১। বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র শ্রীবোস 'আত্মবিদ্যার' শেষ পদটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীভগবান এরূপ ব্যাখ্যা করলেন—জগৎ দর্শন হয়; এই দর্শন একটা আপাত প্রতীয়মান বস্তু; এরজন্য একটা আধার ও বোধের প্রয়োজন হয়। এরূপ অস্তিত্ব ও তার বোধ যুগপৎ মনের উদয়ের সঙ্গে ওঠে। সুতরাং স্থূল অস্তিত্ব ও বোধ মনের অস্তিত্ব ও বোধের অংশ। মন নিত্য নয় কারণ মনের উদয় ও অস্ত আছে। মনের অধিষ্ঠান আত্মা, এটি স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ এর অস্তিত্ব ও স্ব-প্রকাশতা স্পষ্ট। সেটাই পূর্ণ সত্তা যা সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগৃতির মধ্যেও নিরন্তর বিদ্যমান রয়েছে।

(জগৎ বৈচিত্র্যময়, এটা মনের ক্রিয়া। প্রতিফলিত প্রকাশে

অর্থাৎ আত্মার প্রতিফলিত বোধে মনের অস্তিত্ব। যেরূপ সিনেমার ছবি কেবলমাত্র অল্প আলোকে অর্থাৎ কৃত্রিম আলোতে দেখা যায় কিন্তু দিনের স্পষ্ট আলোয় কিংবা ঘোর অন্ধকারে দেখা যায় না, সেরূপ অল্প আলোকে অর্থাৎ অবিদ্যার মধ্যে দিয়ে আত্মার প্রকাশ প্রতিফলিত হলেই জগচ্ছবি দর্শন হয়। বিশুদ্ধ অজ্ঞানে যথা নিদ্রায় কিংবা বিশুদ্ধ আলোকে যথা আত্মজ্ঞানে জগৎ দেখা যায় না। অবিদ্যাই বৈচিত্র্যের কারণ।)

এঞ্জিনীয়র বললেন যে তিনি বুদ্ধিগতভাবে বুঝেছেন।

ম—কারণ এখন তোমায় বুদ্ধিই ধরে আছে। অর্থাৎ তুমি জাগ্রত অবস্থায় যখন আলোচনা করছ তখন বুদ্ধির প্রভাবাধীনে রয়েছ।

পরে বলা হল যে উপলব্ধির জন্য কৃপার প্রয়োজন।

এঞ্জিনীয়র জিজ্ঞাসা করলেন যে কি করে কৃপা লাভ হয়।

ম—কৃপাই আত্মা। অজ্ঞানের জন্য এর প্রকাশ হয় না। শ্রদ্ধার দ্বারা এটা স্পষ্ট হবে।

শ্রদ্ধা, কৃপা, বোধ, জীবাত্মা সবই আত্মার সমার্থ।

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৮২। একজন শান্তমূর্তি অথচ দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত তেলেগুভাষী ভদ্রলোক শ্রীভগবানকে মনোলয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীভগবান বললেন যে সবই 'উপদেশ সারে' লেখা আছে, একখানি সেই বই ভদ্রলোকটির হাতে ছিল।

ভ—মন কি?

ম—সেটা কি দেখো!

ভ—এটা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক।

ম—কার সঙ্কল্প?

ভ—সঙ্কল্পই মনের স্বভাব।

ম—কিসের সঙ্কল্প?

ভ—বাহ্য বিষয়ের।

ম—ঠিক তাই। এটা কি তোমার স্বরূপ?

ভ—এটা মনের।

ম—তোমার স্বরূপ কি?

ভ—শুদ্ধ চৈতন্য।

ম—তবে আর সঙ্কল্প ইত্যাদির জন্য দুশ্চিন্তা করছ কেন?

ভ—মনকে চঞ্চল ও অস্থির বলা হয়।

ম—সেইখানেই বলা হয়েছে যে মনকে অন্তর্মুখীন করো আর আত্মায় নিবিষ্ট করো। এই অভ্যাস বহুদিন ধরে করতে হয় কারণ মন অত্যন্ত ধীরে ধীরে বশীভূত হয় আর যতদিন না একান্তভাবে আত্মায় নিবিষ্ট হয় ততদিন অভ্যাস করে যেতে হয়।

ভ—আমি তার জন্য প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা প্রার্থনা করছি।

ম—সেটা তোমার নিকট সর্বদাই আছে। তোমায় যা করতে হবে তা বহির্মুখী মনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে না ফেলে আত্মাতে থাকা। সেটাই প্রসাদ।

ভদ্রলোকটি শ্রীভগবানকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

৩৮৩। একজন সন্ন্যাসী, স্বামী লোকেশানন্দ, শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—জীবনমুক্তের কি প্রারব্ধ থাকে?

ম—প্রশ্নকর্তা কে? কোথা থেকে প্রশ্ন হয়? একজন জীবনমুক্ত কি জিজ্ঞাসা করছে?

ভ—না, আমি এখন মুক্ত হইনি।

ম—তবে জীবনমুক্ত নিজেই জিজ্ঞাসা করুক?

ভ—সংশয়টা আমার।

ম—ঠিক তাই। অজ্ঞানীরই সংশয় হয়, জ্ঞানীর সংশয় নেই।

ভ—কোন কিছু নূতন নয় (অজাতবাদ) মতবাদ অনুসারে শ্রীভগবানের ব্যাখ্যা নির্ভুল কিন্তু অন্য মতবাদে কি এটা খাটে ?

ম—অদ্বৈতবাদ তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

(১) অজাতবাদ অনুসারে কোন ধ্বংস নেই, সৃষ্টি নেই, বদ্ধ নেই, সাধক নেই, মুমুক্ষুত্ব নেই, মুক্তি নেই। এটাই চরম সত্য (মাণ্ডুক্য কারিকা, ২-৩২)।

এই মতানুসারে 'এক' মাত্র আছে আর এতে কোন আলোচনার স্থান নেই।

(২) দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ যুগপৎ সৃষ্টি। এটি এরূপে ব্যাখ্যা করা হয়—দু'জন বন্ধু পাশাপাশি ঘুমাচ্ছে। একজন স্বপ্ন দেখলে যে সে তার বন্ধুকে নিয়ে বারাণসী গেল আর ফিরে এল। সে তার বন্ধুকে বললে যে তারা বারাণসী গিয়েছিল। বন্ধুটি অস্বীকার করলে। কথাটা একজনের দিক থেকে সত্য কিন্তু অপরজনের পক্ষে মিথ্যা।

(৩) সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ স্পষ্ট (ক্রমসৃষ্টি ও তার জ্ঞান)।

কর্মকে প্রারব্ধ, আগামী ও সঞ্চিত ইত্যাদি পূর্বকর্মরূপে মেনে নেওয়া হয়। এরজন্য কর্তৃত্ব ও কর্তা আছে। কর্ম শরীরের জন্য হতে পারে না কারণ এটা জড়। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ শরীরটা আছে। দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম ক'রে গেলে একজন জ্ঞানী হয়। এই বুদ্ধির অভাবে সেখানে কোন কর্তৃত্ব বা কর্তা নেই। সুতরাং জ্ঞানীর কোন কর্ম নেই। তাঁর এই অনুভূতি। নতুবা তিনি জ্ঞানী নন। যাহোক একজন অজ্ঞানী জ্ঞানীকে তাঁর শরীর বলে ভুল করে কিন্তু জ্ঞানী সেটা করেন না। জ্ঞানীর শরীরটা ক্রিয়াপর হওয়ায় একজন অজ্ঞানী দেখে তিনি কাজ করছেন, সেজন্য জ্ঞানী প্রারব্ধের অধীন কিনা জিজ্ঞাসা করে।

শাস্ত্র বলে জ্ঞানই অগ্নি যা সকল কর্ম (সর্বকর্মানি) ভস্মীভূত করে। 'সর্ব' শব্দ দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—(১) প্রারব্ধ সহিত এবং (২) প্রারব্ধ ব্যতীত। প্রথম ক্ষেত্রে—যদি একজনের তিনটি স্ত্রী

থাকে, সে মারা গেলে প্রশ্ন হয় "দু'জনকে বিধবা বলা হবে আর তৃতীয় জনকে কি তা বলা হবে না?" সবাই বিধবা হয়। সেরূপ প্রারব্ধ, আগামী ও সঞ্চিত কর্মও। যখন কোন কর্তা নেই তখন তিনটির কোনটিই থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কেবল জিজ্ঞাসুকে সন্তুষ্ট করার জন্য। বলা হয় সব কর্ম ভস্মীভূত হয় কেবল প্রারব্ধ ছাড়া। (শরীর যা করার জন্য জন্মেছে তা করে যেতে থাকে। এটাই প্রারব্ধ।) কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টি-কোণ থেকে কেবল আত্মাই আছে যা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। আত্মা ছাড়া শরীরও নেই, কর্মও নেই। সুতরাং কর্ম তাকে বিচলিত করে না।

ভ—জ্ঞানীর কি দেহাত্মবুদ্ধি নেই? উদাহরণসরূপ, যদি শ্রীভগবানকে কোন কিছুতে কামড়ায় তাঁর কি কোন যন্ত্রণাবোধ হয় না?

ম—বোধ আছে, দেহাত্মবুদ্ধিও আছে। শেষেরটি জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমান কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, অজ্ঞানী দেহটাই আমি (দেহৈব আত্মা) ভাবে অপরপক্ষে জ্ঞানী জানে যে সবই আত্মার (আত্মাময়ম্ সর্বম্) বা সবই ব্রহ্ম (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। যদি ব্যথা থাকে থাকুক। এটাও আত্মার অংশ। আত্মা পূর্ণ।

এখন জ্ঞানীর কাজ সম্বন্ধে, এগুলো তথাকথিত কারণ এগুলো নিষ্ফল। সাধারণতঃ কাজগুলো একজনের সংস্কারে পরিণত হয়। যতক্ষণ মন সক্রিয় ততক্ষণই এটা সম্ভব যেমন অজ্ঞানীর ক্ষেত্রে। জ্ঞানীর মন আছে বলে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু তিনি নিজে মনের অতীত। তাঁর কাজ করা দেখে মনে হয় যে মন আছে, কিন্তু তাঁর মন অজ্ঞানীর মত ফলপ্রসূ নয়। সে কারণে বলা হয় যে জ্ঞানীর মন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জ্ঞানীর মন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভূমিতে বাসনা ফলপ্রদ হয় না। তাঁর মন বন্ধ্যা, বাসনা ইত্যাদি শূন্য।

যা হোক, যেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে প্রারব্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে

সেজন্য বাসনাও আছে বলতে হবে। যদি থাকে তবে সেটা কেবল 'ভোগহেতু'। অর্থাৎ বলা হয় কর্ম দু'প্রকার ফল দেয়, একটাতে কেবলমাত্র তাদের ফলের আনন্দভোগ হয়; অন্যটাতে মনের ওপর সংস্কাররূপ ছাপ রেখে যায় যার ফলে জন্মান্তর হয়। জ্ঞানীর মন বন্ধ্যা হওয়ায় কোন কর্মবীজ থাকে না। তাঁর বাসনা কেবল 'ভোগহেতু কর্ম' হয়ে ক্ষয় হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর কর্ম কেবল অজ্ঞানীর পক্ষ থেকে দেখা যায়। তিনি সর্বদা নৈষ্কর্ম্যে থাকেন। তিনি শরীরটাকেও আত্মার অতিরিক্ত মনে করেন না। তাঁর বন্ধন বা মুক্তি কি করে হতে পারে? তিনি এ দুটির অতীত। তিনি এক্ষণেও কর্মের দ্বারা বদ্ধ নন কিংবা কোন সময়েই হন না। তাঁর পক্ষে জীবনমুক্তি বা বিদেহমুক্তি কিছুই নেই।

ভ—এই সব থেকে মনে হয় যিনি সকল বাসনা ভস্মীভূত করেছেন তিনি শ্রেষ্ঠ আর স্থাণু বা শিলার মত নিষ্ক্রিয় থাকবেন।

ম—না, এরূপ যে হতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাসনা তাকে বিচলিত করে না। স্থাণু কিংবা শিলার মতন হওয়াও কি একটা বাসনা নয়? এটা সহজ অবস্থা।

৩৮৪। বাসনা সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। শ্রীভগবান বললেন যে সুবাসনা ও কুবাসনা সহগামী—একটি অন্যকে ছেড়ে থাকে না। হয়ত একটির প্রাধান্য হয়। সুবাসনার অনুশীলন করতে হয় আর জ্ঞান হলে এটাও নষ্ট হয়ে যায়।

একজন প্রতিভাধর যুবকের কথা উঠল। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন যে তার পূর্বজন্মের সংস্কার খুবই প্রবল।

ভ—বিখ্যাত মহাত্মাদের রচনা স্মরণ করার শক্তির প্রকাশ কি করে হল? এটাও কি কেবল বীজাকার বাসনা?

ম—হাঁ, সংস্কার পূর্বলব্ধ জ্ঞান আর সেটা জমা থাকে। অনুকূল পরিবেশে প্রকাশ হয়। একজনের সংস্কার প্রবল হওয়ার

জন্য কোন বিষয় উপস্থাপিত হলে, যার সে বিষয়ের সংস্কার দুর্বল বা মোটেই নেই তার অপেক্ষা সে সহজে বুঝতে পারে।

ভ—এটা কি আবিষ্কারকদের পক্ষেও খাটে।

ম—"এ ভূমণ্ডলে নূতন বলে কিছুই নাই।" যাকে আমরা উদ্ভাবন বা আবিষ্কার বলি সেগুলো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সেই বিষয়ে প্রবল সংস্কারের দ্বারা পুনরাবিষ্কার।

ভ—এটা কি নিউটন, আইনস্টাইনদেব পক্ষেও প্রযোজ্য ?

ম—হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু সংস্কার যতই প্রবল হোক মন ধীর ও শান্ত না হলে প্রকাশ পায় না। এটা সবার অভিজ্ঞতা যে, কোন একটা কিছু বহু চেষ্টা করেও মনে করা যায় না কিন্তু মন স্থির হলে হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যায়। এমন কি ভুলে যাওয়া বস্তুও মনে করার জন্য মনেব শান্ত হওয়া প্রয়োজন। তথাকথিত প্রতিভাধর ব্যক্তিরা পূর্বজন্মে বহু চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করে সংস্কাররূপে জমা করে রেখেছে। সে এখন যতক্ষণ না মন লীন হয়ে যায় ততক্ষণ মনকে সে বিষয়ে একাগ্র কবে রাখে। সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় সুপ্ত ধারণাটি প্রকাশিত হয়। তার জন্য অনুকূল পরিবেশও আবশ্যক হয়।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৮৫। একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক শ্রীবেঙ্কট রাওকে কথায় কথায় শ্রীভগবান বললেন—

জ্ঞান লাভ না হলে তুমি জ্ঞানীর অবস্থা বুঝতে পারবে না। ঈশ্বর বা এঁদের কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন ফল নেই। অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে শিব কেন নগ্ন হয়ে দারুকবনে গেলেন ও ঋষিপত্নীদের সতীত্ব নষ্ট করলেন। যে পুরাণ এ কথা বলে সেই আবার বলে যে শিব সমুদ্রমন্থনের সময়ে হলাহল পান ক'রে দেবতাদের ও সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন। যিনি হলাহল পান ক'রে জগৎ রক্ষা করতে পারেন,

ঋষিদের মুক্তি দিতে পারেন, তিনিই নগ্ন হযে তাঁদের স্ত্রীদের সামনে বিচরণ করেছিলেন। এঁদের কাজ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর বা জ্ঞানীকে বুঝতে হলে একজনের জ্ঞানী হওয়া চাই।

ভ—আমরা কি জ্ঞানীর আচার-ব্যবহার জেনে সেগুলো অনুসরণ করবো না ?

ম—কোন লাভ নেই। বাসনা চার প্রকার—

(১) বিশুদ্ধ (শুদ্ধ), (২) অশুদ্ধ (মলিন), (৩) মিশ্র (মধ্য) ও (৪) শুভ (সৎ), এগুলো জ্ঞানীদের বরিষ্ঠ, বরীয়, বর ও বিদ অনুসারে হয়। তাদের ফল তিন প্রকারে—স্বেচ্ছা, পরেচ্ছা ও অনিচ্ছায় ভোগ হয়। গৌতম, ব্যাস, শুক ও জনকের মত জ্ঞানীও আছে।

ভ—ব্যাসও কি জ্ঞানী ছিলেন ?

ম—হাঁ, নিশ্চয়।

ভ—তবে শুক চলে যেতে অপ্সরীরা গাত্রাচ্ছাদন না ক'রে ব্যাসকে দেখে সেটা করলেন কেন ?

ম—সেই ব্যাসই শুককে জনকের কাছে পাঠিয়েছিলেন ; জনক শুককে পরীক্ষা করলেন ; পরে শুক ব্যাসের মহত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এলেন।

ভ—জ্ঞান ও আরূঢ় কি এক ?

ম—ঠিক তাই।

ভ—ভক্তি ও জ্ঞানের কি সম্বন্ধ ?

ম—শাশ্বত, অখণ্ড সহজ অবস্থাই জ্ঞান, এতে কি আত্মার প্রতি প্রেম বোঝাচ্ছে না ? এটা কি ভক্তি নয় ?

ভ—মূর্তি পূজা ভাল মনে হয় না। ইসলাম ধর্মে নিরাকারের উপাসনা করা হয়।

ম—তাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ধারণা ?

ভ—সর্বব্যাপীত্ব ইত্যাদি।

ম—তবে কি ঈশ্বরে উপাধি আরোপ করা হল না ? রূপও

একপ্রকার উপাধি। কোন একটা ধারণা না করে কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে না। যে কোনরূপ ভাবনা হলেই সেটা সগুণ ঈশ্বর। তাছাড়া সাকার অথবা নিরাকার এরূপ আলোচনায় কি লাভ? নিজের কোন রূপ আছে কিনা খুঁজে দেখো। সেটা করলেই ঈশ্বরকে বুঝতে পারবে।

ভ—আমি স্বীকার করছি আমার কোন রূপ নেই।

ম—বেশ। সুষুপ্তিতে তোমার কোন আকার নেই, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তুমি নিজেকে একটা আকার বলে নির্ধারণ করছ। দেখ, কোনটা তোমার প্রকৃত অবস্থা। আকার যে নেই সেটা অনুসন্ধান করলে জানা যায়। তুমি যদি তোমার জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে নিরাকার বলে বুঝতে পারো অন্ততঃ সেটুকু জ্ঞানও ঈশ্বরের আছে বলে কি স্বীকার করবে না আর তাঁকে নিরাকার বলে বুঝবে না?

ভ—কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি জগৎ রয়েছে।

ম—জগতটা কিভাবে প্রকাশ হচ্ছে? আমরা কিভাবে আছি? এগুলো জানলেই তুমি ঈশ্বরকে জানবে। তখন তিনি শিব কিংবা বিষ্ণু বা অন্য কিছু কিংবা সব কিছু নিয়ে গঠিত বুঝবে।

ভ—পরমপদে অর্থাৎ তুরীয় অবস্থায় কি বৈকুণ্ঠ থাকে?

ম—তোমার অন্তরে ছাড়া পরমপদ বা বৈকুণ্ঠ কোথায়?

ভ—বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি অনৈচ্ছিকভাবে প্রকাশ পায়।

ম—জগৎ কি স্বতঃই প্রকাশ পায়?

প্রশ্নকর্তা কোন উত্তর দিলে না।

ম—স্বতঃসিদ্ধ 'আমি' আত্মাকে ভুলে অনাত্মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি আশ্চর্য!

ভ—এটা সাংখ্যযোগ। সমস্ত যোগের চরম হওয়ায় সর্বপ্রথমে একে কি করে বোঝা যাবে? ভক্তি কি এর পূর্ববর্তী নয়?

ম—শ্রীকৃষ্ণ কি সাংখ্যযোগ দিয়ে গীতা শুরু করেন নি?

ভ—হাঁ। এবার বুঝেছি।

৩৮৬। ভ—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে বলা হয়েছে যে রামলালা মূর্তি জীবন্ত ছিল। এটা কি সত্য?

ম—তুমি এই দেহটার সজীব হওয়ার কারণ বলতে পারো? সেই মূর্তি সজীব হওয়া কি এই দেহটার জীবন্ত হওয়ার থেকে বেশী রহস্যময়?

ভ—ধাতুর নিজস্ব কোন বিচলন নেই।

ম—শরীরটা কি একটা শব নয়? তুমি বোধহয় একটা মৃতদেহ নড়ে উঠলে রহস্যপূর্ণ মনে করবে, তাই তো?

৩৮৭। তিনজন লোক অল্প সময়ের জন্য দর্শনার্থে এল; তার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে—উপনিষদে সৃষ্টি একভাবে আবার পুরাণে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটা ঠিক?

ম—অনেকভাবে আছে, আর এগুলো কেবল সৃষ্টির যে একটা কারণ আছে এবং একজন সৃষ্টিকর্তাকে যে মেনে নিতে হবে দেখাবার জন্য করা হয়েছে, যার ফলে কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হবে। গুরুত্বটা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নয়। অধিকন্তু সৃষ্টি একজন কেউ দেখছে। বিষয়ী ছাড়া বিষয় নেই অর্থাৎ বিষয় কিছু এসে বলে না যে তারা আছে কিন্তু তুমিই বল যে এই বিষয়গুলো আছে। অতএব বিষয়গুলো যে দেখে তার অনুভূতির অনুরূপ। সেগুলোর কোন দ্রষ্টানিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। খুঁজে দেখো তুমি কে, তবেই সৃষ্টি কি বুঝতে পারবে। এটাই সৃষ্টি-প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

ভ—জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র, অপরপক্ষে সৃষ্টি বিশাল। আমরা এ সম্বন্ধে কি করে বুঝবো?

ম—সেই ক্ষুদ্র অণুই বিশাল সৃষ্টির কথা বলছে; অসঙ্গতি কোথায়?

৩৮৮। পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—

শাস্ত্রীয়, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রকল্প আছে।

তারা কি কেউ শেষ কথা বলতে পেরেছে? তারা পারে না। ব্রহ্মকে সূক্ষ্মতম হতে সূক্ষ্ম, মহত্তম হতে মহৎ বলা হয়। অণু একটি পরমাণু, অতি ক্ষুদ্র, এটি সূক্ষ্মবোধে শেষ হয়। এই সূক্ষ্মতা সূক্ষ্ম শরীরের অর্থাৎ মনের। সেই মনের অতীতে আত্মা। মহত্তমও একটা ধারণা, সে ধারণাটা মনের; এই মনের অতীতে আত্মা সুতরাং আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

সৃষ্টি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ থাকতে পারে। এদের সবগুলোই বাইরের দিকে বিস্তৃত। এদের সংখ্যার শেষ হবে না কারণ স্থান ও কাল অসীম। যা হোক তারা সবই মনেতে রয়েছে। মনকে দেখো; স্থান ও কালের অতীত হয়ে যাবে আর আত্মা অনুভূত হবে।

সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বা যুক্তিপূর্বক আপন মনোমত ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কি কোন চরম সিদ্ধান্ত হয়েছে? এই বর্ণনাকে 'ক্রমসৃষ্টি' বলে। অপর পক্ষে 'দৃষ্টিসৃষ্টি' যুগপৎ সৃষ্টি। দ্রষ্টা ছাড়া কোন দর্শন নেই। দ্রষ্টাকে খোঁজো, সৃষ্টিও তার অন্তর্গত। একটার পর একটা অনন্ত ব্যাপারের কেবল অর্থ খুঁজে যাওয়া, বাইরে দেখার কি দরকার?

৩৮৯। শ্রীভগবানের কাছে উপহার নিয়ে আসা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—ওরা কেন উপহার নিয়ে আসে? আমার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমি আপত্তি করলেও ওরা জোর করে উপহার দেয়। কিসের জন্য? যদি গ্রহণ করি তবে ওদের মতে চলতে হয়। যেন টোপ দিয়ে মাছ ধরা। মৎস্যশিকারী কি মাছকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত? না, সে নিজে মাছ খাবার জন্য ব্যস্ত।

একজন সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশানন্দ—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অর্থ কি?

ম—এই শব্দগুলোর প্রসঙ্গানুসারে অর্থ করা হয়। জ্ঞান= সামান্য জ্ঞান বা শুদ্ধ চেতনা। বিজ্ঞান=বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ (১) জাগতিক (আপেক্ষিক জ্ঞান); আর (২) আধ্যাত্মিক হতে পারে।

বিশেষের জন্য মনের দরকার; এটা পরম চৈতন্যের বিশুদ্ধতার মধ্যে বিকার আনে। সুতরাং বিজ্ঞান বলতে বুদ্ধি ও তার কোষ অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞানকে বোঝায়। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের অর্থ সামান্য জ্ঞান যা বিজ্ঞান, সংজ্ঞান, প্রজ্ঞান, অজ্ঞান, মতি, ধৃতি ইত্যাদি মনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে রয়েছে (ঐতরেয় উ-৩ দ্রঃ); কিংবা জ্ঞানের অর্থ পরোক্ষ জ্ঞান আর বিজ্ঞান অপরোক্ষ যেমন 'জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা' (একজন যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়েছে)।

ভ—ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্বন্ধ?

ম—জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেই ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে।

ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেরূপ বলা কি সম্ভব?

ম—আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারি তবে ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গেই বা বলতে পারব না কেন?

ভ—তবে আমাদের কেন হয় না?

ম—এর জন্য মনের শুদ্ধি ও শক্তি এবং ধ্যানের অভ্যাস প্রয়োজন।

ভ—এগুলো হলে কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন?

ম—তুমি নিজে যেরূপ সত্য এরূপ দর্শনও ঠিক সেরূপ সত্য। অন্যভাবে যখন তুমি জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে শরীর বলে নির্ধারণ কর তখন স্থূল বস্তু দেখো; যখন তুমি সূক্ষ্ম শরীরে বা মনের ভূমিতে যেমন স্বপ্নে তখন তুমি সূক্ষ্ম বস্তু দেখো; যখন কোন নির্ধারণ নেই যেমন সুষুপ্তিতে তখন তুমি কিছুই দেখো না। দ্রষ্টার অবস্থার সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এটা ঈশ্বর-দর্শনের পক্ষেও প্রযোজ্য।

দীর্ঘ অভ্যাসে ঈশ্বরের যে রূপের ধ্যান করা যায় তা স্বপ্নে, পরে জাগ্রতেও দর্শন হয়।

ভ—এটা কি ঈশ্বর-উপলব্ধি?

ম—অনেকদিন আগের একটা ঘটনা শোন—

নামদেব নামে একজন মহাত্মা ছিল। আমরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করি সেও তেমনি বিঠোবাকে দেখত, কথা বলত আর তার সঙ্গে খেলা করত। সে প্রায় সমস্ত সময়ে মন্দিরে বিঠোবার সঙ্গে খেলা করে কাটাত।

কোন এক অবসরে সব মহাত্মারা একত্র হলেন। তার মধ্যে স্বনামধন্য বিখ্যাত জ্ঞানদেবও ছিলেন। জ্ঞানদেব গোরা কুম্ভারকে (একজন কুম্ভকার মহাত্মা) বললেন যে, সে যেমনভাবে তার হাঁড়ীগুলো পাকা কি না পরীক্ষা করে সেইভাবে এই সমবেত মহাত্মারা পাকা কিনা পরীক্ষা করে দেখুক। সে অনুসারে গোরা কুম্ভার তার লাঠি নিয়ে পরিহাস ছলে যেন পরীক্ষা করছে এভাবে সকলের মাথায় ধীরে ধীরে এক এক ঘা দিয়ে পরীক্ষা করলে। যখন সে নামদেবের কাছে এল সে (নামদেব) ক্রুদ্ধ হয়ে আপত্তি করলে; সবাই হেসে উঠল আর পরিহাস করতে লাগল। নামদেব আরও ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরে বিঠোবার কাছে গেল। বিঠোবা বললে যে মহাত্মারা কি করণীয় জানেন, তাতে নামদেব আরও রেগে গেল।

সে বললে, "তুমি ঈশ্বর। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি আর খেলা করি। এর থেকে মানুষের আর বেশী কি পাওয়ার আছে?"

বিঠোবা তবুও বললে, "মহাত্মারা জানেন।"

নামদেব বললে, "তোমার থেকে আরও অধিক কি সত্য আছে আমায় বলো।"

বিঠোবা বললে, "আমরা এত বেশী ঘনিষ্ঠ যে আমি বললে তোমার ওপর তার প্রভাব হবে না। বনের মধ্যে ভিক্ষু মহাত্মার কাছে যাও আর সত্যকে জানো।"

বিঠোবার কথানুসারে নামদেব বনে সেই সাধুকে খুঁজে বার করলে। কিন্তু তাকে উলঙ্গ, অপরিচ্ছন্ন ও মাটিতে শুয়ে শিব লিঙ্গের ওপর তার পা রাখা দেখে তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে নামদেবের বিশ্বাস হল না। সে ভাবতে লাগল এ কি করে সাধু হয়। অন্যপক্ষে সাধু কিন্তু তাকে

দেখে হাসলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, "বিঠোবা তোমায় পাঠিয়েছে ?" এটা শুনে নামদেবের খুব আশ্চর্যবোধ হল ও একটু বিশ্বাস হল। সেজন্য নামদেব জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাকে একজন সাধু মহাত্মা বলা হয়, তবে আপনি লিঙ্গকে অপমান করছেন কেন ?" মহাত্মা বললেন, "বাস্তবিক, কিন্তু আমি এত বৃদ্ধ ও দুর্বল যে করণীয় কাজ করতে পারি না। তুমি আমার পা দু'টি তুলে যেখানে লিঙ্গ নেই সেখানে রেখে দাও।" নামদেবও তাঁর পা দু'টি তুলে অন্য স্থানে রাখলে। কিন্তু সেখানেও পায়ের তলায় আবার একটি লিঙ্গ। যেখানেই রাখে সেখানেই পায়ের তলায় একটি করে লিঙ্গ। অগত্যা নামদেব পা দু'টি নিজের ওপর রেখে নিজেও লিঙ্গ হয়ে গেল। তখন নামদেব বুঝলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আর সত্য জেনে চলে গেল। সে বাড়ী গিয়ে আর কয়েকদিন মন্দিরে গেল না। এখন বিঠোবা তার বাড়ী এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে যে কেন সে আর মন্দিরে দেবদর্শনে যায় না। নামদেব বললে, "এমন কোন স্থান কি আছে যেখানে তিনি নেই ?"

গল্পের মূল বক্তব্য স্পষ্ট। ঈশ্বর-দর্শন আত্মজ্ঞানের নিম্নভূমি।

৩৯০। ভ—আমি শ্রীভগবানের বই পড়ে দেখছি যে অনুসন্ধান আত্মজ্ঞান লাভের একটা উপায়।

ম—হাঁ, ওটা বিচার।

ভ—এটা কি করে করা হয় ?

ম—প্রশ্নকর্তা নিশ্চয় তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। 'আমি আছি'ই উপলব্ধি। এই সূত্র ধরে যতক্ষণ না উপলব্ধি হয় ততক্ষণ অনুসন্ধান, এটাই বিচার। বিচার ও জ্ঞান এক।

ভ—এটা অস্পষ্ট। কিসের ওপর ধ্যান করব ?

ম—ধ্যান বললে একটা ধ্যেয় বস্তু আছে, অন্যপক্ষে বিচারে ধ্যেয় বস্তু ছাড়া যে ধ্যান করে কেবল সেই থাকে। ধ্যান ও বিচারের এই পার্থক্য।

আত্মজ্ঞানের পক্ষে ধ্যান কি একটা উপযোগী প্রক্রিয়া নয় ?

ম—ধ্যান কোন একটা বিষয়ের ওপর একাগ্রতা। এটা অন্য চিন্তাকে দূরে রাখতে ও মনকে একটা চিন্তায় লেগে থাকতে সাহায্য করে, আত্মজ্ঞানের পূর্বে এটাও চলে যাওয়া চাই। কিন্তু জ্ঞান একটা নূতন কিছু পাওয়ার বস্তু নয়। এটা সর্বদাই আছে, কেবল চিন্তার পর্দা দিয়ে আবৃত হয়ে রয়েছে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস সেটা কেবল এই পর্দাকে সরানো, তাহলে জ্ঞান আপনা হতে প্রকাশ পায়।

যদি একজন প্রকৃত মুমুক্ষুকে ধ্যান করতে বলা হয়, অনেকেই এই উপদেশ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার মধ্যে কয়েকজন ফিরে জিজ্ঞাসা করবে, "কোন একটা বস্তু ধ্যান করার আমি কে ?" এরূপ লোকদের নিজেকে খুঁজতে বলতে হবে। সেটাই শেষ কথা। সেটাই বিচার।

ভ—ধ্যান ছাড়া কেবল বিচার করলেই হবে ?

ম—বিচার স্বয়ং পথ ও লক্ষ্য। 'আমি আছি'ই লক্ষ্য ও চরম সত্য। এটিকে প্রয়াসের দ্বারা ধরে থাকা বিচার। যখন এটা সহজ ও স্বাভাবিক সেটাই উপলব্ধি।

৩৯১। সেই সন্ন্যাসী দর্শনার্থী স্বামী লোকেশানন্দ সমাধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন—

ম—(১) সত্যকে ধরে থাকা সমাধি।

(২) চেষ্টা ক'রে সত্যকে ধরে থাকা সবিকল্প সমাধি।

(৩) সত্যে ডুবে যাওয়া ও জগৎ ভুল হয়ে যাওয়া নির্বিকল্প সমাধি।[১]

(৪) অজ্ঞানে ডুবে যাওয়া ও জগৎ ভুল হয়ে যাওয়া সুষুপ্তি (সুষুপ্তিতে মাথা নুয়ে যায়, সমাধিতে যায় না)।

---

১. পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য।

১ এদের আরও ভাগ করা যায়—

সবিকল্প সমাধি		নির্বিকল্প সমাধি	
বাহ্য	আন্তর	বাহ্য	আন্তর
দৃশ্যানুবিদ্ধ মন একটা বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে বিচরণ করে, একে এদের পশ্চাতে সত্যের ভূমিতে স্থির করো।	মন কাম, ক্রোধ ইত্যাদিতে অশান্ত হয়। দেখো এরা কোথা হতে উঠছে আর এদের সত্তা কোথায় রয়েছে। এদের উৎসকে ধরো।	সমস্ত ব্যাপারের অন্তর্নিহিত অধিষ্ঠান এক সত্যে ডুবে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা।	সকল চিন্তার উৎস সেই অন্তর্নিহিত সত্যে ডুবে গিয়ে কোন কিছু না জানা।
শব্দানুবিদ্ধ এক সত্যকে বাহ্য ব্যাপারের মূল উৎস বলা হয়, তাকে খুঁজে একেই ধরে থাকো।	অন্তরের সত্য থেকে বহু প্রকারের চিন্তার উদয় ও প্রকাশ হয়। সেই সত্যকে ধরো।	এই অবস্থাকে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার জল স্থির ও শান্ত।	এই অবস্থাকে নিবাত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, বায়ু দ্বারা যার চাঞ্চল্য হয় না।
এই চার প্রকার সমাধি প্রযত্নের দ্বারা লাভ হয়।		যখন বিনা আয়াসে এই বিভিন্ন প্রকার নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ হয় আর দেখা যায় যে নিস্তরঙ্গ বাহ্য সমাধি ও নিবাত প্রদীপের ন্যায় আন্তর সমাধি এক, তখন তাকেই সহজ নির্বিকল্প সমাধি বলে।	

(৫) বিনা আয়াসে মূল স্বরূপে থাকা সহজ নির্বিকল্প সমাধি।

ভ—বলা হয় যে একুশ দিন নির্বিকল্প সমাধিতে থাকলে দেহত্যাগ হয়ে যায়।

ম—সমাধির অর্থ দেহাত্ম বুদ্ধির অতীত হওয়া, আর শরীরকে আত্মারূপে নির্ধারণ না করা তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত।

বলা হয় এমন লোকও আছে যারা সহস্রবর্ষ কিংবা তারও অধিক কাল নির্বিকল্প সমাধিতে আছেন।

৩৯২। (স্বামী লোকেশানন্দ আরও কতগুলো প্রশ্ন করলেন।)

ভ—লোকে বলে জ্ঞান লাভের পূর্বে কুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে হবে ও তার উত্থানে শরীর উষ্ণ বোধ হয়, এটা কি ঠিক?

ম—যোগীরা কুণ্ডলিনী বলে। এটাই ভক্তের ভগবতাকারা বৃত্তি ও জ্ঞানীদের ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। এটা জ্ঞানের পূর্ববর্তী অবস্থা। যে অনুভূতি হয় তাকে উষ্ণতা বলা যেতে পারে।

ভ—কুণ্ডলিনীকে সাপের মত বলা হয়, কিন্তু বৃত্তিরা এরূপ হতে পারে না।

ম—জ্ঞানমার্গের কুণ্ডলিনীকে হৃদয় বলা হয়; তাকে নানা ভাবে বর্ণনা করা হয় যেমন নাড়ীজাল, সর্পাকৃতি, পদ্মকোরক ইত্যাদি।

ভ—এই হৃদয় ও প্রাণী বিজ্ঞানের হৃদ্‌যন্ত্র কি এক?

ম—না, 'শ্রীরমণ গীতায়' একে 'আমি'-চিন্তার উৎস বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ভ—কিন্তু আমি পড়লাম যে এটা বুকের ডান দিকে।

ম—এটা কেবল ভাবনার সুবিধার জন্য। অনেক বই-এ ষট্‌চক্র ও আরও অন্যান্য আন্তর ও বাহ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে; এই হৃদয়ের বর্ণনা অন্যান্য অনেক লক্ষ্যের মধ্যে একটা। কিন্তু এর কোন

প্রয়োজন নেই। এটা কেবলমাত্র 'আমি'-চিন্তার উৎস। এটাই চরম সত্য।

ভ—একে অন্তঃকরণের উৎস বলে ধরে নিতে পারি ?

ম—অন্তঃকরণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, (১) জ্ঞান ; (২) মন ; (৩) বুদ্ধি ; (৪) স্মৃতি (চিত্ত) ও (৫) অহংকার ; কেউ শেষ চারটি নেয় ; কেউ দু'টি যথা মন ও অহংকার, আবার অনেকে বলে অন্তঃকরণ একটি, তার বিভিন্ন বৃত্তির জন্য তাকে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়, সেজন্য বিভিন্ন নাম। এরূপে হৃদয়ই অন্তঃকরণের উৎস।

এই শরীরটা রয়েছে, এটা জড় ; আত্মা রয়েছে, সে শাশ্বত ও স্বয়ংপ্রকাশ ; এই দু'টির মধ্যে একটা ব্যাপার অর্থাৎ অহংকার উঠেছে। সেটাই বিভিন্ন নামে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, শক্তি, প্রাণ ইত্যাদিরূপে পরিচিত। তোমার উৎস খোঁজো ; অন্বেষণ তোমায় স্বতঃই হৃদয়ে নিয়ে যাবে। সূক্ষ্ম শরীরকে বর্ণনা করার জন্য অন্তঃকরণ একটা কল্পনামাত্র। স্থূল শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দ্বারা গঠিত, এটা জড়। আত্মা বিশুদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ সেজন্য নিত্যসিদ্ধ। এই দুই-এর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটা সূক্ষ্মশরীর মেনে নেওয়া হয় যেটা একদিকে পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে অন্যদিকে আত্মার প্রতিফলিত জ্যোতি দ্বারা গঠিত। এইরূপে সূক্ষ্মশরীর যা মনেরই নামান্তর তা চিদ্‌জড়াত্মক অর্থাৎ আভাস। আবার পঞ্চভূতের ওপর সত্বগুণের ক্রিয়ার জন্য তাদের সত্ব অংশ মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে, রজোগুণের ক্রিয়ার জন্য রজ অংশ প্রাণ ও কর্মেন্দ্রিয় রূপে আর তমোগুণের ক্রিয়ার জন্য তম অংশ শরীর ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়।

ভ—কিন্তু মনেরও তিনগুণ আছে বলা হয়।

ম—হাঁ, সত্বের সত্ব, সত্বের রজঃ (ক্রিয়াশীলতা) আর সত্বের তমঃ (জড়তা) ইত্যাদি। শুদ্ধ সত্ব একেবারে বিশুদ্ধ ; মিশ্র সত্ব সত্বের সঙ্গে অন্যান্য গুণের মিশ্রণ। সত্ব বলতে অন্য দু'টি গুণের মধ্যে এর প্রাধান্য বোঝায়।

পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—বলা হয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা সব কিছু সরল ক'রে সত্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু তারা বাস্তবিকপক্ষে যেখানে কোন জটিলতা নেই সেখানে জটিলতার সৃষ্টি করে। কিছু জানার জন্য আত্মা নিশ্চয় আছে। আত্মা সুস্পষ্ট। আত্মা হয়ে থাকো না কেন ? অনাত্মাকে এত বিচার করার কি দরকার ?

উদাহরণসরূপ বেদান্ত নাও—তারা বলে পনের রকম প্রাণ আছে। শিক্ষার্থীকে তাদের নাম ও ক্রিয়া মুখস্থ করানো হয়। যেটা ওপর দিকে যায় সেটা প্রাণ, যেটা নীচের দিকে যায় সেটা অপান, যেটা ইন্দ্রিয় চালনা করে তার একটা নাম। এ সবের কি দরকার ? তাদের ভাগ করা, নাম দেওয়া ও তাদের ক্রিয়ার বর্ণনা ইত্যাদি করা কেন ? একটা প্রাণ সব কিছু করছে জানাই কি যথেষ্ট নয় ?

অন্তঃকরণ চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, বিচার করে, ইত্যাদি আর প্রত্যেক ক্রিয়ার এক একটা নাম যেমন মন, বুদ্ধি ইত্যাদি। কেউ কি প্রাণ বা অন্তঃকরণকে দেখেছে ? তাদের কি কোন প্রকৃত সত্তা আছে ? এরা কেবল কতগুলো ধারণা। এই ধারণাগুলোর কোথায় বা কখন শেষ হবে ?

আবার দেখো—

একজন ঘুমায়। সে ঘুমিয়ে উঠে বলে যে সে ঘুমিয়েছিল। প্রশ্ন করা হয় 'সে ঘুমের মধ্যে সে যে ঘুমিয়ে আছে তা বলে না কেন ?' উত্তর দেওয়া হয় যে, যেমন একজন জলে ডুবে তলা থেকে কোন জিনিস তুলে আনার সময় যতক্ষণ না সে জিনিসটা তুলে নিয়ে আসে ততক্ষণ কথা বলতে পারে না, তেমনি সে আত্মাতে ডুবে গিয়েছিল সেজন্য কথা বলতে পারে না। আচ্ছা এর কারণ কি ?

জলে ডুবে থাকার জন্য কথা বলতে মুখ খুললে তার মুখে জল ঢুকে যায়, এটা ঠিক কি না ? কিন্তু দার্শনিক এই সহজ ব্যাখ্যায় খুশি নয়। সে ব্যাখ্যা করে অগ্নি বাক্যের দেবতা, ইনি জলের শত্রু সেজন্য ইনি তখন কাজ করেন না। একেই দর্শন বলে আর শিক্ষার্থীরা

এই সব শেখার জন্য পরিশ্রম করছে। এগুলো কি কেবল সময় নষ্ট করা নয়? আবার ব্যষ্টি জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়তে বিভিন্ন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে বলা হয়। তারা আবার বিরাটের (সমষ্টির) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়। এরূপে হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে। জটিলতার সৃষ্টি ক'রে তারপর তার ব্যাখ্যা করতে হবে কেন? আঃ! সেই লোকই ভাগ্যবান যে নিজেকে এই সব জটিলতার মধ্যে জড়ায় না!

আমি সত্যই ভাগ্যবান কারণ আমি এ সবের মধ্যে যাই নি। যদি এ সব করতাম তবে কোথায় তলিয়ে যেতাম—সর্বদাই বিভ্রান্ত হতাম। আমার পূর্ববাসনা আমায় সোজা 'আমি কে?' অনুসন্ধানে নিয়ে গিয়েছিল। এটা একটা সৌভাগ্য বলতেই হবে!

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৯৩। ভ—'প্রবুদ্ধ ভারতে'র মার্চ সংখ্যায় সাধ্বী তেরেসার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তিনি ম্যাডোনার (মা মেরী) একটি মূর্তির ভক্ত ছিলেন, সেটি তাঁর কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আর তিনি পরমানন্দ লাভ করতেন। এটা আর 'শক্তিপাত' কি এক?

ম—মূর্তির জীবন্ত হওয়া 'ধ্যানবলে'র ফল। শক্তিপাতের ফলে মনের অন্তর্মুখীনতা হয়। নিজের ছায়ার ওপর ধ্যান করার একটা পদ্ধতি আছে যাতে সেটা সজীব হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়। এটা মনের শক্তি বা ধ্যানবলের ক্রিয়া। যা কিছু বাইরে সবই ক্ষণস্থায়ী। এরূপ ব্যাপার কিছুক্ষণ আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু স্থায়ী শান্তি হয় না। এটা কেবলমাত্র অবিদ্যা অপসারিত হলেই হয়।

৩৯৪। ভ—মন স্থির হয় কি করে ?

ম—মনকে মনের দ্বারা দেখলে কিংবা মনকে আত্মায় স্থির করলে মন আত্মার অধীন হয়।

ভ—এর জন্য কোন যোগ অর্থাৎ প্রণালী আছে ?

ম—বিচারই যথেষ্ট।

৩৯৫। ভ—পূর্ণব্রহ্ম কি করে লাভ হয় ? গৃহস্থের পক্ষে কোন্ পথটা ভাল ?

ম—তুমি আগেই বলেছ পূর্ণ অর্থাৎ পরোৎকর্ষ। তুমি কি পূর্ণ থেকে পৃথক ? যদি পৃথক হও তবে কি সেটা পূর্ণ হয় ? আর যদি এক হও তবে প্রশ্ন কর কি করে ? ব্রহ্ম পূর্ণ আর তুমি তার থেকে পৃথক নও, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এটি দেখো, তবেই দেখবে যে তুমি গৃহস্থ নও বা কোন উপাধিযুক্ত নও।

ভ—তত্ত্বগুলো কি ?

ম—পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানই অন্য সব তত্ত্বকে জানিয়ে দেবে।

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৯৬। ওলন্দাজ মহিলা শ্রীমতী গণগ্রিপ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির একজন অতি উৎসাহী কর্মী। ইনি বহুদিন জাভায় কাজ করেছেন, উপস্থিত আডেয়ারে থাকেন, অল্প সময়ের জন্য দর্শনে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

থিয়সফিতে 'তন্‌হার' কথা বলা হয় অর্থাৎ পুনর্জন্মের তৃষ্ণা। এর কারণ কি ?

ম—পুনর্জন্মের তৃষ্ণার অর্থ আবার জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা যাতে জন্মান্তর শেষ হয়ে যায়। জীবাত্মা এখন মৃতপ্রায় ; একে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে যাতে বর্তমান আপাত মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়। তোমার

প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যাওয়াই বর্তমান মৃত্যু ; মনে রাখাই পুনর্জন্ম। এটা হলেই জন্মান্তর রোধ হয়। জীবন তোমার শাশ্বত।

ভ—আমি তন্‌হার অর্থ 'জীবনকে ধরে থাকা'—শাশ্বত জীবনের ইচ্ছা বুঝি।

ম—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ইচ্ছা হয় কেন? কারণ বর্তমান জীবন অসহ্য। কেন? কারণ এটা তোমার স্বরূপ নয়। যদি এটা তোমার স্বরূপ হত তবে কোন ইচ্ছা তোমায় বিচলিত করত না। তোমার স্বরূপ থেকে বর্তমান অবস্থার কি পার্থক্য? প্রকৃতপক্ষে তুমি আত্মা। যা হোক, সেই আত্মা নিজেকে ভুল করে স্থূল শরীর বলে মনে করছে। শরীরটা মনের দ্বারা অভিক্ষিপ্ত হয়েছে, মনটা আত্মা থেকে উঠেছে। যদি ভুল নির্ধারণটা থেমে যায় তবেই শান্তি ও অবর্ণনীয় আনন্দ হয়।

ভ—শরীরেই জীবন আর অন্য একটা শরীর ধারণ করাই পুনর্জন্ম।

ম—কেবলমাত্র শরীরের পরিবর্তন হলে কোন লাভ নেই। এই শরীরের অহংকারটা আর একটা শরীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তাতে আর একজনের কি সন্তোষ হবে?

অধিকন্তু জীবন কি? জীবন অস্তিত্ব যা তোমার আত্মা। সেটা শাশ্বত জীবন। পক্ষান্তরে এমন সময় কি তুমি চিন্তা করতে পারো যখন তুমি থাকো না।

সেই জীবন এখন শরীর-সাপেক্ষ হয়েছে আর তুমি তোমার সত্তাকে ভুল ক'রে শরীর বলে নির্ধারণ করছ। তুমি নির্বিশেষ চেতনা। এই শরীরগুলো তোমাতে মনের অভিক্ষেপরূপে এসে পড়ে আর তুমি দেহাত্মবোধরূপ ধারণার দ্বারা কষ্ট পাও। যদি এ ধারণা থেমে যায় তুমিই তোমার আত্মা।

জন্মাবার আগে তুমি কোথায় ও কিরূপে ছিলে? তুমি কি সুষুপ্তিতে ছিলে? কিরূপে ছিলে? তখনও তুমি শরীর ব্যতীত

থাকো। তারপর অহংকার জাগে আর তারও পর যে মন শরীরটা অভিক্ষেপ করে সে জাগে। তার ফল দেহাত্মবুদ্ধি। যেহেতু শরীরটা আছে তাই বলছ যে তুমি জন্মেছ আর তুমি মরবে, এবং এই ধারণাটা আত্মায় আরোপ করে বলছ যে তুমি জন্মেছ আর মরবে। বস্তুতঃ তুমি সুষুপ্তিতে শরীর ছাড়াই থাকো; এখন শরীরে আছ। আত্মা শরীর ছাড়া থাকতে পারে কিন্তু শরীরটা আত্মা ছাড়া থাকে না।

দেহাত্মবুদ্ধি অজ্ঞান, শরীরটা আত্মার অতিরিক্ত নয় জ্ঞান। জ্ঞান ও অজ্ঞানে এই পার্থক্য।

শরীরটা মনের অভিক্ষেপ; মনই অহংকার আর অহংকার আত্মা থেকে ওঠে। সুতরাং দেহবুদ্ধি বিক্ষেপকারী ও আত্মা থেকে বিচ্যুতি ঘটায়। শরীর বা জন্মটা কার হয়? এটা আত্মার নয়। এটা যে নিজেকে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে সেই অনাত্মার। যতক্ষণ এই পার্থক্যবোধ আছে ততক্ষণ কষ্টদায়ক চিন্তাও আছে। যদি মূল উৎসকে ফিরে পাওয়া যায় আর পার্থক্যবোধ একেবারে চলে যায় তখন শান্তি হয়।

বিবেচনা করো, যখন একটা পাথর উপর দিকে ছোড়া হয় তখন কি হয়? সে তার আধার ছেড়ে অভিক্ষিত হয়, ফিরে আসার চেষ্টা করে আর যতক্ষণ না উৎসে, যেখানে তার বিশ্রাম, ফিরে আসে ততক্ষণ সে সর্বদা গতিশীল হয়। ঠিক সেইরূপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়, মেঘ হয়ে বায়ুর দ্বারা চালিত হয়, জমে জল হয়, বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ে পড়ে, পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা ও নদী হয় আর যতক্ষণ না তাদের উৎস সমুদ্রে পৌঁছায়, বয়ে চলে, সেখানে পৌঁছালে তাদের শান্তি হয়। এইরূপে দেখ, যেখানেই উৎস থেকে বিচ্ছেদ সেখানেই যতক্ষণ না এই বিচ্ছেদ-ভাব দূর হচ্ছে ততক্ষণ একটা চাঞ্চল্য আর গতি রয়েছে। তোমার নিজের ক্ষেত্রেও তাই। এখন যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর বলে নির্ধারণ করছ সেজন্য নিজেকে আত্মা থেকে—প্রকৃত সত্তা থেকে পৃথক

ভাবছ। এই ভুল নির্ধারণ নষ্ট করার জন্য তোমায় তোমার উৎস ফিরে পেতে হবে আর তবেই তুমি আনন্দ পাবে।

সোনা কোন একটা গহনা নয় কিন্তু গহনা সোনা ব্যতীত কিছু নয়। গহনার গড়ন যাই হোক, যত প্রকার গহনাই হোক না কেন তারা একটাই বস্তু, যথা সোনা। সেরূপ শরীরসমূহও আত্মা। আত্মাই অদ্বিতীয় সত্য। নিজেকে শরীর ব'লে নির্ধারণ করা আর আনন্দ খোঁজা ঠিক যেন কুমীরের পিঠে চড়ে নদী পার হওয়া। বহির্মুখী প্রবৃত্তি ও মনের চাঞ্চল্যের জন্যই (আত্মাকে) শরীর ব'লে নির্ধারণ হয়। এই অবস্থায় থেকে যাওয়ার অর্থ অসংখ্য জালে জড়িয়ে পড়া আর শান্তি না হওয়া। উৎস খোঁজো, আত্মায় ডুবে যাও আর একক হয়ে থাকো।

পুনর্জন্মের অর্থ বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ ও যেখানে অসন্তোষ নেই সেখানে জন্মানোর ইচ্ছা। জন্মটা শরীরের হওয়ায় সেটা আত্মাকে প্রভাবিত করে না। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা ঠিক থাকে। শাশ্বত আত্মাকে নশ্বর দেহ বলে ভুল করাটাই অসন্তোষ। শরীরটা অহংকারের অবশ্যম্ভাবী উপাধি। যদি অহংকার নাশ হয়ে যায় তবে শাশ্বত আত্মা আপন মহিমায় প্রকাশ পায়।

শরীরটা দণ্ডকাষ্ঠ (ক্রুশ), মানবের পুত্র যীশু অহংকার বা দেহাত্মবুদ্ধি। যখন তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তখন সে মহিমাময় আত্মারূপে, ঈশ্বরের পুত্র যীশুরূপে পুনরুত্থিত হয়!

"যদি জীবিত থাকতে চাও, এই জীবন ত্যাগ করো।"

৩৯৭। ভ—অস্তিত্বশূন্য হওয়ার সম্ভাবনার জন্য ভয় হয়। এটা শরীর সংক্রান্ত। একজন সুষুপ্তিতে শরীর সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে সুষুপ্তিকে ভয় তো করেই না বরং গাঢ় ঘুমের জন্য উদগ্রীব হয় অন্যপক্ষে মৃত্যুকে ভয় পায়। দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হয় কেন?

ম—সুষুপ্তির ইচ্ছা বা মৃত্যুভয় কেবলমাত্র মন যখন সক্রিয়

থাকে তখন হয়, সেই অবস্থায় (সুষুপ্তি বা মৃত্যুতে) এসব নেই। মন জানে যে শরীরের অস্তিত্ব থাকবে আর সুষুপ্তির পর তাকে পাওয়া যাবে। অতএব সুষুপ্তিতে কোন ভয় নেই। আর শরীর-বোধশূন্য অস্তিত্বের আনন্দও কাম্য। অন্যপক্ষে মন তথাকথিত মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কিনা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়, সেজন্য একে ভয় পায়।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৯৮। একজন আবাসিক ভক্ত দণ্ডপাণিস্বামী বর্তমানে উত্তর ভারত ভ্রমণ করছেন ; তিনি 'মডার্ন সাইকোলজিক্যাল রিভিউ' পত্রিকা থেকে কিছু অংশ কেটে পাঠিয়েছেন ; তাতে বলা হয়েছে যে হৃদয়ের শক্তি-সংক্রান্ত কেন্দ্রটি বাঁদিকে নয় ডানদিকে, অন্যপক্ষে স্থূল হৃদ্‌যন্ত্রটি বাঁদিকে।

কথাবার্তা এই বিষয়ে হতে লাগল।

ম—যোগমার্গ ছ'টি চক্রের কথা বলে আর বলে যে অভ্যাসের দ্বারা সেই চক্রে যেতে হবে ও পর পর সেগুলো পার হয়ে সহস্রারে পৌঁছাতে হবে, সেখানে অমৃত লাভ হয় আর এরূপে অমরতা লাভ হয়। যোগীরা বলে মূলাধার চক্র হতে উদ্ভূত পরানাড়ীতে প্রবেশ করতে হয়, অন্যপক্ষে জ্ঞানীরা বলে ঐ নাড়ী হৃদয় থেকে শুরু হয়। এ দু'টি আপাত-বিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় গুহ্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে যৌগিক পরানাড়ী মূলাধার হতে আর জ্ঞান পরানাড়ী হৃদয় থেকে আরম্ভ হয়। মূলতঃ পরানাড়ীতে প্রবেশ করতে হবে। যোগের পদ্ধতিতে একজন নীচে অবধি নেমে, সব কিছু ঘুরে উঠে আসে ; জ্ঞান অভ্যাসে একজন সরাসরি মধ্য বিন্দুতেই স্থির হয়।

ভ—পরার পর পশ্যন্তি ইত্যাদি আসে না।

ম—তুমি 'বাকে'র কথা বলছ, যা (১) পরা, (২) পশ্যন্তি, (৩) মধ্যমা ও (৪) বৈখরী বাকে বিভাজিত হয়েছে। বাক প্রাণ-

শক্তি, অন্যপক্ষে মন তেজরূপ বা চিৎশক্তি। মূল অব্যক্তের প্রকাশই শক্তি।

যোগীরা সহস্রারে অর্থাৎ মস্তিষ্কের চক্র বা সহস্রদল পদ্মে যাওয়াকেই সর্বোত্তম বলে। অনেক যোগী বলে যে এর ওপরে আরও অসংখ্য দল যথা ১০০,০০০ (১০০) বা ১০০,০০০,০০০ (১০৮) দল চক্র আছে। এখনকার মত সেগুলো থাক। তারা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রে যুক্তি দেখায় যে প্রাণশক্তি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, এর ফলে বিয়োগ (বিচ্ছেদ) শুরু হয়। এর বিপরীত পথে যোগ লাভ করতে হবে। অতএব যোগসিদ্ধির জন্য আমাদের যোগ অভ্যাসে সকল প্রাণ কেন্দ্রীভূত করতে হবে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করতে হবে। জ্ঞানীরা দেখান যে যোগীরা শরীরের অস্তিত্ব, আত্মা থেকে তার (শরীরের) পার্থক্য মেনে নেয়, সুতরাং আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যোগ অভ্যাসের পরামর্শ দেয়।

বাস্তবিকপক্ষে শরীরের অস্তিত্ব মনেতেই রয়েছে যার কেন্দ্র মস্তিষ্ক। সেটাও আবার অন্য কোন ধার করা শক্তি দ্বারা কাজ করে। এ কথা যোগীরাও তাদের ব্রহ্মরন্ধ্র প্রকল্পের দ্বারা স্বীকার করেছে। জ্ঞানীরা আরও যুক্তি দেয় যে যদি শক্তি ধার করা হয়ে থাকে তবে সেটা তার মূল উৎস থেকেই করা হয়েছে। অতএব সোজাসুজি মূল উৎসে যাও আর ধার করা শক্তির অপেক্ষা করো না। যেরূপ একটা লোহার পিণ্ড থেকে এক খণ্ড লোহা নিতে হলে তাকে আগুনে দিয়ে উত্তপ্ত ক'রে পৃথক ক'রে তারপর শীতল ক'রে পেতে হয়, আর তাকে পিণ্ডের সঙ্গে মিলিত করতে হলে আবার উত্তপ্ত ক'রে পিণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়, সেরূপ তার বিয়োগের কারণই তার যুক্ত হওয়ার উপায়।

আবার যদি একটা প্রতিবিম্ব থাকে তবে তার একটা উৎস আছে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক বস্তু যেমন সূর্য ও প্রতিবিম্বনের জন্য জলপাত্রও আছে। এখন এই প্রতিবিম্ব দূর করতে হলে জলপাত্রকে ঢাকা দিলে হয়, যেমন যোগীদের ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ কিংবা জলটা শুষ্ক

করে ফেললেও হয়,' যাকে 'তপ' (তপো ব্রহ্মেতি, তপই ব্রহ্ম) বলে, অর্থাৎ চিন্তা বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি। এটা জ্ঞানমার্গ।

যা হোক, এসবই জীব ব্রহ্ম বা আত্মা থেকে পৃথক ধরে নিয়ে বলা হয়। কিন্তু আমরা কি পৃথক ? জ্ঞানী বলে 'না'। অহংকারটা কেবলমাত্র আত্মাকে অনাত্মা বলে ভুল নির্ধারণ যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক ও তার পিছনের পটভূমি। স্ফটিক স্বচ্ছ হলেও তার পটভূমির জন্য তাকে লাল দেখায়। যদি পটভূমি সরিয়ে দেওয়া যায় তবে স্ফটিক তার মূল স্বরূপে প্রকাশ পায়। আত্মা ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধেও সেরূপ।

তবুও উদাহরণটা খুব উপযুক্ত নয়। কারণ অহংকারের উৎস আত্মা হওয়ায় স্ফটিক ও তার পটভূমির মত তারা পৃথক নয়। আত্মাতেই তার মূল হওয়ায় কেবলমাত্র তাকে (অহংকারকে) অনুসরণ করে উৎসে গেলেই সে তার মূলে মিলিয়ে যায়।

অহংকারের কেন্দ্র ও মূলকেই হৃদয় বলে যা আত্মার সঙ্গে এক সমান।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন যে যোগীরাও কি অন্যপথে অনাহতে গিয়ে জ্ঞানীদের মত হৃদয়-কেন্দ্র অনুভব করে ?

ম—অনাহত ও হৃদয়-কেন্দ্র এক নয়। তাই যদি হয় তবে তারা আবার উজিয়ে সহস্রারে যাবে কেন ? তাছাড়া এ প্রশ্নটা আমাদের এখনও পার্থক্যবোধ থাকার জন্য হয়। আমরা হৃদয়-কেন্দ্র হতে কখনই দূরে নই। অনাহতে পৌঁছাবার আগে কিংবা অনাহত পার হয়ে গেলেও একজন কেবল কেন্দ্রেই থাকে। একজন বুঝুক বা না বুঝুক সে কেন্দ্র হতে কখনই দূরে নয়। যোগ অভ্যাস বা বিচার কেবল এই কেন্দ্রে থেকেই হয়।

ভ—আমাদের সাধনা কী হবে ?

ম—সাধকের সাধনা সিদ্ধের সহজ অবস্থা। সহজই মূল অবস্থা, অতএব এই নিত্যসত্যের উপলব্ধির বাধাগুলো দূর করাই সাধনা।

ভ—মনের একাগ্রতা কি একটা সাধনা ?

ম—একাগ্রতা কোন একটা বস্তু চিন্তা করা নয়। অন্যপক্ষে যা আমাদের সত্য দর্শনের বাধা সেই চিন্তাগুলোকে শমন (বন্ধ) করা। আমাদের যা কিছু চেষ্টা সেটা কেবল অজ্ঞানের আবরণ দূর করার জন্য। এখন চিন্তা দমন করা কষ্টকর মনে হচ্ছে। প্রবুদ্ধ অবস্থায় চিন্তা আনা আরও কষ্টকর। কারণ সেখানে চিন্তা করার কি কিছু আছে ? কেবল আত্মাই আছে। বিষয় থাকলে তবেই চিন্তা হয়। কিন্তু সেখানে কোন বিষয় নেই। তবে আর চিন্তা উঠবেই বা কি করে ?

অভ্যাসই আমাদের চিন্তা রোধ করা যায় না বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। যদি ভুলটা বোঝা যায় তবে একজন এত বোকা নয় যে সে চিন্তা ক'রে বৃথা কষ্ট পাবে।

ভ—অভ্যাসের অপেক্ষা কৃপা কি আরও কার্যকরী নয় ?

ম—গুরু কেবল অজ্ঞান দূর করতে সাহায্য করেন। তিনি কি জ্ঞান তোমার হাতে তুলে দেন ?

ভ—আমরা অজ্ঞান।

ম—তোমার নিজেকে অজ্ঞান বলাতেও জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে। একজন পাগল কি নিজেকে পাগল বলে ?

গুরুকৃপা কেবল জল থেকে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা অজ্ঞান দূর করার জন্য তোমার পথ সহজ করে দেওয়া।

ভ—এটা কি অবিদ্যারূপ রোগ দূর করার পক্ষে ওষুধ নয় ?

ম—ওষুধ কিসের জন্য ? এটা কেবল পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য। গুরু, কৃপা, ঈশ্বর ইত্যাদির কথা কেন ? গুরু কি তোমার হাত ধরে কানে কানে কিছু বলেন ? তুমি তাঁকে তোমার মত মনে কর। যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর ভাবো তাঁকেও তাই ভেবে মনে কর যে তিনি স্থূল একটা কিছু করবেন। তাঁর কাজ অন্তরে। গুরু কিভাবে লাভ হয় ? অন্তর্যামী ঈশ্বর তাঁর অসীম

করুণায় ভক্তের ওপর অনুকম্পা ক'রে তার অবস্থানুযায়ী গুরুরূপে প্রকাশ হন। ভক্ত তাঁকে একজন মানুষ মনে করে আর অন্যান্য লোকের মত তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হবে আশা করে। কিন্তু গুরু যিনি ঈশ্বর বা আত্মার প্রতিমূর্তি তিনি অন্তরে থেকে কাজ করেন, তাকে তার ভুল বুঝিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে অন্তরে আত্মাকে উপলব্ধি করে ততক্ষণ ঠিক পথে চালিত করেন।

উপলব্ধি হলে শিষ্য অনুভব করে, "আমি আগে কত চিন্তিত হচ্ছিলাম। যেরূপ পূর্বে ছিলাম এখনও সেইরূপ আত্মাই আছি তবে কিছুতে বিচলিত হই না; যে লোকটা কষ্ট পাচ্ছিল সেটা কোথায় গেল? তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।")

আমাদের এখন কি করতে হবে? কেবল গুরুর কথা বিশ্বাস ক'রে অন্তরে কাজ। গুরু উভয়তঃ বাইরে ও অন্তরে। তিনি বাইরের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তোমাকে অন্তর্মুখী করেন আর অন্তঃ শুদ্ধ ক'রে কেন্দ্রে আকর্ষণ করেন। এরূপে তিনি বাইরে থেকে ঠেলে দেন আর অন্তর থেকে টেনে নেন যাতে তুমি কেন্দ্রে থাকতে পারো।

সুষুপ্তিতে তুমি আন্তরকেন্দ্রিক। ঘুম থেকে উঠলেই মন তৎক্ষণাৎ বাইরে ছুটে যায়: এটা ওটা নানা বিষয় চিন্তা করে। এটা দমন করতে হবে। এটা কেবল যে শক্তি অন্তরে ও বাইরে কাজ করে তার পক্ষেই করা সম্ভব। তাকে কি একটা শরীর বলা যায়? আমরা মনে করি আমাদের চেষ্টায় জগৎ জয় করা যায়। বাইরে ব্যর্থ হয়ে অন্তরে খুঁজলে অনুভব করি, "ওহো! মানুষের অপেক্ষা আরও উচ্চশক্তি আছে।" এই উচ্চশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে ও তাকে মানতে হবে। অহংকারটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী হাতী আর একে একটা সিংহ ছাড়া কেউ বশে আনতে পারবে না, তিনি এ ক্ষেত্রে গুরু ছাড়া আর কেউ নন; তাঁর দৃষ্টিমাত্রে হাতীটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মরে যায়। ব্যক্তিসত্তার লোপ হওয়াই যে আমাদের গৌরব সেটা আমরা সময়ে বুঝব। এই অবস্থা লাভ করার জন্য একজনকে, "হে

প্রভু! তুমিই আমার শরণ!" এই বলে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তখন গুরু দেখেন, "এই লোকটি উপদেশ পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে." আর তাকে পথ দেখান।

ভ—আত্মসমর্পণ কি?

ম—আত্মসংযম ও এটা এক; সংস্কার অর্থাৎ অহংকারের ক্রিয়াকে দূর করলে আত্মসংযম হয়। একটা উচ্চশক্তিকে স্বীকার করলে অহংকার মাথা নীচু করে। এই মেনে নেওয়াই সমর্পণ বা নিবেদন, সেটাই আত্মসংযম। অপরপক্ষে অহংকার মন্দিরের স্তম্ভে খোদাই করা মূর্তির মতন যেন সেই স্তম্ভের ভার বহন করছে এই ভান করে দাঁড়িয়ে থাকে। অহংকার শক্তি ছাড়া থাকতে পারে না কিন্তু সে মনে করে সে নিজেই সব করছে।

ভ—অশান্ত মনকে কিরূপে বশীভূত করা যায়?

ম—হয় এর মূল খোঁজো যাতে এটা অদৃশ্য হয়, নতুবা সমর্পণ কর যাতে এটা অবদমিত হয়।

ভ—কিন্তু মন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

ম—তা হোক। ও বিষয়ে চিন্তা করো না। যখন আবার মনে পড়ে যায় তখন তাকে ফিরিয়ে এনে অন্তর্মুখীন কর। তা হলেই হবে।

চেষ্টা না করলে কেউ সফল হয় না। মন সংযম কারও জন্মগত অধিকার নয়। যে কয়েকজন সফলকাম হয় সে কেবল তাদের অধ্যবসায়ের শক্তিতেই হয়।

একজন ট্রেনের যাত্রী নিজের বোকামীর জন্যই মাথায় বোঝা নিয়ে বসে থাকে। নীচে নামিয়ে রাখুক না—সে দেখবে যে মালটা ঠিকই পৌঁছে গেছে। অনুরূপভাবে আমাদের নিজেদের কর্তার অভিমান না ক'রে পথ-প্রদর্শক শক্তির কাছে সমর্পণ করলেই হয়।

ভ—স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে একজন আধ্যাত্মিক গুরু শিষ্যকে স্থূলভাবে অধ্যাত্ম শক্তি হস্তান্তর করে দেন।

ম—এটা কি একটা বস্তু যে হস্তান্তর করা যাবে ? হস্তান্তরের অর্থ শিষ্যত্বের বোধ দূর করা। গুরু তা করেন। এটা এ নয় যে সে আগে এক প্রকার ছিল, পরে তার রূপান্তর হল।

ভ—কৃপা কি গুরুর দান নয় ?

ম—ঈশ্বর, কৃপা ও গুরু সমার্থ আর শাশ্বত ও সর্বব্যাপী। আত্মা কি তোমার অন্তরে নেই ? গুরু কি সেটা তাঁর দৃষ্টি দিয়ে অন্তরে দিয়ে দেন ? যদি কোন গুরু এরূপ মনে করেন তবে তিনি গুরু নামের যোগ্য নন।

বই-এ অনেক প্রকার দীক্ষার কথা বলা হয়েছে (দীক্ষা—হস্তদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা, চক্ষুদীক্ষা, মনোদীক্ষা ইত্যাদি)। তারা আরও বলে যে গুরু অগ্নি, জল, জপ, মন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়া করেন আর এই সব কাল্পনিক ক্রিয়াকে দীক্ষা বলে ; যেন গুরু এসব করলে পরেই শিষ্যের পক্কতা হয়।

যদি ব্যক্তিকে খোঁজা যায় তাকে কোথাও পাওয়া যায় না। গুরু এইরূপ। দক্ষিণামূর্তি এইরূপ। তিনি কি করলেন ? তিনি মৌন হয়ে বসে রইলেন ; শিষ্যেরা তাঁর সামনে এল। তিনি মৌনই ধারণ করে রইলেন ; শিষ্যদের সংশয় দূর হয়ে গেল ; তার অর্থ তারা তাদের ব্যক্তিতা হারিয়ে ফেললে। এটাই জ্ঞান আর এর সঙ্গে যে বাক্যবিন্যাস তা জ্ঞান নয়।

মৌনই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ক্রিয়া। শাস্ত্র যতই বিশাল ও শক্তিমান হোক না কেন তাদের প্রভাব ফলপ্রসূ হয় না। গুরু শান্ত আর সবার মধ্যে শান্তি ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত শাস্ত্র অপেক্ষা গুরুর মৌন অনেক ব্যাপক ও অধিক শক্তিশালী। এখানে এত দিন থেকে, এত শুনে, এত চেষ্টা ক'রে কিছু হল না, এই ধারণা থেকেই যত প্রশ্ন হয়। অন্তরে যে কাজ হচ্ছে সেটা চোখে দেখা যায় না। বস্তুতঃ গুরু সর্বদাই অন্তরে আছেন।

তায়ুমানাবর বলে, "হে প্রভু, জন্মজন্মান্তরে আমার সাথে

এসেছ, কোনদিন আমায় ত্যাগ করো নি, শেষ উদ্ধারও করলে।” জ্ঞানের অনুভূতি এই।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা একই কথা অন্যভাবে বলেছে, “আমরা দু’জন কেবল যে এখন তা নয় সর্বদাই এইরূপ।”

ভ—গুরুর কি বাস্তবরূপ হয় না?

ম—বাস্তবের অর্থ কি? তুমি নিজের সত্তাকে শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল, সেজন্য এই প্রশ্ন করছ। খুঁজে দেখো তুমি শরীর কি না।

গীতা বলে—“পরমভাব অজানতঃ” (৯।১১)—যারা (শ্রীকৃষ্ণের) পরমভাব বুঝতে পারে না তারা মূর্খ, অজ্ঞানের দ্বারা বিভ্রান্ত।

গুরু সেই অজ্ঞান দূর করার জন্য আবির্ভূত হন। তায়ুমানাবর বলে যে তিনি একজন মানুষের অজ্ঞান দূর করার জন্য মানুষরূপে আসেন ঠিক যেন একটি পোষা হরিণ দিয়ে বন্য হরিণ ধরা। আমাদের ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধি দূর করার জন্য তাঁকে একটা শরীর ধারণ ক’রে প্রকট হতে হয়।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৩৯৯। বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়ার শ্রীবোস ইতোমধ্যে ‘গৌড়পাদ কারিকা’ ও এস. রাধাকৃষ্ণণের ‘ইণ্ডিয়ান ফিলসফি’ পড়েছেন সুতরাং তিনি এরূপ প্রশ্ন করলেন—

ভ—স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে কি বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে?

ম—তুমি জাগৃতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্নকে ক্ষণস্থায়ী দেখো, সে কারণে পার্থক্য আছে মনে কর। পার্থক্যটা ওপরভাসা, প্রকৃত নয়।

ভ—জাগ্রত অবস্থা কি বস্তু-নিরপেক্ষ?

ম—তা যদি হত তবে দ্রষ্টা ছাড়াও বস্তু থাকত ; অর্থাৎ বস্তু বলত যে সে আছে। সে কি তা করে ? উদাহরণস্বরূপ তোমার সামনে একটি গরু চরছে, সে কি বলে যে সে চরছে কিংবা তুমিই নিজে থেকে বল, 'এখানে একটি গরু চরছে' ? দ্রষ্টা দেখে বলেই বস্তু আছে।

ভ—গৌড়পাদ 'মাণ্ডুক্য কারিকায়' বলেছেন যে পারমার্থিক সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

ম—নিশ্চয়ই নেই।

ভ—আমার বিশ্বাস ভগবানও তাই বলেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি'তে বলেছেন যে শ্রীশঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এটা কি সত্য ? যদি তা হয় তবে সেই পার্থক্যটা কি ? সত্যের দিক থেকে কি করে কোন পার্থক্য থাকতে পারে ? যতক্ষণ কোন না কোন ভাবে মন থাকে ততক্ষণ পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আত্মা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের দিক থেকে কোন পার্থক্য কি থাকে ?

ম—স্বপ্ন তারই জন্য যে বলে যে সে জাগ্রত। বাস্তবিক পক্ষে পারমার্থিক দিক থেকে জাগৃতি ও স্বপ্ন সমান অসৎ।

ভ—বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে উৎপত্তি, সৃষ্টি ও প্রপঞ্চনের কোন স্থান আছে কি ? যে মতবাদে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত ব্রহ্ম নিজের স্বরূপ হতে বিচ্যুত না হয়ে জগতরূপে প্রতিভাত হয়, সেই 'বিচারে' এই সিদ্ধান্তেরই বা কি হবে ?

ম—জগৎ অসৎ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। স্বপ্নের উদাহরণ তার মধ্যে একটা। শাস্ত্রে জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার জন্যই তাদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন অবস্থার পার্থক্যকে বিশেষভাবে প্রমাণ করার জন্য নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এখন ওরা বলে জগৎ অসৎ। এই অসতের মাত্রা কি? এটা কি বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশ কুসুমের মত কোনরূপ বাস্তবিকতারহিত কেবল শব্দ মাত্র? অপরপক্ষে জগৎ কেবল কথার কথা নয়, এর একটা বাস্তবিকতা আছে। উত্তর হয় যে, এটা সত্যের ওপর একটা অধ্যারোপ, যেমন অল্প আলোয় একটা জড়ানো দড়িকে সাপের আকার মনে হয়।

কিন্তু এখানেও কোন বন্ধু একে রজ্জু বলে দেখিয়ে দিলে এই ভুল ভেঙ্গে যায়, অপরপক্ষে জগতের ক্ষেত্রে তাঁকে অসৎ জানলেও এটা ঠিকই থাকে। সেটা কি করে হয়? আবার মরীচিকাকে মরীচিকা বলে জানলেও মরীচিকা দেখার শেষ হয় না। জগতের সম্বন্ধেও তাই। একে অসৎ জানলেও, এটা প্রকাশ পেতে থাকে।

কিন্তু মরীচিকার জল দিয়ে কেউ তৃষ্ণা মেটাতে যায় না। যে মুহূর্তে এটা মরীচিকা বলে জানা যায়, লোকে তৎক্ষণাৎ তাকে নিরর্থক বলে বোঝে আর জল ভ্রমে তার জন্য ছোটে না।

ভ—জগতের বোধ সেরূপ নয়। পুনঃপুনঃ মিথ্যা বলে স্বীকার করলেও লোকে জগৎ থেকে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করা এড়াতে পারে না। তবে আর জগৎ মিথ্যা হয় কি করে?

ম—এটা ঠিক যেন একজনের স্বাপ্ন অভাব স্বাপ্ন বস্তু দিয়ে পূরণ করা। সেখানেও বস্তু আছে, অভাব আছে আর তার তৃপ্তি আছে। স্বাপ্নিক সৃষ্টিও জাগ্রতের মত কার্যকরী, তবু তাকে সত্য বলা হয় না।

এরূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব দৃষ্টান্তেরই বিভিন্ন স্তরের অসতকে প্রমাণ করার জন্য এক একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। আত্মজ্ঞানী সর্বশেষে বলেন যে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন যেরূপ অসৎ, প্রবুদ্ধ অবস্থায় জাগ্রত জগতও সেরূপ অসৎ।

প্রত্যেকটি উদাহরণ ঠিক ঠিক প্রসঙ্গানুসারে বুঝতে হবে। এদের এক একটা বিচ্ছিন্ন বক্তব্য বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

এগুলো শিকলের এক একটি গাঁট। এদের উদ্দেশ্য তাদের অধিষ্ঠানরূপ সত্যের দিকে মুমুক্ষুর মনকে চালিত করা।

ভ—সুপণ্ডিত অধ্যাপক আমাদের যে পার্থক্য বিশ্বাস করতে বলেন এরূপ পার্থক্য কি শঙ্কর ও গৌড়পাদ দর্শনের মধ্যে আছে?

ম—পার্থক্যটা আমাদের কল্পনা।

ভ—স্যার এস. রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন—

"গৌড়পাদের রচনার সাধারণ বক্তব্য বন্ধন ও মুক্তি, জীবাত্মা ও জগৎ অসৎ, এতে একজন কঠোর সমালোচক বলবে যে, যে-প্রকল্পের একটা মিথ্যা জীবাত্মার একটা মিথ্যা পরম সত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর বেশী বলার নেই সম্ভবতঃ সেটা নিজেই অসৎ। একটা অপরিবর্তনীয় সত্যের নিজের স্বরূপ হতে বিচ্যুত না হয়ে প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করা একটা রহস্য, এটা বলা এক আর সমস্ত পরিবর্তনশীল জগতকে মরীচিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া অন্য কথা। যদি আমাদের জীবনের খেলা খেলে যেতেই হয় তবে আমরা এটাকে একটা নাটক আর এর পুরস্কার কেবলমাত্র শূন্যতা মনে ক'রে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে খেলে যেতে পারি না। কোন দর্শনই এই মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করতে আর তাতে স্থিত হতে পারে না। এই মতবাদের সব থেকে বড় দোষ এই যে, যা আমরা সর্বদা সিদ্ধান্তগতভাবে অস্বীকার করছি তারই অস্তিত্ব ও মূল্যমানের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে এই জগতের অতীত অথচ জগতকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে আরও একটা কিছু আছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জগৎ একটা স্বপ্ন।"

ম—যা আগে বলা হয়েছে, সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বা জীবাত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে অধিষ্ঠান সত্তা অনুস্যূত রয়েছে তাকে দেখানো।

তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হতে পারে—

(১) ব্যবহারিক—মানুষ জগতের বৈচিত্র্য দেখে, একজন

সৃষ্টিকর্তা আছে কল্পনা করে নেয় আর নিজেকে দ্রষ্টা বলে ভাবে ; এরূপে সব কিছু তিনটি মৌলিক বস্তুতে যথা জগৎ, জীব ও ঈশ্বরে পর্যবসিত হয়। সে সৃষ্টিকর্তার কথা শোনে আর তাঁকে লাভ করে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করে। কেউ এরূপে মুক্তি লাভ করলেও অন্যেরা পূর্ববৎ থাকে আর তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। সে ন্যূনাধিক সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা অধিষ্ঠান সত্যকে প্রায়শঃই স্বীকার করে নেয়। ব্যাপারগুলো মায়ার রচনা। মায়া ঈশ্বরের শক্তি বা সত্যের লীলা। এরূপে জীবাত্মার বিভিন্নতা, বিষয় ইত্যাদি অদ্বৈত মতবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

(২) প্রাতিভাসিক—দ্রষ্টাই কেবল জগৎ, জীব ও ঈশ্বর দেখে। তাদের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন সত্তা নেই। সুতরাং মাত্র একটি জীব আছে সেটি ব্যক্তি সত্তা বা ঈশ্বর যাই হোক। আর সব কিছু কল্পনা।

(৩) পারমার্থিক—অর্থাৎ অজাতবাদ, এতে দ্বিতীয় স্বীকার করা হয় না। সেখানে সত্য নেই, সত্যের অভাবও নেই ; চাওয়া নেই, পাওয়াও নেই ; বন্ধন নেই, মুক্তিও নেই ইত্যাদি।

প্রশ্ন হয়, তবে সব শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয় কেন ? তুমি একজন সৃষ্টজীব হয়ে কি করে স্রষ্টাকে উপস্থাপন কর আর জগৎ, জীব ও ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মনের কল্পনারূপে মীমাংসা কর ?

উত্তরটা এইরূপ—

তুমি জানো যে তোমার জাগ্রত অবস্থায় বাবা মারা গেছেন ও তাঁর মৃত্যুর পর অনেক বছর কেটেও গেছে। যাহোক, যিনি তোমার জন্মদাতা ও যাঁর সম্পত্তি তুমি ভোগ করছ তাঁকে তুমি স্বপ্নে দেখো আর তোমার বাবা বলে চিনতে পারো। এখানে স্রষ্টা তার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে রয়েছে। আবার তুমি স্বপ্ন দেখলে যে তুমি একজন রাজকর্মচারী আর রাজ্য পরিচালনার একজন ব্যবস্থাপক। যে মুহূর্তে জেগে ওঠ, একটি মাত্র ব্যক্তি তোমাকে রেখে সব কিছু অদৃশ্য হয়ে

যায়। তারা সব কোথায় ছিল? কেবল তোমাতেই। এই উপমা অন্যক্ষেত্রেও খাটে।

ভ—আগে বলা ব্যবহারিকের মায়া কোথা থেকে আসে?

ম—মায়া ঈশ্বরের শক্তি বা সত্যের লীলা।

ভ—এটা ক্রিয়াশীল হল কেন?

ম—এ প্রশ্ন কি করে ওঠে? তুমি নিজেই তার অন্তর্গত। তুমি কি এই প্রশ্ন করার জন্য সেই সার্বিক লীলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছ? যাতে সব সংশয় নিরসন হয় সেজন্য সেই এক শক্তিই প্রশ্ন তুলছে।

ভ—স্বাপ্ন জগৎ জাগ্রত জগতের মত উপযোগী নয় কারণ আমাদের অভাব মেটে বলে অনুভব হয় না।

ম—তোমার বলাটা ঠিক হল না। স্বপ্নেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। তুমি হয়ত পেটভরে খেয়ে আগামীকালের জন্য বাকী খাবার তুলে রেখেছ। তা সত্ত্বেও স্বপ্নে ক্ষুধা অনুভব কর। এই খাদ্য তোমার কাজে আসে না। তোমার স্বাপ্নিক ক্ষুধা কেবল স্বাপ্নিক খাদ্যেই মিটতে পাবে। স্বাপ্নিক অভাব স্বাপ্নিক সৃষ্টি দিয়ে মেটে।

ভ—আমরা জাগ্রতে স্বপ্ন স্মরণ করি কিন্তু তার বিপরীতটা করতে পারি না।

ম—এবারও ঠিক হল না। স্বপ্নেও এখন যে কথা বলছে নিজেকে সেই বলে নির্ধারণ কর।

ভ—কিন্তু যেমন জাগ্রত অবস্থায় বোধ করি যে জাগ্রত আছি, তখন যে আমরা স্বপ্ন দেখছি তা বোধ করতে পারি না।

ম—স্বপ্নটা জাগ্রত ও সুষুপ্তির মিশ্রণ। এটা জাগ্রত অবস্থার সংস্কারের জন্য হয়। সেজন্য এখন আমাদের স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়। সংস্কারগুলো বিপরীতভাবে তৈরী হয় না, অতএব আমরা স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা একসঙ্গে অনুভব করি না। তবুও সকলেরই ঘুমে এরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে। একজন বুঝতে পারে না যে সে স্বপ্ন দেখছে কিংবা

জেগে আছে। সে যুক্তি দিয়ে ঠিক করে যে সে জেগেই আছে। যখন প্রকৃত জেগে ওঠে তখন সে বোঝে যে ওটা স্বপ্ন ছিল।

৪০০। আর একটা আলোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীভগবান বললেন জ্যোতি দর্শন ধ্যানের আগ্রহ বাড়ায়, এর বেশী আর কিছু করে না।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০১। জনৈক আন্ধ্র ভদ্রলোক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞাসা করলে—'তপ' করার সময়ে কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি স্থির করব? আমাদের মন উচ্চারিত শব্দের ওপর স্থির হয়।

ম—'তপ' কিসের জন্য?

ভ—আত্মজ্ঞানের জন্য।

ম—ঠিক তাই। 'তপ' একজনের যোগ্যতানুসারে। চিন্তা করার জন্য একটা মূর্তি চাই। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। কারণ একজন কি অবিরত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে পারে? সেজন্য মূর্তি ধ্যানের সঙ্গে জপ যোগ করতে হয়। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে জপ যুক্ত হলে মনকে মূর্তিতে স্থির হয়ে থাকতে সাহায্য করে। এই চেষ্টার ফলে একাগ্রতা হয় যা লক্ষ্যে শেষ হয়। সে যা চিন্তা করে তাই হয়ে যায়। অনেকে কেবল মূর্তির নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। প্রত্যেক মূর্তিরই নাম আছে। সেই নামেই ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলী আছে। অবিরত জপে অন্যান্য চিন্তা দূর হয় আর মন স্থির হয়। সেটাই তপ। এক—অগ্রতা (নিষ্ঠা)-রূপ তপেরই প্রয়োজন।

তপের কি উদ্দেশ্য জানার জন্যই তপ কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য অনুসারে এর রূপ হয়।

ভ—শরীরের কৃচ্ছ্রতাও কি তপ নয়?

ম—হয়ত এক ধরণের তপ। এগুলো বৈরাগ্যের জন্য হয়।

ভ—আমি একজনকে সারা জীবন একটা হাত তুলে থাকতে দেখেছি।

ম—সেটা বৈরাগ্য।

ভ—একজন তার শরীরকে এরজন্য কষ্ট দেবে কেন?

ম—তুমি একে কষ্ট দেওয়া মনে করছ অন্যপক্ষে এটা একটা ব্রত আর একজনের পক্ষে এটা একটা সাধনা ও আনন্দ।

ধ্যান বাহ্য বা আন্তর বা উভয়ই হতে পারে। বাহ্য মূর্তি অপেক্ষা জপ বেশী উপযোগী। স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এটা করতে হবে। প্রথমে চেষ্টা করে করতে হয় আর যতক্ষণ না জপ আপনা হতে হয় ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। যখন স্বাভাবিক হয় তাকেই জ্ঞান বলে।

এমনকি কাজ করার সময়েও জপ করতে হয়। 'সেই' যা আছে সেই একমাত্র সত্য। এটা একটি মূর্তি, একটা জপ, মন্ত্র, বিচার বা যে কোন প্রচেষ্টার দ্বারা রূপায়িত হতে পারে। এরা সবাই মিশে গিয়ে অবশেষে এক অদ্বিতীয় সত্যে পরিণত হয়। ভক্তি, বিচার, জপ কেবল আমাদের অসতকে দূরে রাখার বিভিন্ন প্রচেষ্টা। বর্তমানে অসত্যটাই বাস্তিক (বদ্ধ সংস্কার)। সত্য আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আমরা ভুল করে অসত্যকে অর্থাৎ চিন্তা ও জাগতিক কাজকে ধরে আছি। এগুলো থেমে গেলেই সত্য প্রকাশ হবে। আমাদের চেষ্টাকে এদের অপসারণের জন্য নিয়োগ করা হয়। সেটা কেবল সত্যের চিন্তা ক'রেই করা হয়। যদিও এটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ তবু যেন মনে হয় আমরা সত্যের চিন্তা করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা করি সেটা আমাদের প্রকৃত সত্তার প্রকাশের বাধাগুলো অপসারণ মাত্র। এরূপে ধ্যান বা বিচারের অর্থ আমাদের প্রকৃত স্বরূপে ফিরে আসা।

ভ—আমাদের প্রচেষ্টার সফলতা কি সুনিশ্চিত?

ম—জ্ঞান আমাদের স্বরূপ। এটা নূতন কিছু নয়, যা পেতে

হবে। যা অভিনব তা শাশ্বত নয়। অতএব আত্মা লাভ হবে কি না এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪০২। হৃদয় ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীভগবান পুরাতন দিনের একটি ঘটনা স্মরণ করে বললেন—

একবার কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি তর্ক করেছিল যে মস্তিষ্কই প্রধান কেন্দ্র আর শ্রীভগবান যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে হৃদয় তার থেকেও বেশী। সেখানে আরও অনেকে এই আলোচনা শুনছিল। কয়েকদিন পরে একটি ছোট ছেলে এন. এস. অরুণাচলম্ যে তখন অবধি ম্যাট্রিকিউলেশান্ পাশ করেনি তার কাছ থেকে শ্রীভগবান একটা ইংরাজী কবিতার চিঠি পেয়েছিলেন।

কবিতাটির কাব্যকল্পনা বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল। তাতে শ্রীভগবান, কাব্যকণ্ঠ ও সমবেত জনগণকে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তিষ্ক ও শরীর এবং আবার তাদের সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছিল। সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়, সেই আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়। অনুরূপভাবে মস্তিষ্ক হৃদয় থেকে চেতনা লাভ ক'রে কাজ করে যার ফলে শরীর রক্ষা হয়। শ্রীভগবানের এই উপদেশ 'রমণ গীতায়'ও আছে। হৃদয়ই প্রধান কেন্দ্র যা থেকে শক্তি ও চেতনা মস্তিষ্কে বিচ্ছুরিত হয় আর তাকে কর্মশক্তি দেয়। চলচ্চিত্রের প্রত্যেক পর্যায়ের অনুরূপ, বাসনাগুলো সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে থাকে, পরে সেগুলো মস্তিষ্কে যায়, সেখানে সেগুলো অতিরঞ্জিত হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। এইজন্যেই জগতকে একটা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী (সিনেমা-শো) ছাড়া আর কিছু নয় বলা হয়।

শ্রীভগবান আরও বললেন—

যদি বাসনাগুলো হৃদয়ে না থেকে মাথায় থাকত তবে মাথা কেটে ফেললেই পুনর্জন্ম রোধ করা যেত। কিন্তু তা হয় না। যেরূপ একজন কৃপণ তার সর্বাপেক্ষা দামী সম্পত্তি নিজের কাছে রাখে আর

কখনই তার থেকে দূরে থাকে না, সেরূপ আত্মা স্পষ্টতঃই বাসনা-গুলোকে সযত্নে নিজের কাছে অর্থাৎ তাবই মধ্যে হৃদয়ে রক্ষা করে। সেহেতু বাসনার স্থান আত্মায় অর্থাৎ হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয় (এটা যেন বাসনাব অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ, আর হৃদয় তার সাজঘর)।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০৩। 'মডার্ন সাইকোলজিক্যাল রিভিউ'-এব উদ্ধৃতাংশের কথা উঠল, কোন আধ্যাত্মিক পথেব সিদ্ধ পাওয়া গেলে তাব অভিজ্ঞতা কোন যন্ত্র দিয়ে পবিমাপ ক'বে হৃদ্‌কেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা যায় কিনা ইত্যাদি কথা চলছিল। অন্যেরা আলোচনা করছিল। শ্রীভগবান বললেন—আত্মজ্ঞান' বই-এ একটি ঘটনার কথা লেখা হয়েছে যে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার শবীবে মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, আমি কিন্তু সর্বদাই সচেতন ছিলাম। আমি অনুভব কবেছিলাম যে স্থূল হৃদ্‌যন্ত্র থেমে গেল কিন্তু হৃদ্‌কেন্দ্রেব ক্রিয়া সমান ভাবে চলতে লাগল। এরূপ অবস্থা পনের মিনিট ছিল।

আমবা জিজ্ঞাসা করলাম যে কোন ভক্তের কি এই সময়ে শ্রীভগবানের বুকে হাত দিয়ে তাঁর হৃদ্‌কেন্দ্র যে ডানদিকে তা অনুভব করাব সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীভগবান বললেন "হুঁ।"।

(শ্রীবিশ্বনাথ আইয়ার, নারায়ণ রেড্ডী আরও অন্যেরা বলেছে যে তারা শ্রীভগবানের বুকে হাত দিয়ে ডান্‌দিকে হৃদ্‌কেন্দ্র অনুভব করেছিল।)

একজন ভক্ত ঠিকই বললে যে যদি হাত দিয়ে বোঝা যায় ও স্থান নির্দেশ করা যায় তবে একটা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিশ্চয় তা করতে পারবে।

ভ—হৃদয়কে ডানদিকে, বাঁদিকে ও মাঝখানে বলা হয়। এরূপ মতদ্বৈধ হলে আমরা কিরূপে হৃদয়ের ধ্যান করব ?

ম—তুমি 'আছ' এটা বাস্তব তথ্য। তুমিই তোমার ধ্যান কর আর সেও তোমারই মধ্যে। তুমি যেখানে আছ সেখানেই এটা হবে। এটা তোমার বাইরে নয়। সুতরাং তুমিই তোমার ধ্যানের কেন্দ্র আর সেটাই হৃদয়।

তবুও শরীরের পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্থান নির্ণয় করে দিতে হয়। তুমি জানো তুমি 'আছ'। কোথায় আছ? তুমি শরীরেই আছ, বাইরে নয়। তবু সব শরীরে নয়। যদিও তুমি শরীরব্যাপী তবু একটা কেন্দ্র স্বীকার কর যেখানে তোমার সব চিন্তা উদয় হয় ও লয় পায়। এমনকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেললেও অঙ্গহীন হয়েও তুমি সেখানে থাকো। সুতরাং একটা কেন্দ্র স্বীকার করতে হবে। সেটাকেই হৃদয় বলে। হৃদয় কেবল কেন্দ্র নয়, আত্মাও বটে। আত্মারই আর এক নাম হৃদয়।

সংশয় তখনই হয় যখন একে কোন একটা বাস্তব ও স্থূল কিছুর সঙ্গে এক বলে নির্ধারণ কর। শাস্ত্র নিঃসন্দেহে একেই ১০১ নাড়ীর উৎপত্তি স্থল ইত্যাদি বলে বর্ণনা করে। যোগবাশিষ্ঠে চূড়ালা বলছে যে কুণ্ডলিনী ১০১ নাড়ী দ্বারা গঠিত, এরূপে একটিকে অন্যটির সঙ্গে এক বলে নির্ধারণ করছে।

হৃদয় একটা কল্পনা নয়, একটা কিছু ধ্যেয় বস্তুও নয়। কিন্তু এটা ধ্যান করার স্থান, আত্মাই একমাত্র সর্বদা থাকে। তুমি শরীর ও জগতকে হৃদয়েই দেখো। এর থেকে পৃথক কিছু নেই। সুতরাং সকল প্রকার প্রয়াসের জন্য এই স্থানই নির্দেশ করা হয়।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০৪। একজন সাময়িক দর্শনার্থী—

নিষ্ঠা কি? কি করে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করা যায়?

ম—আমরা কি করে এসব দেখি? একটা আলো দিয়েই দেখি। তোমার প্রশ্নের ভাবটা যেন সেই আলোকে কি করে দেখা যায়।

ভ—ভ্রূমধ্য স্থানের তাৎপর্য কি?

ম—এটা বলার অর্থ, "চোখ দিয়ে কিছু দেখো না।"

ভ—শ্বাস সংযম কিসের জন্য?

ম—মন সংযমের জন্য।

আবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীভগবান বলতে লাগলেন—মন দু'ভাবে ক্রিয়া করে, একটা চেতনা অন্যটা বিষয়। যদি বিষয়গুলো সরিয়ে দেওয়া যায় তবে কেবল চেতনাই থাকে।

ভ—কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে চেতনা আছে।

ম—এই চেতনার অভাবে দেখা বা অনুভূতি হয় না। ঘুমে তুমি কি দিয়ে বস্তু অনুভব কর? এই বর্তমান অবস্থার বোধও একটা চেতনার জন্য হয়। দেখার জন্য একটা জ্যোতি চাই। এটা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য। সকল জ্যোতির মধ্যে সূর্যের জ্যোতি সব থেকে প্রধান। সে কারণে সহস্র সূর্যের মহিমা এত করে বলা হয়।

ভ—আমাদের চোখের পাতা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরলে একটা জ্যোতি দেখা যায়।

আর একজন প্রশ্নকারী—এরূপ জ্যোতি দর্শনে কি লাভ?

ম—আমরা পাছে আমাদের লক্ষ্য ভুলে যাই সেজন্য এটা করা হয়। এই অভ্যাসে অন্য কিছুতে মনোযোগ চলে যাওয়া বন্ধ করার সাহায্য হয়।

কোন বিষয় বা জ্যোতি দেখা যায় কারণ এটা করার জন্য একজন কর্তা আছে। কিন্তু এগুলো দেখা বা না দেখায় কর্তার কি এসে যায়? যদি বোধ অর্থাৎ জ্ঞাতা বা চেতনাকে দেখা যায় তবে দেখার জন্য কোন বস্তু থাকবে না। বিশুদ্ধ বোধ অর্থাৎ চেতনাই একমাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

ভ—তবে আর শ্বাস সংযমের কি প্রয়োজন ?

ম—শ্বাস দমন বা সংযম মনঃসংযমের জন্য করা হয় যাতে মন চঞ্চল হয়ে ঘুরে না বেড়ায়।

ভ—এটা কি কেবল মন সংযমের জন্য ?

ম—কেবলমাত্র জ্যোতি দর্শন করলেই হয় না ; মনকেও একটামাত্র ক্রিয়ায় লাগিয়ে রাখতে হয়, যেমন হাতীর শুঁড় ও শিকল।

ভ—একজনের চিন্তামণি (যার দ্বারা সকল ইচ্ছা পূরণ হয় এরূপ মণি) পেতে কত দিন লাগে ?

ম—চিন্তামণির দৃষ্টান্ত যোগবাশিষ্ঠে আছে। চিন্তামণির তাৎপর্য প্রকৃত স্বরূপ। গল্পটা এরূপ—

একজন লোক চিন্তামণি লাভের জন্য তপস্যা করেছিল। তার হাতে হঠাৎ একটা মণি পড়ল। সে ভাবলে এটা কখন চিন্তামণি হতে পারে না কারণ ক'দিন বা কতটুকুই বা সে তপস্যা করেছে। সে সেটা ফেলে দিয়ে আবার তপস্যা করতে লাগল। পরে একজন সাধু তাকে একটা চকচকে পাথর দিলে। লোকটি পাথর দেখে, ভুলে গেল কিন্তু পরে দেখলে যে সেটা চিন্তামণি নয়। অনুরূপভাবে আত্মাও অন্তর্নিহিত হওয়ায় তাকে অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন নেই।

আবার একটা হাতীকে তার মাহুত খুব অত্যাচার করত। একদিন মাহুত হঠাৎ পড়ে গেল। হাতীটা তাকে তখন মেরে ফেলতে পারত কিন্তু তা করলে না। পরে অবশ্য মাহুত বনে একটা গর্ত খুঁড়ে হাতীটাকে মেরে ফেলেছিল।

চূড়ালা এই উদাহরণ দিয়ে শিখিধ্বজের ভুল দেখিয়ে দিয়েছিল। রাজত্ব করার সময়েই তার বৈরাগ্য ছিল, সে যদি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অহংকারকে নাশ করতে পারত তাহলে রাজত্ব করা কালেই সে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারত। সে তা না করে বনে এসে দীর্ঘ তপস্যা করে আঠার বছরেও কোন উন্নতি করেনি। সে তার

নিজের সৃষ্টির দাস হয়েছে। চূড়ালা তাকে অহংকার ত্যাগ ক'রে আত্মোপলব্ধি করতে বললে, শিখিধ্বজ তাই ক'রে মুক্ত হয়ে গেল।

চূড়ালার গল্প থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অহংকারের সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনের কোন মূল্য নেই, অন্যপক্ষে অহংকার না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি থাকলেও ক্ষতি হয় না।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০৫। একজন শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক শ্রীচক্র সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

ম—এর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। এতে তেতাল্লিশটা কোণ আছে, প্রতি কোণে এক একটা মন্ত্র আছে। এর উপাসনা মন একাগ্র করার উপায়। মন বহির্মুখে ধাবিত হতে অভ্যস্ত। একে অন্তর্মুখীন করতে হবে। মনের অভ্যাস নাম ও রূপ নিয়ে থাকা, কারণ সকল বাহ্যবস্তুরই নাম ও রূপ আছে। মনের ধারণাগুলোকে প্রতীকাত্মক নাম ও রূপে পর্যবসিত করা হয় যাতে মন বহির্মুখীনতা ত্যাগ করে অন্তর্মুখী হয়। মূর্তি, মন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি অন্তর্মুখী মনের খোরাক যাতে সে পরে একাগ্র হতে সমর্থ হয়, তারপর পরম অবস্থা আপনা হতে লাভ হয়।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০৬। আবাসিক ভক্ত শ্রীকোহেন একজন বিশিষ্ট থিয়সফিস্টের লেখা 'নির্বাণ' নামে একটা বই-এর কথা বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছেন তাতে লেখক দাবী করেছেন যে তিনি প্রতিদিন রাত্রে ঘুমে 'নির্বাণ'

লাভ করেন। তিনি আরও দাবী করেছেন যে তিনি তাঁর গুরু ও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির অন্যান্য গুরুবর্গকে একটা আলোর সমুদ্রের মধ্যে জ্যোতির মত দেখেন। এটাই নির্বাণ। সে (শ্রীকোহেন) এটা কি করে সম্ভব হয় এ বিষয়ে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, কারণ অদ্বৈতমতে নির্বাণের অভিজ্ঞতা কেবল বিশুদ্ধ সত্তার চেতনা।

ম—নির্বাণ পূর্ণতা। পূর্ণ অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয় নেই; সেখানে কোন কিছু দেখা, অনুভব করা বা জানা নেই। দেখা ও জানা মনের ক্রিয়া। নির্বাণে কেবল 'আমি-আছি'-রূপ আনন্দময় শুদ্ধ চেতনা ছাড়া আর কিছু নেই।

ভ—থিয়সফিক্যাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট নেতা যিনি নিজেকে অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন (ক্লারভয়েন্ট) বলে দাবী করেন তিনি কি করে এই লেখকের তথাকথিত নির্ভুল ও বিশদ নির্বাণের বর্ণনা সম্বন্ধে প্রশংসা করতে পারেন আর ওরা 'সেবা' 'সেবা' বলে এত মাতামাতিই বা করে কেন?

ম—দেখ, থিয়সফি ও এরূপ অন্যান্য আন্দোলন লোকেদের কিছুটা নিঃস্বার্থ ক'রে উচ্চ সত্যের জন্যে তৈরী করে, এইটুকুই এদের সার্থকতা। সেবা, প্রার্থনা ও জপের মত এমনকি ঈশ্বরের নামে করা যে কোন কাজই উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে—আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়।

ভ—কিন্তু কতদিনে? আর যে ব্যক্তি পরম জ্ঞানের জন্য তৈরী সে কেন আপেক্ষিক জ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকবে?

ম—সবই সময়ানুসারে হয়। যে পরম জ্ঞানের উপযুক্ত সে কোন না কোন ভাবে তার কথা শুনবে ও সেটা অনুসরণ করবে। সে বুঝবে যে আত্মবিদ্যাই সর্বোত্তম উৎকর্ষ ও পথের শেষ।

তারপর অন্তর ও বাহ্য নির্বিকল্প সমাধির কথা, ৩৯১ সংখ্যক কথোপকথনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে, মহর্ষি বললেন—

বাহ্য সমাধি জগতকে দৃষ্টির সম্মুখে রেখে ও তার সম্বন্ধে অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে সত্যকে ধরে থাকা। সেখানে

একটা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ভাব আছে। আন্তর সমাধিতে দেহ-চেতনা থাকে না।

ভ—সহজ সমাধি লাভের পূর্বে কি দেহ-চেতনা শূন্য হতেই হবে?

ম—দেহ-চেতনা কি? বিশ্লেষণ করো। একটা শরীর থাকবে আর চেতনা তাতেই সীমিত এই দু'টি নিয়ে দেহ-চেতনা। এই চেতনাটাও কোন একটা চেতনায় আছে যা পূর্ণ ও নির্বিকার। তাকে ধরো। এই সমাধি। দেহ-চেতনা না থাকলেও এটা আছে কারণ এটা দেহ-চেতনার অতীত। সুতরাং এটা সব সময়ে আছে। দেহ-চেতনা থাকল কি গেল কি এসে যায়? যখন থাকে না তখন আন্তর সমাধি—যখন থাকে তখন বাহ্য সমাধি। ব্যস্।

একজন এই ছয় প্রকার (৩৯১ দ্রঃ) সমাধির মধ্যে কোন একটাতে থাকবে যাতে সহজ সমাধি তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ভ—মন এক মুহূর্তের জন্য সেরূপ অবস্থাতে ডুবতে চায় না।

ম—মন ও জগৎ ব্যাপারের অতীত আমি আত্মা এরূপ একটা দৃঢ় ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভ—তথাপি ডুবিয়ে দেওয়ার প্রয়াসের বিরুদ্ধে মনই রজ্জু-সরূপ প্রমাণিত হয়।

ম—মন সক্রিয় হলেই বা কি ক্ষতি? এটা আত্মার আধারের ওপরই হয়। মনের ক্রিয়াশীলতার মধ্যেও আত্মাকে ধরো।

ভ—আমি যথেষ্ট গভীরে যেতে পারি না।

ম—এটা বলা ভুল। তুমি এখন আত্মা ছাড়া কোথায় আছ? কোথায় যাবে? তুমি আত্মা এরূপ একটা দৃঢ় বিশ্বাসই কেবল যা দরকার। বরং বলতে পারো যে অন্য কাজগুলো তোমার ওপর একটা আবরণ দেয়।

ভ—হাঁ, তাই।

ম—তার অর্থ বিশ্বাসটা দুর্বল।

ভ—আমি বুঝি যে 'আমি'টা কৃত্রিম; প্রকৃত 'আমি'কে উপলব্ধির জন্য এই কৃত্রিম 'আমি'কে কাজে লাগানো হয় বলেই আমার প্রকৃত 'আমি'কে অনুভবের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

ম—'বিবেক চূড়ামণি' এটা স্পষ্ট দেখিয়েছে যে বিজ্ঞানময় কোষের কৃত্রিম 'আমিটা' একটা অভিক্ষেপ আর এর মাধ্যমেই একজনকে সত্য বস্তু বা বাচ্য 'আমি'কে দেখতে হবে।

৪০৭। ভ—সাধ্বী তেরেসা ও অন্যেরা ম্যাডোনার মূর্তিকে সজীব দেখত। এটা বাইরে। অন্যেরা তাদের ইষ্টমূর্তিকে অন্তরে দেখে। এটা অন্তরে। এই দুই দর্শনের মধ্যে কি কোন তারতম্য আছে?

ম—উভয়ক্ষেত্রেই ধ্যানের গভীরতা বোঝায়। দু'টিই উত্তম ও উন্নতির পরিচায়ক। কোন পার্থক্য নেই।

একজনের দেবত্ব সম্বন্ধে ধারণা আছে সেজন্য সে মনের মধ্যে দেবমূর্তি গঠন ক'রে অনুভব করে। অপরজন মূর্তিকে দেবতা বলে দৃঢ় বিশ্বাসে মূর্তিতে তাই দেখে। উভয়ক্ষেত্রেই অনুভবটা অন্তরে।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৭

৪০৮। মনুষ্য দেহের ডানদিকে হৃদ্‌কেন্দ্রের স্থান উল্লেখ ক'রে শ্রীভগবান বললেন—

দেহতত্ত্ব তাদের অন্যপ্রকার বলে, অনেক পণ্ডিতের এই আপত্তি করা সত্ত্বেও আমি বরাবর বলছি হৃদ্‌কেন্দ্র ডানদিকে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলি। বাড়িতে থাকাকালে সমাধি অবস্থার সময় থেকেই আমি এটা বুঝেছিলাম। আবার 'আত্মজ্ঞান' বই-এ যে ঘটনার লেখা আছে সে সময়েও আমার এটা স্পষ্ট দর্শন ও অনুভূতি হয়েছিল। হঠাৎ একদিক থেকে একটা জ্যোতি এসে দৃশ্য জগৎ মুছে দিলে আর

সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে সমস্ত জাগতিক দৃশ্য বিলুপ্ত করে দিলে। আমি অনুভব করলাম যে আমার বাঁদিকের স্থূল হৃদ্‌যন্ত্র থেমে গেল; আমি বুঝতে পারলাম যে শরীরটা যেন একটা মৃতদেহ হয়ে গেল. রক্ত চলাচল থেমে গেল আর শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে স্থির হয়ে গেল। বাসুদেব শাস্ত্রী শরীরটা জড়িয়ে ধরে আমার মৃত্যুর জন্য কাঁদছে, আমি কিন্তু কথা বলতে পারছি না। সব সময়ে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ডানদিকের হৃদ্‌কেন্দ্র ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। এই অবস্থা পনের কি কুড়ি মিনিট ছিল। তারপর হঠাৎ বাতাসে হাউই ছোঁড়ার মত একটা কিছু ডানদিক থেকে বাঁদিকে ছুটে গেল। রক্ত চলাচল শুরু হল আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। আমি তখন বাসুদেব শাস্ত্রীকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম আর আমাদের বাসস্থানে ফিরে এলাম।

উপনিষদ্ বলে ১০১টা নাড়ী হৃদয়ে শেষ হয় আর ৭২,০০০ নাড়ী সেখান থেকে শুরু হয়ে সারা শরীর ছেয়ে ফেলে। এরূপে হৃদয়ই শরীরের কেন্দ্র। শরীরের অভাবেও এটা অনুভব হয়। বাস্তবিকপক্ষে আমরা শরীরে আছি ভাবতে অভ্যস্ত বলে একে একটা কেন্দ্র বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শরীর ও আর সবকিছু এই কেন্দ্রেই থাকে।

পূর্বস্মৃতি

৪০৯। একজন মাঝ বয়সী লোক এসে শ্রীভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে, তিনি কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। কয়েক মিনিট পরে শ্রীভগবানের স্মরণ হল যে এই একমাত্র লোক যাকে শ্রীভগবান একবার চড় মেরেছিলেন। এটা তিরিশ বছর আগে ঘটেছিল।

শ্রীভগবান মুলাইপল তীর্থে বাস করতেন। জটাস্বামী নামে একজন কাছেই বাস করত (মমরথুগুহায়)। এই লোকটি তখন আট বছরের ছিল, সে সবার সঙ্গে এমনকি শ্রীভগবানের সঙ্গেও দুষ্টামি

করত। একদিন সে শ্রীভগবানকে গিয়ে বললে যে জটাস্বামী একটা বালতী চাইছে। অনুমতি না নিয়েই সে একটা বালতী নিয়ে চলে গেল। সেবক পালানীস্বামী তখন সেখানে ছিল না। সুতরাং শ্রীভগবান ছেলেটির পিছনে পিছনে জটাস্বামীর গুহায় গেলেন। ভগবান সেখানে পৌঁছাবার আগেই ছেলেটি তাকে বলেছে যে ব্রাহ্মণস্বামী (শ্রীভগবান) একটা বালতী পাঠিয়েছেন। জটাস্বামী ভাবতে লাগল যে কেন তিনি পাঠালেন। একটু পরে মহর্ষি সেখানে পৌঁছালেন ও যা হয়েছে সব শুনলেন। সুতরাং তিনি তাকে একটা চড় মারবার জন্য হাত তুললেন কিন্তু মন চড় মারতে সায় দিলে না। তিনি নিজের সঙ্গে তর্ক করে ঠিক করলেন যে ছোকরাটাকে চড় মারা উচিত আর তাকে মারলেন।

৪১০। আভ্ভৈয়ের একটা তামিল কবিতা আছে। তাতে প্রাণ যেন জঠরকে সম্বোধন করে বলছে—

"হে জঠর! তোমার সঙ্গে থাকা কি দায়! যখন খাবার পাওয়া যায় না তুমি উপবাস করো না, কিংবা যখন বেশী পাওয়া যায় তখন নিয়ে জমিয়ে রাখো না! যখন আর যতটুকু তোমার প্রয়োজন তুমি তাই নাও; তুমি আমায় বড় বিরক্ত কর, কোন শান্তি দাও না।"

শ্রীভগবান একে এইভাবে বদলে দিলেন—জঠর যেন প্রাণকে বলছে—

"হে প্রাণ! তুমি কি বিরক্তিকর! আমাকে একটুও শান্তি দাও না, বার বার ভরেই চলেছ। তোমার সঙ্গে থাকা কি দায়।"

এই বলে শ্রীভগবান হাসলেন। তিনি প্রায়ই বলেন যে তাঁকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ানো হয়।

২১শে মে, ১৯৩৭

৪১১। শ্রীভগবান ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহের পদ্ধতি বলতে গিয়ে বললেন যে কাশীযাত্রার অর্থ এই যে বর একজন বৈরাগী পুরুষ। সুতরাং তাকে কন্যাদান ক'রে সংসারী করা ঠিক। এ থেকে বোঝা যায় যে একজন বৈরাগীই সদ্‌গৃহস্থ হতে পারে।

৪১২। একবার শীতকালে শ্রীভগবান পাহাড়ে একটা গুহায় শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার হাত দু'টি বুকের ওপর রেখে বসেছিলেন। কোন একজন আন্ধ্র দর্শনার্থী এল, সে একটা নারিকেল ভেঙ্গে জলটা শ্রীভগবানের মাথায় ঢেলে অভিষেক করলে; শ্রীভগবান অবাক হয়ে গেলেন।

৪১৩। একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—

নাম জপ করার সময়ে প্রায় একঘণ্টা জপ করার পর আমার একটা ঘুমের মত ভাব হয়। জেগে উঠে স্মরণ হয় যে জপটা থেমে গেছে। সুতরাং আবার করতে শুরু করি।

ম—'ঘুমের মত'। এটাই ঠিক। এটাই স্বরূপ অবস্থা। যেহেতু তুমি এখন তোমার অহংকারের সঙ্গে যুক্ত সেজন্য তুমি তোমার স্বরূপ অবস্থাকে যেন তোমার কাজে বাধা দিচ্ছে মনে কর। যতক্ষণ না এটাকে স্বরূপ বলে বুঝতে পারো ততক্ষণ তোমায় এই অবস্থা বার বার অনুভব করতে হবে। তখন তুমি দেখবে যে জপ ইত্যাদি বহিরঙ্গ ব্যাপার। তবুও এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যাবে। তোমার বর্তমান সংশয়ের কারণ তোমার ভুল নির্ধারণ।

জপের অর্থ অন্য সব চিন্তা ছেড়ে একটাকে ধরে থাকা। এটাই জপের উদ্দেশ্য, এ থেকে ধ্যান হয় যার ফলে আত্মজ্ঞান।

৪১৪। একজন ভক্ত শ্রীজি. ভি. সুব্বারামিয়া কয়েকটি ছোট কবিতা লিখেছে; সেগুলো বেশ উপভোগ্য। তার মধ্যে কয়েকটিতে একটি শিশুর উল্লেখ আছে। শ্রীভগবান বললেন, ঈশ্বর শিশু হন আবার তদ্বিপরীতও হন। তার অর্থ শিশুর সংস্কার এখন সুপ্ত সেজন্য তার সরলতা বিশুদ্ধ। যখন এগুলো (সংস্কার) চলে যায় এমনকি একজন বয়স্ক লোকও আবার শিশুর মত হয়ে যায় আর এরূপে ঈশ্বরের মত হয়ে থাকে।

লেখক বললে—শিশুবা 'গৃহের' পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্রীভগবান—হাঁ, শিশুরা সর্বদাই 'স্বস্থানে' থাকে। আমরাও সেখানে আছি কিন্তু স্বপ্ন দেখছি আর ভাবছি যে স্ব-গৃহে নেই।

শ্রীভগবান আরও যোগ করলেন—আমি দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রের 'যুবা' কথাটিকে 'বাল' বলে অনুবাদ করেছি। সেটি আরও উপযুক্ত মনে হয়।

পুনর্জন্ম হওয়ার অর্থ আবার শিশু হওয়া। জ্ঞান লাভ করতে হলে পুনর্জন্ম হওয়া চাই অর্থাৎ সহজ অবস্থা ফিরে পাওয়া চাই।

৪১৫। শ্রীভগবান তামিল—তামিল অভিধানের ভূমিকা থেকে তামিলভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি পদ পড়লেন আর সেই উল্লেখ-গুলো আকর্ষনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করলেন। জৈনধর্ম অপেক্ষা শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের উপমা দেওয়া হয়েছে, প্রথমটি তিরুজ্ঞানসম্বন্ধরের পাণ্ড্যরাজার অসুখ ভাল করার জন্য রাজসমীপে যাওয়া বিষয়ে। রানী তাঁর অল্প বয়স (১২ বছর) দেখে চিন্তিত হলেন। তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর একটি পদ রচনা করে তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। তাতে বলা হয়েছে যে যদিও সে বয়সে বালক তবুও সে অসংখ্য শক্তিশালী জৈনদের সমকক্ষ। এই পদগুলো পড়ার সময়ে আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি পড়া শেষ করতে পারলেন না।

দ্বিতীয় পদটি অগ্নির কড়জন পাতা দগ্ধ করতে না পারার

ওপর আর তৃতীয়টিতে কড়জন পাতার নদীর বেগ রুদ্ধ করার কথা ছিল (তিরুবেদকম্)।

শ্রীভগবান ঈশ্বরের (শিবের) একই সঙ্গে বৃদ্ধ রূপ ধারণ করে ভিক্ষা চাওয়া, যুবাবেশে অন্ন গ্রহণ করা ও শিশুরূপে ভক্ত মহিলাকে রক্ষা করার গল্পটি বললেন।

তিনি আবার দেখালেন—'বালোন্মত্ত পিশাচবৎ' (বালক, উন্মাদ ও পিশাচের মত) বলে জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়। এখানে বালকভাবকে সর্বাগ্রে বলা হয়েছে।

৪১৬। শ্রীভগবান বললেন 'কম্ব রামায়ণে ১২,০০০ শ্লোক আছে, বাল্মীকি রামায়ণে ২৪,০০০। কেবল পণ্ডিতেরাই কম্ব রামায়ণ বুঝতে পারে, সাধারণে পারে না। তুলসীদাস একজন তামিল মহাত্মার কাছে কম্ব রামায়ণের হিন্দি ব্যাখ্যা শুনে তাঁর বিখ্যাত রামায়ণ রচনা করেন।

৫১৭। 'পারফেক্ট মাস্টার' মেহের বাবার সম্বন্ধে লেখা ১৯৩৭ সালে ছাপানো একটা বই। এতে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে একজন জাহাজের কর্মচারী একজন অনিচ্ছুক অভিবাসন (ইমিগ্রেসান) কর্মচারীকে 'বাবা' ও তাঁর দলের লোকেদের আমেরিকায় নিউইয়র্ক বন্দরে নামতে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। দলের একজন ধন্যবাদ দিতে গেলে তাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না।

এই ঘটনাটি 'বাবা'র অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত। অংশটি শ্রীভগবানকে পড়ে শোনানো হল।

তিনি বললেন—"হাঁ, হাঁ, তাতে কি হল?"

ভ—এটা কি একটা অলৌকিক ঘটনা?

ম—হতে পারে। কিন্তু অভিবাসন কর্মচারী কি অন্য লোকটিকে তার উর্ধ্বস্থ কর্মচারী বলে চিনতে পারেনি যার আজ্ঞা তার পালন করা কর্তব্য? এখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। যদি

'বাবা'র দলের লোকটি তাঁকে খুঁজে না পেয়ে থাকে—বেশ তো, তার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে।

৪১৮। শ্রীভগবান 'কম্ব রামায়ণ' পড়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, শ্রীভগবান বললেন—না, আমি কিছুই পড়িনি। আমার যা কিছু বিদ্যা তা চৌদ্দ বছরের আগে যা হয়েছিল। তারপর আমার আর পড়া ও শেখার ইচ্ছা ছিল না। লোকে বিস্মিত হয় যে আমি কি করে ভগবদ্‌গীতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলি। এটা কেবল শুনে। আমি গীতা পড়িনি বা তার ভাষ্য পড়ে অর্থও খুঁজতে যাইনি। আমি একটা শ্লোক শুনলে তার অর্থটা স্পষ্ট বুঝতে পারি আর তাই বলি। ব্যস্‌ আর কিছু নয়। আমার অন্যান্য উদ্ধৃতি সম্বন্ধেও তাই। সেগুলো স্বাভাবিক ভাবে আসে। আমি অনুভব করি সত্য বাক্য ও বুদ্ধির অতীত। তবে মনকে পড়া, বোঝার চেষ্টা, মুখস্থ করা ইত্যাদিতে লাগাবো কেন? তাদের উদ্দেশ্য সত্য লাভ করা। উদ্দেশ্য লাভ হয়ে গেলে পড়ার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

কেউ একজন মন্তব্য করলে—যদি শ্রীভগবানের পড়াশোনায় ঝোঁক থাকত তবে আজকে একজন মহাত্মাকে পাওয়া যেত না।

ম—আমার পড়াশোনা বোধহয় পূর্বজন্মেই হয়ে গেছে আর বেশ অত্যধিক পরিমাণেই হয়েছে। এখন আর সেদিকে কোন ঝোঁক নেই।

৭১৯। মহাপূজার আগের সপ্তাহে (৩রা জুন, ১৯৩৭) অনেক দর্শনার্থী এসেছে, তারমধ্যে শ্রীভগবানের কয়েকজন আত্মীয়ও আছেন। এঁদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা আছেন, শ্রীভগবান ১৮৯৬ সালে আগস্ট মাসে বাড়ী ছাড়ার সময়ে যার বাড়ীতে থাকতেন ইনি সেই সুব্বিয়ারের বিধবা পত্নী। এঁকে দেখে শ্রীভগবানের পূর্বস্মৃতি মনে পড়ল।

তাঁর স্মরণ হল যে একবার কোন পর্ব উপলক্ষ্যে তাঁকে মোদক (মিষ্টান্ন) তৈরী করার সময়ে সাহায্য করতে বলা হয়েছিল, তিনি প্রথমে ইতস্ততঃ ক'রে পরে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তাঁকে কাপড় ছেড়ে কেবল কৌপীন পরতে বলা হয়েছিল তাতে তাঁর লজ্জা হয়। তাঁর কাকা ও এই মহিলা তাঁকে বকেছিলেন। কাকীমা বিনয়ের সঙ্গে মৃত্নস্বরে বললেন, "ঠিকই হয়েছিল, যিনি এরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করবেন, তিনি আর সেদিন এত তুচ্ছ কাজ কেন করবেন।"

তারপর শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন, "সেদিন যদি একবার কৌপীন পরতে অস্বীকার করে থাকি তার শাস্তিসরূপ এখন সর্বক্ষণ পরে আছি।"

মহিলার মনে পড়ল যে শ্রীরমণ কিরূপ দিনের পর দিন মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন।

শ্রীভগবান বললেন—হাঁ, হাঁ। এটা মাতুরা ছাড়ার একমাস আগে হয়েছিল। এটা মাথার যন্ত্রণা নয়, কিন্তু একটা অবর্ণনীয় কষ্ট যা আমি চেপে রাখার চেষ্টা করতাম, তারই লক্ষণগুলো আমি বলতাম যে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে পড়ে, আমার 'মাথার যন্ত্রণার' জন্য তুমি কি রকম উদ্বিগ্ন হতে। আমার কপালে তুমি প্রতিদিন প্রলেপ লাগিয়ে দিতে। আমার কষ্টটা মাতুরা ছেড়ে এখানে পৌঁছানো পর্যন্ত ছিল।

৪ঠা জুন, ১৯৩৭

৪২০। কুদ্দালোরের একজন উকিল একটা শ্লোক উদ্ধৃত করলে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

কঠ. উ ২।২।১৫

"যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুতও নয় সেখানে অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাবে ? তাঁর প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত হয়। তাঁর জ্যোতিতে এ সকল দীপ্তিমান হয় !" সে জিজ্ঞাসা করলে 'তাঁর জ্যোতি' বলতে কি বোঝায় ? এ সকল কি তাঁর দ্বারা বা তাঁর জ্যোতির দ্বারা প্রকাশ পায় ?

শ্রীভগবান বললেন—কেবল তিনিই আছেন। তিনি ও তাঁর জ্যোতি এক। সেখানে অন্য কিছু দেখার জন্য কোন ব্যক্তিসত্তা নেই কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তিনিই স্বয়ং। চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি প্রকাশ পায়। কি করে ? তারা কি এসে বলে যে তারা প্রকাশ পাচ্ছে কিংবা তাদের থেকে আর একজন কেউ বলে যে তারা প্রকাশ পাচ্ছে ?

ভ—বস্তুতঃ আমিই বলি যে তারা প্রকাশ পাচ্ছে।

ম—অতএব তারা তোমার দ্বারাই প্রকাশ পায়। আবার তাদের প্রকাশ জানার জন্য চেতনার প্রয়োজন। সেই চেতনাটা তোমার আত্মা বা তুমি। অতএব তুমি ও তোমার চেতনা যেরূপ এক, তিনি ও তাঁর জ্যোতি যার দ্বারা সব কিছু প্রকাশ পায় সেরূপ এক।

ভ—সেই জ্যোতি কি সূর্যের আলোর মত ?

ম—না, সূর্যের আলো জড়। তুমি এটা জানো। এটা বস্তু প্রকাশ করে ও অন্ধকার দূর করে, অপরপক্ষে চেতনা সেই বোধ যা আলো ও অন্ধকার দু'টিকেই প্রকাশ করে। সূর্যের আলোয় অন্ধকার থাকে না কিন্তু চেতনার আলোয় এটা থাকতে পারে। অনুরূপভাবে এই চেতনা বিশুদ্ধ জ্ঞান যেখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই প্রকাশ পায়।

ভ—যদি ঈশ্বরই সব তবে মানুষ তার কর্ম ফল ভোগ করে কেন ? কাজগুলোর প্রেরণা কি তিনিই দেন না যার জন্য মানুষকে কষ্ট ভোগ করতে হয় ?

ম—যে নিজেকে কর্তা মনে করে সেই কষ্ট ভোগ করে।

ভ—কিন্তু কাজগুলো ঈশ্বরের প্রেরণায় হয় আর জীব তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র।

ম—এই যুক্তি কেবল কষ্ট ভোগ করার সময়ে দেওয়া হয় কিন্তু সুখের সময়ে নয়। যদি এই বিশ্বাসটা সব সময়ে থাকে তবে কোন দুঃখ থাকবে না।

ভ—কখন দুঃখ দূর হবে?

ম—যখন ব্যক্তিত্ব চলে যাবে। যদি ভাল ও মন্দ দু'টি কাজই তাঁর হয় তবে আর কেবল সুখ ও দুঃখকে তোমার নিজের বলে ভাববে কেন? যে ভাল বা মন্দ কাজ করে সেই সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সেখানেই ছেড়ে দাও, নিজের ওপর দুঃখ চাপিও না।

৪২১। আবাসিক ভক্ত কুঞ্জস্বামী ১৯২৩ সালে আশ্রমে চুরি হলে শ্রীমহর্ষির একটি মন্তব্য বললে।

কয়েকজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিল যে চোরেদের সাধুদের মারধর করতে দেওয়া উচিত কি না আর সাধুরা নিজেদের ও তাদের আশ্রিতদের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করবে কি না।

শ্রীভগবান বলেছিলেন—বিশ্বামিত্রের মত যাঁরা ইচ্ছা করলে আরও একটা ব্রহ্মাণ্ড তৈরী করতে পারেন এরূপ ঋষি ছিলেন। তাঁরা রাবণের সময়েও ছিলেন। সেই রাবণ রাম ও সীতা অবধি সবাইকে দুঃখ দিয়েছিল। বিশ্বামিত্র কি তাঁর যোগশক্তি দিয়ে রাবণ বধ করতে পারতেন না? সক্ষম হয়েও তিনি চুপ করে রইলেন। কেন? ঘটনা ঘটে যায় কিন্তু ঋষিদের মনে দাগ কাটে না। এমনকি একটা প্রলয় হলেও তাঁদের কাছে কিছু নয়, তাঁরা কিছুর জন্যই চিন্তা করেন না।

৭ই জুন, ১৯৩৭

৪২২। গুন্টুরের দর্শনার্থী ডাঃ বেঙ্কট রাও জিজ্ঞাসা করলে—এক-জন গুরু তাঁর শিষ্যকে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বলেন। শিষ্য তাঁকে

গুরু বলে স্বীকার করার জন্য তাঁকে খুশি করতে চায় অথচ কাজটা তার বিবেকে বাধে। এ ক্ষেত্রে সে কি করবে?

(কোন উত্তর নেই)।

আমি আরও খুলে বলি। গুরু তখন বললেন, "আমি তোমার সমর্পণ সম্পূর্ণ হয়েছে কিংবা ব্যক্তিত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করছিলাম। এখন বোঝা গেল।" গুরুর কি এভাবে বলা উচিত?

(এবারও কোন উত্তর হল না)।

আর একজন মন্তব্য করলে—অনেক লোক আছেন যাঁদের সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই না। তবু মনে হয় এসব লোক গুরু নামের উপযুক্ত কি না। তাঁদের বাজে লোক মনে হয়। যদি তাঁরা খাঁটি হবেন তবে শিষ্যকে এরূপ আদেশ করবেন কেন?

ম—কিন্তু লোকটি বলে, 'এটা পরীক্ষার জন্য'।

প্রশ্নকর্তা বললে—তবে কি আজ্ঞা পালন করা উচিত?

ম—তোমার প্রথম বক্তব্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।

দু'জন প্রশ্নকারী একসঙ্গে বলে উঠল—কাজটা অন্যায়। করা কি উচিত?

ম—প্রশ্নটা তাকেই অর্থাৎ গুরুকেই করা উচিত ছিল। সেই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

৪২৩। একজন যুবক বললে—আমি মনের শক্তি বাড়াতে চেষ্টা করি কিন্তু হয় না। কি করে করব?

(উত্তর নেই)।

ভ—আমি তিন বছর আগে এসেছিলাম আর শ্রীভগবান বলেছিলেন মনের শক্তির জন্য ইচ্ছা-শক্তি বাড়াতে হবে। সেই থেকে চেষ্টা করছি কিন্তু সফল হইনি।

(উত্তর নেই)।

ভ—এই ক'বছরে চার পাঁচটা বিপত্তি হয়েছে। তাতে আমায় খুবই বিচলিত করেছে। সর্বদা ব্যর্থ হওয়ায় আমার ভীতি হয়েছে। এ থেকে নিজের ওপর বিশ্বাস চলে যাওয়ায় সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বস্তুতঃ একবার সফল হলে সফলতা আসে আর একবার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতাই হয়। এইজন্য প্রশ্ন করছি।

(উত্তর নেই)।

ভ—সফল হওয়ার জন্য মনের জোর চাই? এ থেকেই সফলতা আসবে আর ব্যর্থতা দূর হবে।

(উত্তর নেই)।

ভ—আমি মনের জোর বাড়াবার চেষ্টা করি। এই কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করেও যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। কোন উন্নতি হয়নি।

(উত্তর নেই)।

ভ—ইচ্ছাশক্তি বাড়াবার উপায় কি?

ম—তোমার ইচ্ছাশক্তির ধারণা নিশ্চিত সফলতা লাভ। ইচ্ছাশক্তিকে মনের সেই ক্ষমতা বলে বুঝতে হবে যা সফলতা ও ব্যর্থতা সমানভাবে নিতে পারে। এটা নিশ্চিত সাফল্যের সমার্থ নয়। কেনই বা একজনের চেষ্টা সর্বদা সফল হবে? সফল হলেই ঔদ্ধত্য বাড়ে, তাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা হয়। ব্যর্থতা অপরপক্ষে শুভকর কেন না এটা তার নিজের সীমিত অবস্থা সম্বন্ধে চোখ খুলে দিয়ে তাকে সমর্পণের জন্য তৈরী করে। আত্মসমর্পণই শাশ্বত আনন্দের নামান্তর। অতএব একজন সর্বাবস্থায় মনের সমতা রাখার চেষ্টা করবে। সেটাই ইচ্ছাশক্তি। আবার সফলতা ও ব্যর্থতা একজনের প্রারব্ধের ফল, ইচ্ছাশক্তির নয়। একজন হয়ত সব সময়ে অন্যের ভাল ও মহৎ কাজ করছে কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে। আর একজন অন্যরকম ক'রে সর্বদা সফল হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের মনের জোর আছে আর অন্যজনের নেই।

ভ—'সদ্‌-বিদ্যা' বই-এ কি বলা হয় নি যে জগতটা মনের সৃষ্টি?

ম—হাঁ।

ভ—তার অর্থ কি এই নয় যে মন শক্তিশালী হলে জগতকে বশে আনতে পারে?

ম—মনের বহির্মুখী ক্রিয়ার দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়। এই ক্রিয়ায় মনের শক্তির অপচয় হয়। বহির্মুখী ক্রিয়া অবদমিত হয়ে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকাতেই এর (মনের) শক্তির পরিচয়।

ভ—একজন জড় বুদ্ধি যে দশ অবধি গুনতে পারে না তার মন নিশ্চয় যে চিন্তা করে তার মত ঘুরে বেড়ায় না। তবে সে কি অপরজনের অপেক্ষা ভাল?

ম—কে তাকে জড়বুদ্ধি বলছে? তোমার মনই তার চঞ্চল অবস্থায় এরূপ বলে।

ভ—অন্য চিন্তা দূর করলে কি মনের শক্তি বাড়ে?

ম—অর্থাৎ একটা চিন্তাতে লেগে থাকলে বাড়ে। অবশেষে এটাও চলে যাবে আর কেবল বিশুদ্ধ চেতনা থাকবে। একাগ্রতায় এটা লাভ হয়।

ভ—অতএব মনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে একাগ্র করলে এটা লাভ হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ম—ব্যক্তিত্বই বহির্মুখী কাজের মূল কারণ। পরমার্থ পেতে হলে এটার নাশ হওয়া চাই।

৪২৪। একজন পণ্ডিতের সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন—

পুরুষ ও প্রকৃতি এক ব্রহ্মের দু'টি বিভাব। শিষ্যের দ্বৈত-বোধ প্রবল হওয়ার জন্য তাদের অনুমান করে নেওয়া হয়। সেই গীতাই আবার বলে যে পুরুষোত্তম পুরুষ ও প্রকৃতির অতীত।

ভ—পরানাড়ী, সুষুম্না ও হৃদয় কি ?

ম—সুষুম্না পরাতে লীন হয় (সুষুম্নাতু পরেলীনা)। সাধারণতঃ বুকের বাঁদিকে অবস্থিত মাংসপিণ্ডটিকে হৃদয় মনে করা হয়। 'মডার্ন সাইকোলজিক্যাল রিভিউ' বলে বাঁদিকে স্থূল যন্ত্রটি আর ডানদিকে হৃদ্‌কেন্দ্রটি আছে। বাইবেল বলে অজ্ঞানীর হৃদয় বাঁদিকে আর জ্ঞানীর হৃদয় ডানদিকে। 'যোগবাশিষ্ঠ' বলে হৃদয় দু'টি, এর মধ্যে একটি সম্বিৎ আর অন্যটি রক্তবহা নাড়ী।

ভ—অনাহত কি ?

ম—অনাহত হৃদয়ের পিছনে অবস্থিত একটা চক্র। এটা সম্বিৎ নয়। ললিতা সহস্রনামে 'অনাহত চক্রস্থায়ৈ নমো নমঃ (অনাহত চক্রস্থিতাকে প্রণাম) আর পরের মন্ত্রে 'হৃৎ' (হৃদয়ে) বলা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে অনাহত ও হৃৎ এক নয়।

৪২৫। মনোবল বা অন্য কিছু অভ্যাসে লাভ হয়।

ভ—সফলতা কি গুরুকৃপার ওপর নির্ভর করে না ?

ম—হাঁ, করে। তোমার অভ্যাসও কি এই কৃপার জন্যই হয় না ? ফল লাভ অভ্যাসের পরিণাম আর স্বাভাবিকভাবে তাকে অনুসরণ করে। 'কৈবল্যে' একটা শ্লোক আছে, তাতে লেখা আছে, 'হে গুরু, তুমি জন্মজন্মান্তর হতে আমার সাথে আছ ও আমায় দেখছ আর যতদিন না মুক্তি হয় ততদিন পথ দেখাচ্ছ। আত্মাই প্রয়োজন বোধে বাইরে গুরুরূপে প্রকাশ হন ; পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই অন্তরে থেকে যা করার করছেন।

১২ই জুন, ১৯৩৭

৪২৬। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীদাস—আমরা সাধারণতঃ যা খাদ্য খাই তার সঙ্গে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতির সম্বন্ধ

আছে? অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার ওপর কি এদের ভাল বা মন্দ প্রভাব পড়ে?

ম—হাঁ, পরিমিত সাত্ত্বিক খাদ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক।

ভ—কি করলে গৃহীর পক্ষে সর্বাধিক আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য হয়?

ম—ধ্যান বা ভক্তি, দু'টিই এক।

ভ—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার কি অর্থ? নিম্নোক্ত দু'টি বাক্যের সমন্বয় কি করে হয়?

বাইবেল বলে—"বৃথা ঈশ্বরের নাম নিও না।"

হিন্দু শাস্ত্র সর্বদা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার নির্দেশ দেয়।

ম—অন্তরের আবেগ ছাড়া কৃত্রিমভাবে ও ওপরভাসাভাবে ঈশ্বরের নাম নেওয়া উচিত নয়। তাঁর নাম নেওয়ার সময়ে তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরূপ সমর্পণ হলে ঈশ্বরের নাম সর্বদা তার সঙ্গে থাকে।

ভ—আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন্ মানদণ্ড দ্বারা বোঝা যায়, কেন না কেউ কেউ উন্মত্তের মত আচরণ করেন?

ম—জ্ঞানীর মন একমাত্র জ্ঞানীরই বোধগম্য হয়। একজন জ্ঞানীকে বুঝতে হলে জ্ঞানী হতে হবে। যা হোক জ্ঞানীর সান্নিধ্যে মনে যে শান্তি লাভ হয় তা থেকেই মুমুক্ষুরা জ্ঞানীর মহত্ব অনুভব করে।

তাঁর কথা বা কাজ বা আকৃতি তাঁর মহত্বের পরিমাপক নয় কারণ সেগুলো প্রায়ই সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

ভ—মানুষের পুরুষকার বলে কিছু আছে, না সবই পূর্ব-নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত?

ম—ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরুষকার সহ-অবস্থিত। যতক্ষণ ব্যক্তিতা থাকে ততক্ষণ পুরুষকার আছে। সব শাস্ত্রই এই তথ্যের ওপর কেন্দ্রিত, আর তারা পুরুষকারকে ঠিক পথে চালিত করতে উপদেশ দেয়।

খুঁজে দেখো পুরুষকার বা প্রারব্ধটা কার? তাতেই থাকো। তাহলেই এ দু'টির অতীত হয়ে যাবে। এসব আলোচনার এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এসব প্রশ্ন কার ওঠে? খোঁজো আর শান্তি লাভ কর।

ভ—বুদ্ধি ও অনুভূতি কি স্থূল শরীরের মত মানুষের জন্মাবার সঙ্গে উৎপন্ন হয় ও মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা থাকে?

ম—মৃত্যুর পর কি হয় বিবেচনা করার আগে একবার সুষুপ্তিতে কি হয় ভেবে দেখো। সুষুপ্তি দু'টি জাগ্রত অবস্থার অন্তর্বর্তী অবস্থা। এরা (বুদ্ধি ও অনুভূতি) কি সেই বিরতির সময়ে বেঁচে থাকে?

ভ—হাঁ, তারা থাকে।

ম—মৃত্যুতেও এটা খাটে। এরা দেহ-চেতনার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছু নয়। যদি তুমি শরীর হও তারা তোমাকে ধরে থাকে। যদি তুমি শরীর না হও এরা তোমায় প্রভাবিত করে না। যে সুষুপ্তিতে ছিল সেই এখন জাগ্রত অবস্থায় কথা বলছে। তুমি সুষুপ্তিতে শরীর ছিলে না। এখন কি তুমি শরীর? এটা খুঁজে দেখো। তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যা জন্মেছে তা মরবে। জন্মটা কার? তোমার কি জন্ম হয়েছে? যদি বল তোমার জন্ম হয়েছে, কার জন্মের কথা তুমি বলছ? শরীরেরই জন্ম হয়েছে আর সেটাই মরবে। জন্ম ও মৃত্যু শাশ্বত আত্মাকে কি করে প্রভাবিত করবে?

বিচার কর আর তারপর বল প্রশ্নটা কার? তবেই জানতে পারবে।

৪২৭। ভ—বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনি ও জ্যোতি দ্বারা গঠিত। এ দু'টি কি স্থূল জগতের শব্দ ও আলোর মত? একে কি স্থূল ইন্দ্রিয়—চোখ বা কান দিয়ে দেখা বা শোনা যায়? কিংবা এগুলো কেবল অনুভূতির বিষয়?

ম—ধ্বনি ও জ্যোতি তান্ত্রিক পরিভাষায় নাদ ও বিন্দু, আর বেদান্তের পরিভাষায় প্রাণ ও মন। এরা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। ইন্দ্রিয় কেবল স্থূল বিভাবটা ধরতে পারে, বাকীগুলো ধরা যায় না। সূক্ষ্মটা অনুমান করা হয় আর কারণটা কেবল কারণ।

ভ—হিন্দুধর্ম বলে যে জীবের পুনর্জন্ম আছে। একটা দেহ-ত্যাগের পর ও পুনর্বার দেহগ্রহণের অন্তর্বর্তী অবস্থায় কি হয়?

ম—সুষুপ্তি অবস্থার বিচার করে এটার সমাধান কর। সুষুপ্তিতে তোমার কি হয়?

ভ—আমি জানি না।

ম—তবু তুমি থাকো। অতএব জানা ও না জানার অতীতে একটা অস্তিত্ব আছে। যদিও তোমার উপস্থিত ধারণায় সেটা অজানা মনে হচ্ছে তবু তুমি সুষুপ্তিতে তা বলো নি। তা সত্বেও তুমি ঠিকই ছিলে। কেবল না জানার জন্য তোমার অস্তিত্বের অভাব বোঝায় না।

ভ—ধ্যান অভ্যাসের সময়ে এমন কিছু অনুভূতি বা অন্য কিছু কি আছে যার দ্বারা সাধকের আত্মজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে বলে বোঝা যায়?

ম—অবাঞ্ছিত চিন্তার হাত থেকে মুক্তি ও একটি মাত্র চিন্তায় একাগ্র হওয়ার ক্ষমতা থেকেই উন্নতির পরিমাপ হয়।

ভ—আত্মজ্ঞানের জন্য কি সন্ন্যাস নিতে হবে?

ম—সন্ন্যাসের অর্থ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ। এটা কেবল গৈরিক ও চিমটা নেওয়া নয়। একজন গৃহী হয়েও যদি নিজেকে গৃহী মনে না করে, সে সন্ন্যাসী। অপরপক্ষে একজন সন্ন্যাস নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও যদি নিজেকে সন্ন্যাসী মনে করে তবে সে তা নয়। সন্ন্যাসের কথা চিন্তা তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে।

শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—

লোকে জগৎ দেখে। দেখার অর্থ একজন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের

অস্তিত্ব। বিষয়গুলো দ্রষ্টার পরক্। আত্মা হওয়ায় দ্রষ্টা অন্তরঙ্গ। তথাপি তারা তাদের মনোযোগ স্বতঃসিদ্ধ দ্রষ্টার দিকে না ফিরিয়ে কেবল দৃশ্য বস্তুর বিশ্লেষণে লাগায়। মন যতই ছোটে ততই দূরে চলে যায় আর আত্মজ্ঞান লাভকে কষ্টকর ও জটিল ক'রে তোলে। মানুষের সোজাসুজি দ্রষ্টাকে দেখে আত্মাকে অনুভব করা উচিত।

ভ—অতএব এর আশয় হল ব্যাপারগুলোর সমন্বয় ক'রে তার পিছনের সত্যকে খুঁজে পাওয়া।

ম—ব্যাপারগুলো দেখার দরকার কি? দেখো, দ্রষ্টাটা কে? সমন্বয় করার অর্থ মনকে অন্য কাজে লাগানো। এটা আত্মজ্ঞানের পথ নয়।

ভ—আমি অনাত্মবস্তুকে পরিহার করতে চাই যার ফলে আত্মা অনুভূত হবে। কি করে করব? অনাত্মবস্তুর স্বরূপ কি?

ম—একজন বলছে যে অনাত্মবস্তুকে পৃথক করতে হবে। সে কে?

ভ—আমি বলতে চাই, এই লোকটি। আমি যখন কলিকাতা থেকে মাদ্রাজে আসি, আমার মাদ্রাজ সম্বন্ধে জানা দরকার, না হলে ভুল ক'রে মাঝ পথে নেমে যেতে পারি। ভ্রমণ করার জন্য সূচনা-পট (সাইন বোর্ড) ও সময় সারণী (টাইম টেবিল) আছে। কিন্তু আত্মাকে খোঁজার পথ-প্রদর্শক কি?

ম—ভ্রমণের পক্ষে এটা ঠিক। তুমি জানো তুমি মাদ্রাজ থেকে কত দূরে আছ। আচ্ছা, বলতো তুমি আত্মা থেকে কতদূরে রয়েছ যে তাকে খুঁজে বার করবে?

ভ—আমি জানি না।

ম—তুমি কি কখনো আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকো? বিচ্ছিন্ন হওয়া কি সম্ভব? এসব কি তোমার পরক্ নয় আর আত্মা কি তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ নয়? আত্মাকে লাভ করতে কোথায় যাবে?

ভ—আমি এখন আত্মা থেকে দূরে রয়েছি। পুনর্বার তাকে লাভ করতে হলে আমায় ফিরে যেতে হবে।

ম—কত দূরে রয়েছ? কে বলে যে সে বিচ্ছিন্ন? দু'টি কি আত্মা আছে?

ভ—বলা হয় যে জীব আত্মার বিবর্ত (রূপান্তর) যেমন গহনাগুলো সোনার বিকার।

ম—যখন কেউ সোনাকে ভুলে কেবল গহনার কথা বলে তাকে বলা হয় যে সেগুলোও সোনা। কিন্তু এখানে মানুষ নিজেই চেতনা আর সে নিজেকেই তার চেতনার বিবর্তন বলছে। তুমি কি আত্মা থেকে পৃথক থাকো যে নিজেকে আত্মার বিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করছ?

ভ—কল্পনা করে নেওয়া যায় না কি যে সোনা বলছে যে সে গহনা হয়েছে?

ম—জড় হওয়ার জন্য সে সেটা বলে না। কিন্তু একজন ব্যক্তি চেতনা আর চেতনা ব্যতীত সে ক্রিয়াশীল হয় না। আত্মা বিশুদ্ধ চেতনা। তথাপি মানুষ তাকে শরীর বলে ভুল করে আর সেটা জড় হওয়ার জন্য নিজে হতে 'আমি শরীর' বলে না। অন্য একজন কেউ এটা বলে। অসীম আত্মা এটা বলে না। যে এটা বলে সে কে? একটা নকল 'আমি' বিশুদ্ধ চেতনা ও শরীরের মধ্যে উদয় হয়ে নিজেকে শরীরে সীমিত বলে কল্পনা করে। একে খোঁজো তাহলে এটা ছায়ামূর্তির মত চলে যাবে। এই মিথ্যা মূর্তিটা অহংকার বা মন বা ব্যক্তিত্ব।

সমস্ত শাস্ত্র কেবল এই ছায়ামূর্তির উদয়ের ওপর আধারিত রয়েছে, এর (অহংকারের) নিরসনই এদের উদ্দেশ্য। উপস্থিত অবস্থা একটা ভ্রম। ভ্রম নিবারণই লক্ষ্য, আর কিছু নয়।

ভ—মনকে চিন্তার সমষ্টি বলা হয়।

ম—কারণ এটা একটা 'আমি'-চিন্তারূপ উৎস থেকে উদয় হয়।

মানসংতু মার্গণেকৃতে নৈব মানসং মার্গ আর্জবাৎ ॥
(মনকে খুঁজলে মন বলে কিছু নেই, এটিই সরল পথ।)
এর কোন প্রকৃত পৃথক অস্তিত্ব নেই।

ভ—মন থেকেই কি চিন্তাগুলো অভিক্ষিপ্ত হয় না ?

ম—সে ক্ষেত্রে মনকে 'আমি'-চিন্তা বা অহংকারের সমার্থ বলা যায়।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪২৮। শ্রীভগবান ভক্তি ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রীশঙ্করের বিখ্যাত রচনা—'শিবানন্দ লহরী' থেকে দশটি শ্লোক বেছে নিয়েছেন—

(১) ভক্তি কি ?

অঙ্কোলং নিজবীজ সংততিরয়স্কান্তোপলং সূচিকা
সাধ্বী নৈজবিভুং লতাক্ষিতিরুহং সিন্ধুঃ সরিদ্বল্লভম্।
প্রাপ্নোতীহ যথা তথা পশুপতেঃ পাদারবিন্দদ্বয়ং
চেতোবৃত্তিরুপেত্য তিষ্ঠতি সদা সা ভক্তিরিত্যুচ্যতে ॥৬১

যেমন আঁকোড় (আঁইশ) গাছের ফল গাছ থেকে পড়লেও গাছেই লেগে থাকে অথবা এক খণ্ড লোহা চুম্বকের প্রতি আকর্ষিত হয় সেরূপ চিন্তাগুলো উঠে নিজেরই উৎসে মিলিয়ে যায়। এই ভক্তি। সঙ্কল্পের উৎস ঈশ্বরের শ্রীচরণ। তাঁর শ্রীচরণের প্রতি প্রেমই ভক্তি।

(২) ভক্তির ফল—

ভক্তির্মহেশপদ পুষ্করমাবসন্তী
কাদম্বিনীব কুরুতে পরিতোষ বর্ষম্।
সংপূরিতো ভবতি যস্য মনস্তটাক
স্তজ্জন্মসস্যমখিলং সফলং চ নান্যৎ ॥ ৭৬

ঈশ্বরের তুরীয় পদরূপ নভোমণ্ডল ভক্তিমেঘের আবাসস্থল আর তারই আনন্দবর্ষণে মনরূপ হ্রদ পরিপূর্ণ হয়ে উচ্ছলিত হয়। তখনই জীবের জন্মজন্মান্তরের বৃথা পর্যটনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৩) কাকে ভক্তি করা উচিত?

জননমৃতিযুতানাং সেবয়া দেবতানাং
ন ভবতি সুখলেশঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র।
অজনিমমৃতরূপং সাম্বমীশং ভজন্তে
য ইহ পরম সৌখ্যং তে হি ধন্যা লভন্তে॥

উৎপত্তি ও বিনাশশীল দেবতার আরাধনার ফলও সেরূপ আদ্যন্তবান। পরমসুখ লাভের জন্য ভক্তিকে তার উৎসে অর্থাৎ ঈশ্বরের অমৃতময় পদে স্থাপন কর।

(৫) ভক্তি অনুভূতি-সাপেক্ষ, যুক্তির বিষয় নয়—

ঘটো বা মৃৎপিণ্ডোঽপ্যণুরপি চ ধূমোঽগ্নিরচলঃ
পটো বা তন্তুর্বা পরিহরতি কিং ঘোর শমনম্।
বৃথা কণ্ঠক্ষোভং বহসিতরসা তর্ক বচসা
পদাম্ভোজং শম্ভোর্ভজ পরম সৌখ্যং ব্রজ সুধীঃ॥ ৬

যুক্তি বা বাদানুবাদে প্রকৃত লাভ কি হতে পারে? ঘট পট (তার্কিকদের বহু প্রচলিত দৃষ্টান্ত) কি তোমাকে বিপদে উদ্ধার করবে? তবে তাদের সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করা কেন? এরূপ কণ্ঠের কষ্টদায়ক বৃথা কাজ থেকে নিবৃত্ত হও। ঈশ্বরের শ্রীচরণ চিন্তা কর ও পরম সুখ লাভ কর।

(৫) ভক্তির ফল অমরতা—

বক্ষস্তাড়ন শঙ্কয়া বিচলিতো বৈবস্বতো নির্জরাঃ
কোটিরোজ্জ্বল রত্নদীপকলিকা নীরাজনং কুর্বতে।

দৃষ্ট্বা মুক্তিবধূস্তনোতি নিভৃতাশ্লেষং ভবানীপতে
যচ্চেতস্তব পাদপদ্মভজনং তস্যেহ কিং দুর্লভম্ ॥ ৬৫

যার হৃদয়ে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম অঙ্কিত রয়েছে তাকে দেখে পূর্ব-যুগে মার্কণ্ডেয়র নিকট যমের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ হয় আর সে পলায়ন করে।

সকল দেবতা তাদের শিরোরত্ন শিবের চরণে স্থাপন করে আরাধনা করে। এরূপ অহেতুক ভক্তি স্বাভাবিকভাবে কেবল শিবের প্রতি হয়।

মুক্তিদেবী, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, সর্বদাই তাঁর বক্ষলগ্না হয়ে রয়েছেন।

(৬) যদি ভক্তি থাকে তবে জীবের অবস্থা তাকে বিচলিত করে না।

নরত্বং দেবত্বং নগবনমৃগত্বং মশকতা
পশুত্বং কীটত্বং ভবতু বিহগত্বাদি জননম্।
সদা ত্বৎ পাদাব্জ স্মরণ পরমানন্দলহরী
বিহারাসক্তং চেৎহৃদয়মিহ কিং তেন বপুষা ॥ ১০

যে কোন শরীর ধারণ হোক না কেন যদি ঈশ্বরের চরণে মন লয় হয তবে অমৃত লহরী প্রবাহিত হয়!

(৭) সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি—

গুহায়াং গেহে বা বহিরপি বনে বাঽদ্রিশিখরে
জলে বা বহ্নৌ বা বসতু বসতেঃ কিংবদফলম্।
সদা যস্যৈবান্তঃকরণমপি শম্ভো তব পদে
স্থিতং চেদ্‌যোগোঽসৌ স চ পরম যোগী স চ সুখী ॥ ১২

যেখানে বা যেভাবে হোক মন যেন পরমাত্মায় থাকে। এই যোগ! এই আনন্দ! কিংবা সে যোগী বা আনন্দের প্রতিমূর্তি!

(৮) কর্মযোগও ভক্তি—

গভীর কাসারে বিশতি বিজনে ঘোরবিপিনে
বিশালে শৈলে চ ভ্রমতি কুসুমার্থং জড়মতিঃ।
সমর্প্যৈকং চেতঃ সরসিজমুমানাথ ভবতে
সুখেনাবস্থাতুং জন ইহ ন জানাতি কিমহো॥ ৯

কুসুম বা অন্যান্য দ্রব্যে ঈশ্বরের পূজা কষ্টসাধ্য। হৃদয়রূপ একটি মাত্র পুষ্প শিবের শ্রীচরণে নিবেদন ক'রে শান্তিতে থাকো। এই সহজ উপায় না জেনে ভ্রমণ করা কি মূর্খতা! কি দুর্ভাগ্য!

(৯) এই কর্মযোগে সংসার ক্ষয় হয়—

বটুর্বা গেহী বা যতিরপি জটী বা তদিতরো
নরো বা যঃ কশ্চিদ্ভবতু ভব কিং তেন ভবতি।
যদীয়ং হৃৎপদ্মং যদিভবদধীনং পশুপতে
তদীয়স্ত্বং শম্ভো ভবসি ভবভারং চ বহসি॥ ১১

ভক্ত যে কোন আশ্রমাশ্রিত হোক না কেন, একবার মাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করলে তিনি তার সংসারভার নিজের ওপর তুলে নেন।

(১০) ভক্তিই জ্ঞান—

আদ্যাঽবিদ্যা হৃদগতা নির্গতাসীৎ
বিদ্যা হৃদ্যা হৃদগতা ত্বৎ প্রসাদাৎ।
সেবে নিত্যং শ্রীকরং ত্বৎপদাব্জং
ভাবে মুক্তের্ভাজনং রাজমৌলে॥ ৯১

শিবের শ্রীচরণকমলে মন লয় হওয়াই ভক্তি। অবিদ্যা অপগত! জ্ঞান! মুক্তি!

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪২৯। বাঙ্গালোর থেকে কয়েকজন মহিলা এসেছে। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের দিক থেকে জগতটা বৈচিত্র্য দিয়ে তৈরী। আমরা কি করে এই পার্থক্যের সমন্বয় ক'রে তার মধ্যে একটি মূল বস্তুকে জানবো ?

ম—কর্তৃত্ববোধের জন্যই পার্থক্যবোধ হয়। মূলটি নষ্ট হলে ফলটিও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ কর, নানাত্ব চলে যাবে, মূল সত্য নিজেকে প্রকাশ করবে।

কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করতে হলে কর্তাকে খুজে বার করতে হবে। অন্তরে খোঁজো ; কর্তৃত্ববোধ চলে যাবে। বিচারই উপায়।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩০। জনৈক মারাঠী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আমি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি ; জপ, পূজা ইত্যাদি করি ; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শ্রীভগবান কি কৃপা ক'রে আমায় উপদেশ দেবেন ?

ম—তুমি কি পেতে চাও ? সবাই আনন্দ খোঁজে। প্রত্যেকের প্রতিদিনের সুষুপ্তিতে আনন্দানুভূতি আছে। সেই আনন্দ অবস্থাকে জাগ্রতেও নিয়ে এস। ব্যস্।

ভ—আমি বুঝতে পারলাম না। কি করে করতে হবে ?

ম—আত্মবিচারই পথ।

ভ—এটা ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে খুব কঠিন মনে হয়। আমি যদি বিচার মার্গের উপযুক্ত না হই তবে কি করব ?

ম—পথ বলাই আছে। লোকেদের সেটা নিলেই হয়।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩১। একজন তেলেগু ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—যখন সব বাসনা চলে যায় তখন মনকে বিশুদ্ধ বলা হয়। আর এটাই চরম অবস্থা। যখন কিছু পাওয়া আছে সেটা কি দ্বৈতবোধ নয়?

ম—মনটা আগে বিশুদ্ধ হোক। তারপর যদি এই প্রশ্ন জাগে তখন তার উত্তর খোঁজা যাবে।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩২। একজন আন্ধ্র দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—নিদ্রা কি?

ম—কেন, তুমি প্রতিদিন এটা অনুভব কর।

ভ—আমি এটা ঠিক কি জানতে চাই যাতে একে সমাধি থেকে পৃথক করা যায়।

ম—জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রাকে কি করে জানবে? এর উত্তর ঘুমিয়ে পড় আর সেটা কি খুঁজে দেখো।

ভ—কিন্তু আমি একে এভাবে জানতে পারব না।

ম—প্রশ্নটা সুষুপ্তিতেই তুলতে হবে।

ভ—কিন্তু তখন প্রশ্ন তুলতে পারি না।

ম—সুতরাং সেটাই নিদ্রা।

শ্রীভগবান কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে গেলেন। তিনি ফিরে এলে সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—

জ্ঞানীদের অন্যদের মত পানভোজন ও কাজ করতে দেখা যায়। তাঁরা কি অনুরূপভাবে স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও অনুভব করেন?

ম—তুমি অন্যের অবস্থা, যেমন জ্ঞানীদেরটা, জানতে চাও

কেন ? অন্যদের সম্বন্ধে জেনে তোমার কি লাভ হবে ? তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানার চেষ্টা কর।

তুমি নিজেকে কি মনে কর ? শরীর নিশ্চয়।

ভ—হাঁ।

ম—সেজন্য জ্ঞানীদেরও তুমি দৃশ্যমান শরীর মনে কর আর তার ওপর কাজগুলো আরোপ কর। সেটাই তোমায় প্রশ্ন করায়। জ্ঞানী তাঁর নিজের স্বপ্ন বা সুষুপ্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন না। তাঁর কোন সংশয় নেই। সংশয়গুলো তোমার। এ থেকেই ভুল ধারণাটা যে তোমার তা বোঝা উচিত। জ্ঞানী শরীর নয়। তিনি সবার আত্মা।

নিদ্রা, স্বপ্ন, সমাধি ইত্যাদি অবস্থাগুলো অজ্ঞানীর। আত্মা এসব হতে মুক্ত। এটা তোমার আগের প্রশ্নেরও উত্তর।

ভ—আমি 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থাটা জানতে চেয়েছিলাম।

ম—শাস্ত্র জ্ঞানীর জন্য নয়। তাঁর কোন সংশয় নেই যে নিরসন করতে হবে, যা কিছু সন্দেহ তা অজ্ঞানীর। শাস্ত্র কেবল তাদের জন্য।

ভ—সুষুপ্তি একটা বোধশূন্য অবস্থা আর সমাধিকেও তাই বলা হয়।

ম—জ্ঞান বোধ ও বোধশূন্যতার অতীত। সেই অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হয় না। সেটা আত্মা।

৪৩৩। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীথমাস্ ত্রিবান্দ্রমে প্রাচ্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করে কলিকাতা যাওয়ার পথে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর কপাল উন্নত, স্বভাব নম্র। তিনি ধীরে ও মৃদুস্বরে কথা বলেন। তাঁর প্রাচ্য সাহিত্য বিশেষতঃ সংস্কৃত সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ। তামিল-ভাষার সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও শুনেছেন। তিনি ভগবদ্গীতার সব থেকে

ভাল ইংরাজী অনুবাদ কোনটা জানতে চাইলেন। হলঘরে অনেক লোক ছিল; প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতানুসারে কয়েকটি নাম বললে যথা থিবট, মহাদেব শাস্ত্রী, তেলাঙ্ ইত্যাদি। শ্রীভগবান একবার এফ. টি. ব্রুকের নাম করলেন। শ্রীথমাস্ একটি ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ খুঁজছিলেন কারণ রস গ্রহণের পক্ষে এটাই সর্বপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম। তিনি বললেন, রসই শান্তি।

ম—হাঁ, ব্রহ্ম রস-স্বরূপ।

ভ—রসই পরমানন্দ।

ম—রস, আনন্দ, শান্তি এসবই পরমানন্দের নামান্তর। অধ্যাপককে শ্রীগ্রাণ্ট ডাফের প্যারীতে ফিলজফিক্যাল সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাটি দেখানো হল। পরে ডঃ জি. এইচ. মিসের 'ধর্ম' বইটি তাঁর হাতে দেওয়া হল। সেটা দেখে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের মতামত জানতে চাইলেন।

ম—জাতিভেদ শরীর সংক্রান্ত, আত্মার নয়। আত্মা পরমানন্দ। পরমানন্দকে অনুভব করলেই আত্মা অনুভূত হয়। জাতিভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার নেই।

ভ—অহংকারকেও আত্মা বলা হয়।

ম—অহংকার সীমিত, অপরপক্ষে আত্মা তার অতীত।

ভ—প্রাচ্য দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ইংরাজী গ্রন্থ আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকারও আছে। রামানুজের দর্শন বেশ সুষ্ঠু রচনা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ অদ্বৈত মতবাদ প্রচার করেন। তিনি যুক্তির অপেক্ষা অনুভূতির ওপর বেশী গুরুত্ব দেন। শঙ্কর প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন।

প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। অধ্যাপক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে মানসিক অনুভূতি থেকে পৃথক এ বিষয়ে বললেন।

ম—নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় ও মন অহংকার থেকে জন্ম নেওয়ার জন্য

আত্মার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিতে পারে না। আত্মাই তাদের আধার। তারা আত্মা-নিরপেক্ষ সতন্ত্রভাবে থাকে না। একজনের অস্তিত্ব স্বতঃ-সিদ্ধ। পরমানন্দই আত্মা। আত্মপ্রীতির জন্য সব কিছু প্রিয় অনুভূত হয়।

ভ—প্রীতিতে দ্বৈতভাব আসে। আত্মা কি করে প্রীতির বস্তু হতে পারে?

ম—প্রীতি আত্মা থেকে পৃথক নয়। বস্তুর প্রতি প্রীতি নিম্ন-স্তরের ও অস্থায়ী। অন্যপক্ষে আত্মাই প্রেম, অন্যভাবে ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ।

ভ—খ্রীস্টীয় ধারণাও তাই।

তিনি শ্রীভগবানকে লক্ষ্য লাভের পক্ষে কোন্ পথটি সর্বোত্তম তাও জিজ্ঞাসা করলেন। পতঞ্জলির পথটি কি সর্বশ্রেষ্ঠ নয়?

ম—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' (যোগের অর্থ মনের চাঞ্চল্য দমন)—এটা সকলেই স্বীকার করে। আর এটাই সবার লক্ষ্য। উপায় একজনের সামর্থ্যানুসারে। লক্ষ্য সবার এক। তথাপি লক্ষ্য লাভের পূর্বে অভ্যাসের বিভিন্নতার জন্য এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। ভক্তি, যোগ, জ্ঞান সবই এক। 'স্ব-স্বরূপানুসন্ধানম্ ভক্তিরিত্য-ভিধীয়তে' (আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে)।

ভ—শ্রীভগবান কি অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন?

ম—দ্বৈত ও অদ্বৈত আপেক্ষিক শব্দ। এগুলো দ্বৈতবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা যা আছে তাই। সেখানে দ্বৈত নেই, অদ্বৈতও নেই। "আমি আছি যা আমি আছি" (আই অ্যাম্ দ্যাট্ আই অ্যাম্)। কেবল অস্তিত্বই আত্মা।

ভ—এটা মায়াবাদ নয়।

ম—মনই মায়া। সত্য মনের অতীত। যতক্ষণ মন সক্রিয় ততক্ষণ দ্বৈত, মায়া ইত্যাদি আছে। একবার এর অতীত হয়ে গেলে সত্য প্রকাশিত হয়। যদিও একে প্রকাশিত হয় বলা হয়, কিন্তু আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ।

ভ—এটা সৎ-চিৎ-আনন্দ।

ম—সৎ-চিৎ-আনন্দ শব্দে এই সূচিত হয় যে পরমসত্তা অসৎ নয়, অচিৎ নয়, অনানন্দ নয়। যেহেতু আমরা ব্যবহারিক জগতে আছি সেজন্য আত্মাকে সচ্চিদানন্দ বলি।

ভ—অহম্ (আমি) একজন ব্যক্তিকে আবার ব্রহ্মকেও বলা হয়। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ম—এটা উপাধি ভেদ। শরীর সংক্রান্ত সীমিত ভাবই জীবের অহম্ (আমি), অন্যপক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত সীমিত ভাবই ব্রহ্মের অহম্ (আমি)। উপাধি দু'টি সরিয়ে নিলে 'আমি' (অহম্) বিশুদ্ধ ও এক।

ভ—ভগবান কি দীক্ষা দেন ?

ম—মৌনই সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দীক্ষা দক্ষিণামূর্তি এটাই করেছিলেন। স্পর্শ, দৃষ্টি ইত্যাদি দীক্ষা নিম্ন-স্তরের। মৌনদীক্ষা সকলের হৃদয় পরিবর্তন করে। কোন গুরু নেই, শিষ্যও নেই। অজ্ঞানী শরীরকে আত্মা বলে ভুল বোঝে সেজন্য অন্যের শরীরকে গুরু বলে মনে করে। কিন্তু গুরু কি তাঁর শরীরকে আত্মা বলে মনে করেন ? তিনি শরীরের অতীত হয়ে গেছেন। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং অজ্ঞানী গুরু ও শিষ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারে না।

ভ—তবে কি একজনের থেকে অন্যের পার্থক্য নেই ?

ম—ব্যবহারিক জগতের দিক থেকে পার্থক্য আছে কিন্তু সত্যের দিক থেকে নেই।

অধ্যাপক ধন্যবাদ দিলেন। তিনি শ্রীভগবানকে দর্শন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পর তাঁর লেখা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন বলে আশা পোষণ করলেন।

কথাবার্তা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন যে যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই উপাসনা ও ধ্যান করা সম্ভব, আর মনের নাশ হলে তাদেরও

নাশ হয়। এগুলো কেবলমাত্র মনের অবশিষ্ট চিন্তাবৃত্তি শান্ত ও নাশ করার ভূমিকাসরূপ।

ভ—'শৈব সিদ্ধান্ত' তিনটি মৌলিক বস্তুকে শাশ্বত বলে স্বীকার করে নেয়। এটা কি বেদান্ত বিরুদ্ধ ?

ম—এ তিনটি সত্তা জীব, ঈশ্বর ও বন্ধন। এরূপ 'ত্রয়ী' সকল ধর্মেই আছে। যতক্ষণ মন ক্রিয়াশীল ততক্ষণ এগুলো সত্য। এগুলো কেবলমাত্র মনের সৃষ্টি। মনের উদয় হলেই একজন ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে। ঈশ্বর আত্মা থেকে পৃথক নয়। আত্মাই বাস্তবায়িত হয়ে ঈশ্বর হয়। এরূপে গুরুও হয়।

অধ্যাপক সন্ধ্যায় ফিরে এলেন ও ভাল কাজ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরও জানতে চাইলেন যে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় কিন্তু ঈশ্বরকে কেন বলা হয় না।

ম—সৎ এখানে সৎ ও অসতের অতীত সত্তা ;

চিৎ—চিৎ ও অচিতের অতীত ;

আনন্দ—আনন্দ ও নিরানন্দের অতীত।

তবে এটা কি ? যদি এটা সৎ নয় অসতও নয় তবে একে কেবল সৎ-ই বলতে হবে। জ্ঞান শব্দটা তুলনা কর। এটা জ্ঞান ও অজ্ঞান শব্দের অতীত অবস্থা। তবু জ্ঞান অজ্ঞান নয় পরন্তু জ্ঞানই। সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভ—এটা একত্বের ওপর গুরুত্ব দেয়।

অধ্যাপক আত্মবিচার সম্বন্ধে কিছু বললেন। যদিও তাঁর আরও কয়েকটি সংশয় স্পষ্ট হতে বাকী আছে তবুও শ্রীমহর্ষিকে আর বিরক্ত করতে চান না আর এতক্ষণ যা শুনেছেন তার ওপর নিদিধ্যাসন করতে চান বলে তিনি বিদায় নিলেন।

মহীশূরের একজন বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন উপাসনা ও ধ্যান মনের ক্রিয়া বলা হয়। ক্রিয়া থেমে যাওয়াই আত্মজ্ঞান। এখন উপাসনা ও ধ্যান ছাড়া আত্মজ্ঞান হয় কি করে ?

ম—এগুলো ভূমিকাসরূপ। এই কর্ম ক্রমশঃ ঈপ্সিত নৈষ্কর্ম্যে নিয়ে যাবে।

ভ—বলা হয় হৃদয় ডানদিকে অনুভূত হয়, প্রাণী বিজ্ঞান বলে বাঁদিকে।

ম—আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলা হয়েছে।

ভ—এটা কি আত্মিক হৃদয়?

ম—হ্যাঁ।

ভ—এটা যে ডানদিকে তা কি করে জানা যায়?

ম—অনুভূতির দ্বারা।

ভ—এর কি কোন সঙ্কেত আছে?

ম—নিজেকে দেখাও আর দেখো।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩৪। বড়দিনের ছুটি হওয়ায় দূর ও নিকটের অনেক দর্শনার্থী এসেছে। একটি দল এসে বসলে ও তারমধ্যে দু'জন প্রশ্ন করলে—

ভ—আপনি ইংরাজী জানেন?

প্রশ্ন করতে বলায় সে বলে চলল—

ভ—আপনি কি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন?

শ্রীভগবান হেসে বললেন, "বলে যাও।"

ভ—আপনার কি নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে?

তাকে প্রশ্নগুলো শেষ করতে বলা হল।

ভ—আপনি কি ইচ্ছামত নির্বিকল্প সমাধি লাভ করতে পারেন? মহাত্মাদের কি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রভাবিত করা উচিত নয়?

আর একজন বললেন—

শ্রীভগবান কি আমাদের আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করতে পারেন ?

ম—সাহায্য সব সময়ে আছে।

ভ—তবে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। আমি নিত্যসিদ্ধ কৃপা অনুভব করতে পারি না।

ম—সমর্পণ কর তাহলেই পারবে।

ভ—আমি সর্বদা আপনার শ্রীচরণে আছি। ভগবান কি অনুসরণ করার জন্য আমাদের কোন উপদেশ দেবেন ? নতুবা ৬০০ মাইল দূরে থেকে কিরূপে সাহায্য লাভ করবো ?

ম—সেই সদ্‌গুরু অন্তরেই আছেন।

ভ—এটা বোঝার জন্যও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন।

ম—সদ্‌গুরু অন্তরে।

ভ—আমি একজন প্রত্যক্ষ গুরু চাইছি।

ম—সেই দৃশ্যমান সদ্‌গুরু বলছেন যে তিনি অন্তরে।

ভ—আমি কি সদগুরুর কৃপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি ?

ম—হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ না হওয়া অবধি উপদেশ প্রয়োজন।

ভ—ধ্যানের জন্য কি কোন বিশেষ সময় নেই ?

ম—ধ্যান মনোবলের উপর নির্ভর করে। এটা অবিরত, এমন কি কাজের সময়েও হওয়া চাই। বিশেষ সময় প্রবর্ত্তকের জন্য ?

ভ—সদ্‌গুরু কি আমার মাথায় হাত দিয়ে তাঁব কৃপার আশ্বাস দেবেন ? আমার অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে তাঁর কথা সফল হবে।

ম—এরপর একটা প্রতিজ্ঞাপত্র (বণ্ড) আনানো হবে আর যদি তুমি মনে কর যে সাহায্য এল না তবে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। (হাস্য)

ভ—আমি কি নিকটে আসতে পারি ? (আশীর্বাদের জন্য)।

ম—তোমার এরূপ প্রশ্ন হওয়ার কথা নয়। এটা তোমার সমর্পণের কথার বিরুদ্ধ হয়। সদ্‌গুরু সর্বদাই তোমার মাথার ওপর রয়েছেন।

ভ—সমর্পণ অনেক চেষ্টার পর আসে।

ম—হাঁ, সময়ে এটা সম্পূর্ণ হয়।

ভ—উপদেশের জন্য তো একজন শিক্ষক চাই ?

ম—হাঁ, যদি নূতন কিছু শিখতে চাও। কিন্তু যা শিখেছ এখানে তা ভুলতে হবে।

ভ—তবুও একজন শিক্ষক চাই।

ম—যা তুমি অন্যস্থানে খুঁজছ তা তোমার কাছেই রয়েছে সুতরাং শিক্ষকের প্রয়োজন নেই।

ভ—জ্ঞানী কি মুমুক্ষুর কোন কাজে আসেন ?

ম—হাঁ। তুমি যে জ্ঞানী নও এই ভুলটা ভাঙ্গতে তিনি সাহায্য করেন।

ভ—সুতরাং আমায় বলুন কি করে হয় ?

ম—বিভিন্ন পথ কেবল লোকেদের মোহ ভঙ্গ করার জন্য।

ভ—আমার মোহ ভেঙ্গে দিন। আমায় কোন্ পথে যেতে হবে বলুন।

ম—তুমি এখন কোথায় আছ ? কোথায় যাবে ?

ভ—আমি জানি 'আমি আছি' কিন্তু 'আমি কি' জানি না।

ম—তবে কি দু'টি 'আমি' আছে ?

ভ—এটা তো যা প্রমাণ করতে হবে তাকেই মেনে নেওয়া হল।

ম—কে বলছে ? যে আছে সেই কিংবা অন্যজন যে সে কি জানে না ?

ভ—আমি আছি, কিন্তু কিরূপে বা কেমন ক'রে জানি না।

ম—'আমি' সব সময়ে আছে।

ভ—এই 'আমি'র কি কোন রূপান্তর হয়, যেমন মৃত্যুতে ?

ম—কে রূপান্তর দেখে ?

ভ—মনে হচ্ছে আপনি জ্ঞানমার্গের কথা বলছেন। এটা জ্ঞানযোগ।

ম—হাঁ তাই।

ভ—কিন্তু সমর্পণ ভক্তিযোগ।

ম—দুই-ই এক।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি বলতে লাগল—

তবে আমায় সিদ্ধান্ত করতে হবে যে আমি চেতনা আর আমার উপস্থিতি ছাড়া কিছুই ঘটে না।

ম—যুক্তি দিয়ে বোঝা এক আর প্রত্যয় হওয়া আর।

অন্য লোকটি বললে—

আমি তিনমাস অপেক্ষা করে দেখব কোন সাহায্য পাই কিনা। এখন কি আপনার আশ্বাস পেতে পারি ?

ম—এটা কি যে আত্মসমর্পণ করেছে সে বলছে ?

চারজন দর্শনার্থী চলে গেল। সেই লোকটি বলে যেতে লাগল—আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন। (হাস্য)

সে আরও বললে—

ঈশ্বর আমার অভাব রাখেন নি। আমি সুখী। তার সঙ্গে মনের শান্তি চাই। সেজন্য প্রার্থনা করছি।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩৫। দু'জন মহিলা ও দু'জন ভদ্রলোক সিংহল থেকে এসেছে।

ভ—আপনি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন ? তা যদি হয়, তবে কোন্ মূর্তিতে দেখেছেন ?

ম—সেখানে দেখার জন্য কে থাকে? এ প্রশ্নটা ঠিক যেন একজন কি নিজেকে জানে-এর মত।

ভ—আমি আমাকে জানি।

ম—'আমি'টা কি আত্মা থেকে পৃথক যে তুমি বলছ যে তুমি তোমাকে জানো?

ভ—আমি জানি যে আত্মা ও শরীর এক। যদি আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয় তবে ভগবান বলুন যে কি করে আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক ক'রে দেখা যাবে। ইনি ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন। ইনি শিক্ষা দিতে পারেন।

ম—আত্মা কেন শরীর থেকে পৃথক হবে? শরীর যেমন আছে থাক না।

ভ—আত্মা শরীর-রহিত হলে সে সব শরীরের ভিতর দেখতে পায়।

ম—তখন কি অন্য কেউ থাকে? কিংবা তখন কি তোমার নিজের শরীরটাও থাকে? ঘুমের কথা চিন্তা কর—তখন তুমি তোমার শরীরকে জানো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি সেখানে ঠিকই থাকো। তখন কি তুমি এই শরীর কিংবা অন্য শরীর দিয়ে জগৎ দেখো? তা সত্ত্বেও তখন তুমি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারো না। জগৎ দেখার জন্য একজন কেউ দ্রষ্টা আছে আর সে দ্রষ্টাও সীমিত। যদি অসীম হয় তবে আর অসীম আত্মা ছাড়া অন্য কিছু কোথায়?

ভ—ঈশ্বরের কি সীমা আছে?

ম—ঈশ্বরের কথা থাক। সুষুপ্তির সময়ে তোমার আত্মায় কি সীমা (উপাধি) ছিল?

ভ—তবে মৃত্যুই চরম অবস্থা।

ম—হাঁ, এখন আমরা মৃত্যুতেই রয়েছি। যারা অসীম আত্মাকে সসীম করেছে তারা আত্মার সীমা তৈরী ক'রে আত্মঘাতী হয়েছে।

ভ—আপনি বলেন আত্মাতে মন একাগ্র কর। কি করে করা যায় ?

ম—এটার সমাধান হলে সব সমস্যাই মিটে যায়।

ভ—আপনি বলেন নিজেকে জানো। কি করে নিজেকে জানা যায় ?

ম—এখন তুমি জানো যে তুমি শরীর।

ভ—রাজযোগ শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি দিয়ে উপলব্ধি করে আর শ্রীভগবান চিন্তা ক'রে উপলব্ধি করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা জ্ঞানযোগ।

ম—শরীর ছাড়া তুমি চিন্তা কর কি করে ?

ভ—ঈশ্বর চিন্তা করেন না।

ম—তবে তুমি 'আপনি ঈশ্বরকে কোন মূর্তিতে দেখেছেন ?' দিয়ে প্রশ্ন শুরু করলে কেন ?

ভ—ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা উচিত।

ম—তুমি কি এখন ঈশ্বরকে অনুভব করছ না ?

ভ—সবাই কি সব সময়ে ঈশ্বরকে অনুভব করছে ?

ম—হাঁ।

ভ—তবে আত্মজ্ঞান কি ?

ম—তুমি যে উপলব্ধি করছ না এই ভুল ধারণাটা ত্যাগ করাই আত্মজ্ঞান।

ভ—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

তারা একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে গেল।

৪৩৬। ভ—বিশ্বরূপ কি ?

ম—এই জগতকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলে দেখা।

ভগবদ্‌গীতায় বহু বস্তু ও বহুরূপ আবার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। এটা কি করে অনুভব হয় বা দেখা যায় ?

একজন কি নিজের আত্মাকে দেখতে পায়? দেখা না গেলেও কি আত্মাকে অস্বীকার করা যায়? সত্য কি?

ভ—তবে কেউ তাঁকে দেখেছেন বলা কি ভুল?

ম—এটা তুমি যেরূপ সত্য ঠিক সেরূপ। গীতা শুরু হল 'কেউ জন্মায়নি' বলে; চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হচ্ছে "তোমার ও আমার বহু জন্ম হয়েছে, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি।" এই দু'টি কথার মধ্যে কোনটা সত্য? উপদেশ শ্রোতার বুদ্ধি অনুসারে দেওয়া হয়। যদি দ্বিতীয় অধ্যায়েই সমগ্র উপদেশ বলা হয়ে গিয়ে থাকে তবে আরও অতগুলো অধ্যায় কেন বলা হল?

বাইবেলে ঈশ্বর বলেছেন, "আমি এব্রাহামেরও পূর্ববর্তী।" তিনি 'আমি ছিলাম' বলেননি, বলেছেন 'আমি আছি'।

৪৩৭। লোকে বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণকে 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' বলা পড়ে আর এখন সেটাই অনুকরণ করে। তারা আরও জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন?

আমি জিজ্ঞাসা করি উপলব্ধি কি?

উপলব্ধির অর্থ পূর্ণতা। যখন তুমি সীমিত তখন তোমার দেখাও সীমিত। এরূপে তোমার জ্ঞানও অপূর্ণ। সেই অপূর্ণ জ্ঞানের কি মূল্য?

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনকে বলা হল যে সে যা দেখতে চায় দেখুক; তাকে যা আছে তাই দেখো বলা হয় নি। সে দর্শন প্রকৃত সত্য হয় কি করে?

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

৪৩৮। একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—আমার মত প্রবর্ত্তকের পক্ষে কি উপযুক্ত—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কিংবা অহম্ ব্রহ্মাস্মি মনন?

ম—উত্তরটা প্রশ্নেই আছে। প্রশ্নই বলছে যে সেটা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

ভ—জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় 'আমি' অনুভব হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে হয় না। কেন এমন হয়?

ম—তা সত্ত্বেও সুষুপ্তিতে কি এটা থাকে না?

ভ—এর কারণ এ দু'টি অবস্থায় মনের বৃত্তি আছে আর অন্যটায় সেটা নেই।

॥ ওঁ শ্রীরমণ অর্পণমস্তু ॥

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও বাণীর বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে কতিপয় অনুবেদন

আজকাল পত্রিকা

ভাগবত বলেছেন "যথাভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রম্" অর্থাৎ 'জ্ঞানীর মন ব্রহ্ম', যেন নিজেরই ছায়া অন্য একটি নির্মল মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত। সাধন পর্যায়ে এই অবস্থার নিকটে অবস্থান ভক্তের কাম্য। আর্থার ওসবোর্ণ ও সুরি নাগাম্মা সেই দুর্লভ সাক্ষাতের অভিলাষী এবং যথার্থই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। অনুবাদিকার উপলব্ধিও প্রণিধানযোগ্য। উল্লেখ করা যায় যে ওসবোর্ণ এবং পল ব্রান্টনের রমণ মহর্ষির জীবনী এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত পুস্তক পশ্চিমে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বাংলায় অনুবাদ এই প্রথম।... ঘটনা বহুল জীবনী ছাড়াও পুস্তকটির (রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ) আরোত্তর আকর্ষণ মহর্ষির স্বলিখিত রচনাবলী ও দৈনন্দিন জীবন পঞ্জী। সুরি নাগাম্মার শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুন্দর রেখাচিত্রই শুধু নয়, একটি সহজ অথচ গভীরতর আত্মোপলব্ধির অনুভব। তথাকথিত স্কুল কলেজের শিক্ষাবর্জিত ভগবান রমণাশ্রিতা নাগাম্মার পত্রাবলীতে গভীর অনুষঙ্গ ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে সাধনার গতিপ্রকৃতি, সৎগুরুর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য তাকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বের গভীরতম উপলব্ধির মগ্নতায়!...প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে (ইংরাজী ও তেলেগু থেকে বাংলায়) যে স্বাভাবিক অসুবিধা সেই অসুবিধা দূর করার প্রয়াসে পূর্ণিমা সরকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন...।

—শ্রীমুকুল গুহ

আর্য্যদর্পণ

দেবতার লীলাপ্রাঙ্গন ভারতের মাটিতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোন প্রান্তেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এবং ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তের অভাব হয়নি কোনদিন। দক্ষিণ ভারতের এমনি একজন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ মহর্ষি রমণের সদ্যঃসমাপ্ত জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির জীবন প্রসঙ্গ, সাধন, সিদ্ধি ও অমূল্য বাণীর ভিন্ন ভিন্ন পর্ব বা দিগ্‌দর্শন।

মহর্ষি রমণের দিব্য জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায় জ্ঞানপথে আত্ম বা ব্রহ্ম ভাবনারূপ সাধনায় অল্পকালের মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন অপূর্ব সিদ্ধি। 'মহর্ষি রমণ ও আত্মজ্ঞানের পথ' গ্রন্থে সেই অনুপম সাধনা, সিদ্ধি ও সহজ জীবনের পরিচয় রয়েছে। · আত্মব্যাপ্তির গভীর অনুভূতি বিজড়িত তাঁর সহজ সরল সরস বাণী অনাড়ম্বর জীবন যাপন মুগ্ধ করেছিল তাঁর সাহচর্যধন্য সর্বশ্রেণীর মানুষকেই। বিশেষ করে তাঁর সান্নিধ্যে মুমুক্ষু সাধকের যতকিছু সংশয়, সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার হত চূড়ান্ত মীমাংসা তথা পরিসমাপ্তি এবং তার ফলে লাভ হত অসীম প্রশান্তি।

শ্রীরমণ বাণী হল বহু ভক্তের বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও মহর্ষির অমৃতময় উত্তর। পাঠক মাত্রেরই বহু আন্তর প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা মিলবে এই গ্রন্থ পাঠে।

স্তুতিপঞ্চকম্ ও সদ্‌বিদ্যা গ্রন্থটি মহর্ষির লিখিত কবিতা। এর প্রারম্ভে লেখা হয়েছে—"তিনি গৃহত্যাগ করেই অরুণাচলে আসেন ও অবশিষ্ট জীবন সেখানেই যাপন করেন। এই অরুণাচলকে, সেই গুরুকে, সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশকে বা পরমসত্তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।"

শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলীতে রয়েছে বহু সমস্যা বিজড়িত প্রশ্নের উত্তর। তিনি (মহর্ষি) আশ্রমবাসী কিংবা দর্শনার্থীদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক সমস্যা নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা করতেন বইটিতে তাই তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে মহর্ষি রমণের দৈনন্দিন জীবন যাপনের এবং আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে এতে ফুটে উঠেছে প্রাচীন ভারতের সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সর্বভূতানুকম্পাকারী ঋষিযুগের অনুরূপ এক অনুপম আলেখ্য।

সবশ্রেণীর মানুষই এই গন্থগুলি হতে চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবেন। সবসংস্কার মুক্ত এই জাতীয় মহাপুরুষের জীবনদর্শন, আদর্শ ও বাণী প্রচার জগতের মহাকল্যাণদায়ক ও শান্তিদায়ক ।

—স্বামী অমলানন্দ সরস্বতী

শ্রীসুদর্শন

মহর্ষি রমণ ও আত্মজ্ঞানের পথ :

—বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের ধর্মগুরুদের মধ্যে রমণ মহর্ষি অন্যতম বলিয়া গৃহীত হইযাছেন। তাহার খ্যাতি শুধু ভারতেই সীমায়িত নয়, দেশ দেশান্তরেও পরিব্যাপ্ত। লেখক ভিন্ন দেশীয় কিন্তু তিনি অধ্যাত্মসাধনার মূর্তবিগ্রহ মহর্ষি

রমণের জীবনী রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। শুধু তথাকথিত পাণ্ডিত্যের দ্বারা এইরূপ অধ্যাত্ম জীবনী রচনা সম্ভব নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্য অবশ্যই আছে, সেই সঙ্গে তিনি মহর্ষি প্রদর্শিত অধ্যাত্ম সাধনায় বহুল পরিমাণে সিদ্ধকাম বলিয়াই এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহর্ষির জীবন ও তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার অপূর্বতা আস্বাদন করিতে হইলে এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। এমনই একটি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার বাংলা ভাষাভাষী জনগণের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। ভাষা সহজ, সরল, সর্বসাধারণের উপযোগী। কোন গ্রন্থকে ভাষান্তরিত করা সহজ কর্ম নহে। উভয় ভাষায় অসামান্য অধিকার থাকিলেই অনুবাদ যথার্থ এবং সুষ্ঠু হতে পারে। অনুবাদিকার তাহা আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

শ্রীরমণবচনামৃত :

—অমৃতের সন্তান মানুষ। স্বরূপে মানুষ আনন্দস্বরূপ। ভোগবাসনার আবর্তে পড়িয়া আত্মবিস্মৃতিতেই তাহার দুঃখভোগ। মুক্তির উপায়—অধ্যাত্ম সাধনা। সেই সাধনার পথনির্দেশক আত্মজ্ঞ নিত্যানন্দে স্থিত মহাপুরুষগণ। যাঁহার বাণীসঙ্কলন এই গ্রন্থে তিনিও ছিলেন তেমনই একজন আত্মজ্ঞ নিত্যানন্দে স্থিত মহান্ পুরুষ। এইরূপ মহাপুরুষের বাক্যই অধ্যাত্ম পথের যাত্রীকে লক্ষ্যস্থলে উপনীত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। তাঁহাদের কথা শুধু কথাই নয়, আত্মোপলব্ধির অমৃত সিঞ্চনে সেই কথা সঞ্জীবিত হয় বলিয়াই তাহা ত্রিতাপ-জর্জরিত নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। এই অপূর্ব গ্রন্থটি তদ্রূপই অমৃত পথের যাত্রীর পক্ষে একটি আলোক দিশারী স্বরূপ। গ্রন্থ পাঠে পাঠক-পাঠিকা আমাদের এই বাক্যের সত্যতা অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গ ভাষাভাষীগণের যে মহৎ কল্যাণসাধন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবৎ কৃপায় পরবর্তী খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

সন্ত আশ্রম

কল্যাণী

বোম্বাই বিচিত্রা পত্রিকা

রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ—

···শ্রীরমণ সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে দেহের বন্ধন থেকে, জরা মরণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না বসন-ভূষণ ত্যাগ করে বল্কল ধারণের। আগে আমিকে জানতে হবে, আমিকে চিনতে হবে তাহলেই জগত-সংসারের সব কিছু জানা, চেনা হয়ে যাবে এবং অন্তরের সমস্ত অসঙ্গতা দূরীভূত হয়ে আপন হৃদয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সুন্দর সুস্পষ্ট রূপ চিরভাস্বর হয়ে উঠবে। রমণ সাহিত্যের এই হলো মূল কথা।

যারা মুক্তি লাভে প্রয়াসী এই মনোজ্ঞ গ্রন্থখানি তাঁদের প্রয়াসের পথকে অবশ্যই সুগম করে তুলবে।

পরিশেষে জানাই অনুবাদিকার অনুবাদশৈলী ও ভাবের অভিব্যক্তি অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। পণ্ডিত সমাজে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী (প্রথম খণ্ড)—

·· প্রতিটি পত্রই আধ্যাত্মিক বিষয়ক উপদেশ। এক একখানি পত্র যেন এক একটি সুমিষ্ট আখের টিপলী। চর্বণে বড সুখ। সুমিষ্ট রসে মুখ ভরে যায়। রসনা তৃপ্ত হয়। পত্রাবলীর পত্রগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে ভক্তিরসে মন আপ্লুত হয়। শান্তি রসে ভরপুর হয়ে ওঠে। আরও বেশী করে উপলব্ধি করা যায় ভগবান রমণের প্রতি সুরি. নাগাম্মার একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অকৃত্রিম ভালবাসা। দীর্ঘদিন শ্রীগুরুর চরণতলে বসে শ্রীমতী যা প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্তরে গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি পত্রাকারে দিনের পর দিন অগ্রজকে তেলেগু ভাষায় লিখে জানিয়েছেন। গ্রন্থখানি তাঁর কঠোর সাধনার সার্থক ফসল।

অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। কোথাও বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই, অহেতুক বাগাড়ম্বর নেই। সহজ সরল ভাষায় ভাষান্তরিত ·····।

সুধীর কুমার রা